ওয়ার
অ্যান্ড
ট্যাকটিক্স

মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান

প্রথম অধ্যায়

(যুদ্ধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে)

ওয়্যার অর্থ কি?

ওয়্যার অর্থ যুদ্ধ।

যুদ্ধ কি?ল

দুইটি পক্ষের মাঝে স্ব-শস্ত্র সংঘাতই হচ্ছে যুদ্ধ।

যুদ্ধ কাকে বলে?

যুদ্ধের বহু ধরনের সংজ্ঞা থাকলেও সেই সব সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতাও প্রচুর। সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি হচ্ছে, "ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে ও বিদ্যমান শাসন ব্যাবস্থা উৎখাত করে নিজেদের শাসন ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেই লড়াই করা হয়!"

যুদ্ধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি?

শত্রুর হামলা ও লুটপাট থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবার, মালামাল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়। কখনও নিজের ধর্মীয় ও ব্যাক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। নিজের দেশের সম্পদ ও শাসন ব্যবস্থা রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। শাসক শ্রেণীর জুলম, ন্যায় বিচার না থাকা ও অন্যায়কে উৎখাতের জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। মুসলিমদের নিকট আল্লাহর জমীনে দ্বীনি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রচারের জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। কারো উপর নিজের শাসন ব্যাবস্থা চাপাইয়া দেওয়া, কাউকে শোষন করা, অধিক ট্যাক্স পেতে চাওয়া, কাউকে গোলাম বানানো, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎখাত করা এবং দুর্বল করা, উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমি দখল করা, লুটপাট করে অন্যের উপার্জিত অর্থ দিয়ে

জীবন যাপন করা ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করতে হয়। এগুলো ছাড়াও যুদ্ধের আরো বহু গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ট্যাকটিক্স শব্দের অর্থ কি?

ট্যাকটিক্স শব্দের অর্থ, কৌশল!

কৌশল কি?

কৌশল হচ্ছে যেকোনো কাজ করার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধিদৃপ্ত উপায়।

কৌশল কাকে বলে?

যেকোনো কাজকে সঠিক ভাবে করার প্রক্রিয়াকেই কৌশল বলে।

যুদ্ধে ট্যাকটিক্স এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি?

যুদ্ধে ট্যাকটিক্স এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য কয়েকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ দিচ্ছি-

মুসলিমদের ইতিহাসে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হওয়া খন্দকের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সঃ এর জীবদ্দশায় তার নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়েছিলো। তৎকালীন মদিনার তিন পার্শ্বে পাহাড় পর্বত বাড়িঘর গাছপালা থাকার কারনে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা ছিলো। কিন্তু মদিনার উত্তর পার্শ্ব সমতল হওয়ায় সালমান ফারসি রাঃ এর পরামর্শে এই দিকটিতে খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা তৈরি করা হয়। এই খননকৃত জায়গাটির প্রস্থ ও গভীরতা উভয়টি ছিলো ১০ হাত বা ১৫ ফিট করে। এটি একটি পারস্যের যুদ্ধ কৌশল ছিলো। এমনভাবে এটি খনন করা হতো যাতে কোন ঘোড়া এটা ডিঙিয়ে আসতে না পারে। আরবের মাটিতে এই কৌশলটি প্রথম ছিলো। আক্রমণকারী মক্কার কাফের ও ইহুদিদের জোট বাহিনী এই কৌশল দেখে হতবাক হয়ে যায়। দীর্ঘ ২৭ দিন মদিনা অবরোধের পরেও এই পরিক্ষা পার না হতে পেরে এবং ঝড়ো হাওয়ার কারনে কাফেররা ফিরে যায়।

মঙ্গলরা ৫৫ বছর পর্যন্ত অপরাজিত ছিলো তাদের কিছু ব্যাটেল ট্যাকটিক্সের কারনে। যুদ্ধের ময়দানের বাহিরে তারা দুইটা ট্যাকটিক্স খাটাতো, একটি হচ্ছে গণহত্যা আরেকটি হচ্ছে গণধর্ষণ। তাদের এই নৃশংস কর্মকাণ্ডের খবর মোটামুটি তৎকালীন

সময়ে সবাই জানতো। এতে করে কোন দেশে আক্রমণ করার আগেই জনগণ ভীত হয়ে কোন প্রকার প্রতিরোধ করার সাহস হারিয়ে ফেলতো। সবাই পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতো। এতে করে মঙ্গলরা অনেকটাই কোন প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই কোন দেশ দখল করে ফেলতো। আর যদি প্রতিরোধের মুখোমুখি হতেই হতো তবে তাদের কিছু ব্যাটেল ট্যাকটিক্স ছিলো সেগুলো ফলো করতো। যুদ্ধের ময়দানে মঙ্গলদের মুল ট্যাকটিক্সগুলো ছিলো, কাতার হিসেবে দাড়িয়ে যুদ্ধ না করে সৈন্যরা পাশাপাশি দাড়িয়ে যুদ্ধ করতো। এতে করে তারা প্রতিপক্ষকে কিছুক্ষনের মধ্যেই চতুর্দিকে থেকেই ঘিরে ফেলতো। তাদের ঘোড়াগুলো খুব ক্ষিপ্রগতির ছিলো। তারা নিজেরাও খুব ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করতো। এতে করে অল্প সময়েই প্রতিপক্ষের অধিক সৈন্য হত্যা করা যেত। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা ভীত হয়ে পালিয়ে যেত। এতে করে খুব দ্রুতই ময়দানে বিজয় অর্জন করতে পারতো মঙ্গলরা। তারা অল্প সময়ের জন্য খুব বেশি ক্ষিপ্র হতে পারতো এই কারনে যে, তাদেরকে সারাদিন যুদ্ধ করতে হতো না। সারাদিন যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে তারা অল্প সময়ের জন্য এতটা ক্ষিপ্র হতে পারতো না। কেননা যুদ্ধের ময়দানে শুরুর দিকে খুব বেশি ক্ষিপ্র হলে দিনের অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই সৈন্যরা একেবারে নেতিয়ে যায়। তাদের এই ট্যাকটিক্সগুলো যদি কাজে না আসতো তাহলে তারা ঘোড়ায় চড়ে পিছু হটার ভান করতো। এতে করে প্রতিপক্ষের সৈন্যরা ভাবতো যে, মঙ্গলরা পালাচ্ছে। তাদেরকে তাড়া করে হত্যা করা উচিত। যখনই এরা মঙ্গলদেরকে ধাওয়া করতে যেত তখনই মঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে বসেই উল্টা হয়ে তীর নিক্ষেপ করতো। এক্ষেত্রে মঙ্গলদের নিজস্ব তৈরি কিছু তীর ধনুক ছিলো, যেগুলো অন্যান্য তীর ধনুকের তুলনায় অনেক হালকা ছিলো এবং আকৃতিতে ছোট ছিলো কিন্তু রেঞ্জ অন্যান্য তীরের তুলনায় বেশি ছিলো। এতে করে ধাওয়াকারী সৈন্যরা কিছু বুঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে যেত। যারা বেচে থাকতো তাদেরকে মঙ্গলরা ঘিরে ফেলতো, আবার কখনো কখনো মঙ্গলরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালানোর ভান করতো। এতে করে ধাওয়াকারী প্রতিপক্ষের সৈন্যরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে ধাওয়া করতে যেত। এই বিচ্ছিন্ন ধাওয়াকারী সৈন্যদেরকে মঙ্গলরা পূর্ব পরিকল্পিত জায়গায় ফাঁদে ফেলে সবাইকে হত্যা করতো। মঙ্গলদের এই সব ট্যাকটিক্সগুলো সম্পর্কে সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ আর রুকুদ্দিন বাইবার্স বেশ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তাই তারা ১২৬০ সালে মঙ্গলদেরকে "অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ডিফেন্স" নীতিতে নিজেদের পছন্দ মতো যায়গায় টেনে নিয়ে এসে যুদ্ধ করতে চাইলেন। এইজন্য বেছে নিলেন ফিলিস্তিনের আইনে জালুতের ময়দান। বাইবার্সকে হিট এন্ড রান পলিসিতে আক্রমণ করার জন্য ছোট একটা সৈন্য দল দিয়ে পাঠান। বাইবার্স মঙ্গলদেরকে আক্রমণ

করেন এবং পালিয়ে যান। এভাবে কয়েক বার ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করা এবং নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার কারনে মঙ্গলরা ক্ষেপে যায়। । তাছাড়া মঙ্গলদের সমস্ত রসদ পত্রেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো হিট এন্ড রান পলিসি ফলো করা বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন মামলুকদের এই ছোট দলটি। বাইবার্সের মামলুকদের ছোট কয়েকটা স্কোয়াডকে দায়িত্ব দিয়েছিলো গোপনে মঙ্গলদের রসদে আগুন লাগানোর জন্য। মঙ্গলরা যখন মামলুকদের আক্রমণ প্রতিহত করাতে ব্যাস্ত থাকবে ঠিক তখন এই দলটির কাজ ছিলো মঙ্গলদের রসদ পত্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ রসদ পত্রের মাঝে গোপনে রেখে দিয়ে দুর থেকে তীরের মাথায় আগুন লাগিয়ে সেই তীর ঐ দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থের উপর নিক্ষেপ করার ট্যাকটিক্স খাটিয়েছিলো মামলুকরা। মামলুকরা বারবার আক্রমণ করে পালিয়ে যাচ্ছে এটা দেখে হালাকু খার মঙ্গল সেনাপতি কিতবুকা মামলুকদেরকে ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। এই ধাওয়া করতে করতে আইনে জালুতের ময়দানে এসে গিয়েই মঙ্গলরা ফাঁদে পড়ে যায়। যা মঙ্গলদের ধারণার বাহিরে ছিলো। মঙ্গলদের ট্যাকটিক্সেই মঙ্গলদেরকে ফাসানো হয়। আইনে জালুতের ময়দান ছিলো সংকীর্ণ দুই পাশে পাহাড়ের কারনে। এতে করে মঙ্গলরা তাদের সেই পুরোনো ট্যাকটিক্স পাশাপাশি দাড়িয়ে লড়াই করে প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলার বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং তাদেরকেই মামুলকরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এবং ক্ষিপ্রতার বিষয়টি বাস্তবায়ন করে মামলুকদের বেস্টনি ভেঙ্গে দুরে গিয়ে তারা পরিপূর্ণ সুসংগঠিত হয়ে পুনরায় মামলুকদের উপর আক্রমণ করলেও তেমন কোন লাভ হয়নি। ইতিমধ্যেই যুদ্ধ অনেকটা মামলুকদের অনুকূলে চলে গিয়েছিলো। কুতুজ তার সৈন্যদের মধ্যে সিরিয়ান সৈন্যদেরকে প্রথমে ময়দানে পাঠায়। কুতুজ জানতেন যে, মঙ্গলদের ক্ষিপ্রতার কৌশলের সামনে সিরিয়ান সৈন্যরা খুব বেশিক্ষন টিকে থাকতে পারবে না। এবং মঙ্গলদের ক্ষিপ্রতাও খুব বেশিক্ষন স্থায়ী হয় না। এই জন্যই মিশরীয় সৈন্যদের প্রথমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামাননি। যখন মঙ্গলদের ক্ষিপ্রতার মাত্রা বেড়ে গেলো এবং ক্ষিপ্রতা শেষ হয়ে যাওয়ার একটা পর্যায়ে এসে পড়েছিলো তখনই মিশরীয় সৈন্যদেরকে ময়দানে নামালেন। যা মঙ্গলরা কখনো আশা করেনি। এরপর মঙ্গলদের পালিয়ে যাওয়ার ভান করার যেই ট্যাকটিক্স সেটাও কাজে আসেনি। কেননা মামলুকরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো যে, মঙ্গলরা পালানোর ভান করলেই ঘোড়া নিয়ে এদেরকে ধাওয়া করা হবে এবং মঙ্গলদের উল্টো হয়ে ঘুরে তীর নিক্ষেপের আগেই মঙ্গলদের উপর তীর নিক্ষেপ করা হবে। তাছাড়া এই যুদ্ধে মামুলকরা হ্যান্ড গ্রেনেডের ব্যাবহার করেছিলো

যা মঙ্গলদের জন্য নতুন এক চমক ছিলো। মামুলকরা আরেকটি ট্যাকটিক্স খাটিয়ে

ছিলো, প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছিলো। এই হ্যান্ড গ্রেনেডের আর বিস্ফোরনের ধাক্কায় এবং আওয়াজের ভয়ে মঙ্গলদের ঘোড়াগুলো উল্টে পড়ে যেতে লাগলো। এতে করে ঐ সব ঘোড়ার উপরে থাকা মঙ্গল আরোহীরা নিহত হতে লাগলো। এতে মঙ্গলরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মঙ্গল সেনাপতি কিতবুকা নিহত হওয়াতে একেবারেই নেতৃত্বহীন হয়ে গিয়েছিলো মঙ্গলরা। তার উপরে বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন ছোট্ট সেনা দলটি হিট এন্ড রান পলিসির আওতায় মঙ্গলদের রসদপত্রেও আগুন দিয়ে সরে পড়েছিলো। এই যুদ্ধে মঙ্গলদের ৫০ হাজার সৈন্য ছিলো যাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিলো। এবং মামলুকদের সৈন্য ছিলো ১০ হাজার। ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এই মঙ্গলদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করা হয়েছিলো। ইতিহাসে এমন খুব কম যুদ্ধ রয়েছে যেখানে কোন বাহিনীর সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে। তার মধ্যে আইনে জালুতের যুদ্ধ একটি। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মঙ্গলদের ৫৫ বছরের অহংকারের অপরাজয়ের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়কার এই দাপুটে মঙ্গলদের মুল ভুমি মঙ্গোলিয়া আজ পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ কোন রাষ্ট্রই না। পৃথিবীতে কোন বাহিনীই অপরাজেয় নয়। শিল্প, সাহিত্যে, সংস্কৃতি ছাড়া যদি কোন বাহিনীর হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের মতো উত্থান ঘটে, তবে তাদের পতনও খুব দ্রুত হয়।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সৈন্য সংখ্যা ইব্রাহিম লোদীর চেয়ে অনেক কম ছিলো। বলতে গেলে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। ইব্রাহিম লোদির মোট সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৬০ হাজারেরও বেশি আর বাবরের সৈন্য সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫ হাজারের মতো। বাবর লোদির বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য লোদির বাহিনী বাবরের বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জায়গায় জায়গায় পরিখা খনন করে করে ঘাস লতা পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। এতে করে লোদির অনেক সৈন্য ঐ সব পরিখায় পড়ে গিয়ে মারা যায়। লোদির বাহিনীতে ১ হাজার যুদ্ধ হাতি থাকলেও কোন কামান ছিলো না। বিপরিতে বাবারের বাহিনীতে ৭০০ কামান ছিলো। প্রত্যেকটি কামানের জন্য একটি করে গরুর গাড়ি ছিলো। এই সমস্ত গরুর গাড়ি একটি অপরটির সাথে বেধে দেয়ালের মতো লম্বা করা হলো। এবং দুইটি গাড়ির মাঝে এমনভাবে ফাঁকা রাখা হলো যাতে করে একজন ঘোড়া সাওয়ার সৈন্য অনায়াসেই বের হতে পারে। ঐ সব গরুর গাড়ির সামনে ঢাল দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছিলো যাতে তীরান্দাজরা ঢালবহন করা আর তীর নিক্ষেপের জন্য কোন ধরনের ফরমেশন গঠন করা ছাড়াই প্রতিপক্ষের উপর তীর নিক্ষেপ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারে। এতে করে ঢাল বহনের জন্য যেমন কোন অতিরিক্ত সৈন্যদের প্রয়োজন পড়েনি। আবার তেমনিভাবে কামান পরিচালনা কারী সৈন্যরা নিরাপদে কামান পরিচালনা করতে পেরেছিলো। প্রতিপক্ষের

তীরের কোন আঘাত সামলাতে হয়নি। কামানের ভয়ঙ্কর শব্দে লোদির যুদ্ধ হাতিগুলো ভয় পেয়ে লোদির সৈন্যদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে পালাতে শুরু করেছিলো। এতে লোদির সৈন্যরাও পালাতে শুরু করেছিলো। এই যুদ্ধে লোদি নিহত হয়েছিলো এবং বাবর বিজয়ী হয়েছিলো।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়ের জন্য অস্ত্র, সৈন্য সংখ্যা ও সামরিক শক্তির চেয়ে কৌশল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাদের যুদ্ধ কৌশল সবচেয়ে ভালো হবে তাদেরই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে থাকে!

দ্বিতীয় অধ্যায়

(যুদ্ধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে)

বারো শ শতকে ও তেরো শ শতকের প্রথম অর্ধাংশে বাগদাদ যখন শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য সংস্কৃতির চুড়ান্ত পর্যায়ে ছিলো, তখন(১২৫৮ সালে) মঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণে বাগদাদের সবকিছু মঙ্গলদের সামরিক শক্তির কাছে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। তার বিশাল শিল্প, বানিজ্য, সাহিত্যে সংস্কৃতি, জ্ঞান চর্চার বিশাল লাইব্রেরি বাইতুল হিকমা তাকে রক্ষা করতে পারেনি। তার প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা মজবুত বিশাল প্রস্থের গোলাকার দেয়ালও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই দেয়াল এতটাই প্রশস্ত ছিলো যে, কিছু দুর পরপর সেই দেয়ালের উপর একটি করে কামান ও কিছু সৈন্য অবস্থান করার জায়গা নির্দিষ্ট ছিলো। সেই গোলাকার দেয়ালের চারপাশে প্রতিরক্ষার জন্য খাল খনন করা হয়েছিলো। বাগদাদ শহরের চারপাশে বহু খাল ছিলো যা প্রাকৃতিক ভাবেই মজবুত ডিফেন্সের কাজ করতে পারে। বাগদাদ শহরটি ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত হওয়া সত্বেও বাগদাদ রক্ষা পায়নি মঙ্গলদের হাত থেকে। শুধু মাত্র সামরিক শক্তির দুর্বলতার কারনে।

স্পেনে মুসলিমরা প্রচুর বানিজ্য, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি, জ্ঞান সাধনায় উন্নতি করেছিলো। তারা আর্কিটেকচারে মুসলিমদের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো করেছিলো। যারা স্মৃতি বহন করে স্পেনে আজও অবশিষ্ট আছে আল হামরা। মুসলিমদের ইতিহাসে স্পেনের মুসলিমরাই সবচেয়ে বেশি দুর্গ নির্মান করেছিলো। স্পেনের ক্রুসেডাররা মুসলিমদের তুলনায় কিছুই ছিলো না। তবুও স্পেনে ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিমদের যত রক্ত ঝরেছে, মুসলিমদের এতটা রক্ত সম্ভবত পৃথিবীর কোথাও ঝরেনি!মুসলিমরা এত দীর্ঘ ৭৮০ বছর(৭১১-১৪৯১ সাল) শাসন করার পরেও স্পেনের মতো সমূলে উৎখাত হয়েছে এমন কোন ভূখণ্ড পৃথিবীতে নেই!তাদের এত কিছুর চর্চা থাকে সত্বেও তারা রক্ষা পায়নি শুধু সামরিক শক্তির চর্চার অভাবে!তাদের এত এত দুর্গ দেয়াল তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

মুসলিমদের ইতিহাসে দীর্ঘ সময় প্রায় ৬২৩ বছর(১২৯৯-১৯২২ সাল) দাপটের সাথে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করছে উসমানীয়রা। যাদের না ছিলো উল্লেখ করার মতো কোন বানিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। আর না ছিলো বিশাল বিশাল দুর্গ দেয়াল। তাদের বড় একটা সময় কেটেছে শুধু ভেড়ার রাখাল হিসেবে। তারা দীর্ঘ সময় শাসনকার্য পরিচালনা করেছে তাবুর মাঝেই। তেরো শ শতকে উসমানীয় বীজ বপন ও উত্থানও হয়েছে এই সামান্য তাবুর মাঝেই। উসমানীয়দের উল্লেখ করার মতো ছিলো শুধু ঘোড়া, তরবারি আর জীবন দেওয়ার মতো বহু সৈন্য। অর্থাৎ শুধু সামরিক শক্তি ছিলো। এই বিশাল সাম্রাজ্যে এক কোনায় কোন মুসলিম ক্রুসেডারদের হাতে নির্যাতিত হয়ে হাহাকার করে উঠলে ধুলি ঝড়ের ন্যায় উপস্থিত হতো সেনাবাহিনী। ক্রুসেডারদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে।

ইতিহাসে সর্ব প্রথম গুড়া দুধ তৈরী করেছিলো মঙ্গলরা। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আক্রমণের সময় তাদের খাদ্য চাহিদা পুরনের জন্যই তারা এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে এবং টেকনোলজির বিপ্লব ঘটেছে তার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিলো যুদ্ধের। যুদ্ধের সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি প্রসার ঘটে। যুদ্ধের সময় অল্প জায়গায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য বহু গবেষণা হয়েছে। যার ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টাতে বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তির যতটা বিপ্লব ঘটেছে এত অল্প সময়ে এতটা বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তির বিপ্লব সম্ভবত ইতিহাসে আর কখনো হয়নি।

একুশ শতকের শুরুতেও আমরা দেখেছি যে, সমৃদ্ধ ইরাকের সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের আক্রমণে। তার কোন বিশাল অর্থনীতি তাকে রক্ষা করতে পারেনি। চীনের মতো বিশাল অর্থনীতির রাষ্ট্রকে যখন মার্কিনদের চেপে ধরার প্রয়োজন পড়লো তখন তারা সাউথ চায়না সি-তে বিশাল নেভাল ফ্লিট পাঠালো। তারা কিন্তু বানিজ্যের বানিজ্য দিয়ে যুদ্ধ করেনি। ইউক্রেনকে যখন রাশিয়া কোন ভাবেই নমনীয় করতো পারলো না তখন সামরিক শক্তি ব্যাবহার করলো। আরব আমিরাত যখন মার্কিন ব্লক ছেড়ে কিছুটা চলে আসতে চাইলো তখনই হুথিদের দিয়ে মিসাইল হামলা করে বুঝিয়ে দিলো যে, তোমার বুরুজ খলিফা আর বিশাল অর্থনীতি কতদিন টিকে থাকবে সেটা নির্ভর করবে মার্কিনরা কতদিন এয়ারডিফেন্স মিসাইলের সাপ্লাই দিবে তার উপরে। কেননা আরব আমিরাতের সেই ধরনের সামরিক শক্তি নেই যা অন্তত নিজেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে।

তুরস্কে আর পাকিস্তান পৃথিবীর উল্লেখ যোগ্য কোন অর্থনীতির দেশ না হওয়া সত্বেও দেশ দুইটির শাসক যতটা সমাদর পায়, আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের একটি কথা, একটি আদেশ যতটা মুল্য রাখে তার সিকিভাগের এক ভাগ মুল্যও রাখেনা বিশাল অর্থনীতির দেশ মালয়েশিয়ার শাসকের কথা!কারন এই দেশ দুইটি সামরিক শক্তিতে বিশ্ব সেরাদের কাতারে অবস্থান করছে। সৌদি আরবের আরামকো কতদিন বিশ্বের শীর্ষ ধনী কম্পানি হিসেবে থাকবে সেটাও নির্ভর করবে আরামকোর ওয়েল ফ্যাসিলিটি কতদিন হুথিদের মিসাইল হামলা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে তার উপরে। ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে কতদিন টিকে থাকবে সেটাও নির্ভর করে সে কতদিন তার সামরিক শক্তির দাপট বজায় রাখতে পারবে। পৃথিবীতে যত আলোচনার টেবিল, যত রাজনীতি, কূটনীতি আর বানিজ্যিক চুক্তি হয়, তাতে সেই রাষ্ট্রের শাসকই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে থেকে যে রাষ্ট্র সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে।

বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি একটি সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প খাত হিসেবে আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলি, ২০২০-২১ সালে পাকিস্তানের মোট বাজেট ছিলো ৪৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এর মাঝে ২০% ৮.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার বাজেট ছিলো সামরিক বাহিনীর জন্য। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে একটিভ সদস্য আছে ৬.৫ লক্ষেরও বেশি। তাদের বেতন ভাতা, পেনশন সবকিছুই এই বাজেট থেকে মিটানো হয়। এই সব মিটানোর বাকী অর্থ দিয়ে তারা দেশী ও বিদেশী অস্ত্র ক্রয় করে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সামরিক ইন্ডাস্ট্রির আকার কত বড় কিংবা এতে লোক কাজ করে সেই বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কয়েক বছর আগে তুরস্কের সামরিক কম্পানি এসেলসান ও টিএআইর ব্যাপারে এক রিপোর্টে এসেছে, অ্যাসেলসানে শুধু মাত্র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে এমন লোকের সংখ্যাই তিন হাজারেরও বেশি এবং টার্কিশ এ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমানে চার হাজার ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত আছে আরো ছয় হাজার ইঞ্জিনিয়ার নিবে টিএআই তাদের নতুন প্রজেক্টগুলোর জন্য। সেই সব দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, পাকিস্তানের শাসক ও জেনারেলরা যদি তার সামরিক চাহিদার সম্পূর্ণটাই দেশীয় ভাবে নজর দিতো, তবে এই সামরিক খাতেই পাকিস্তানের নূন্যতম ৫০ হাজার লোক কাজ করতো। এমনটা হলে পাকিস্তানের সামরিক খাতের সাথে জীবিকা জড়িত এমন লোকের সংখ্যা ৭ লক্ষেরও বেশি হয়ে যেত। যা বাংলাদেশের মোট সরকারি চাকরি জীবিদের অর্ধেক। বাংলাদেশে মোট সরকারি চাকরির কোটা আছে ১৫ লক্ষ। তার মাজে ২ লক্ষেরও বেশি খালি পড়ে আছে। আর ১৩ লক্ষের কাছাকাছি পদে লোক

আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০-২১ সালের মোট ডিফেন্স বাজেট ছিলো ৭৫৩.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। যা তার মোট বাজেটের প্রায় ১০%। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে সামরিক কেনাকাটা বাবদ ব্যায় করেছে ৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আর সামরিক অস্ত্র শস্ত্র বিক্রি করে আয় করেছে ২৬৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। তাহলে এবার ভেবে দেখুন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক খাত থেকে আয় ১ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের কাছাকাছি। কেননা ৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়া উল্লেখ করার মতো সামরিক খাতে ব্যায় কৃত তেমন কোন অর্থই বিদেশি যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র শস্ত্র বিক্রি করে আয়কৃত ২৬৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে ৬ বিলিয়ন মাইনাস করলে এটা হয় ২৫৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশকে তার বানিজ্যিক স্বার্থে সামরিক ডোনেশন দিলেও সেই ডোনেশনের শর্ত থাকে তার দেশ থেকে অস্ত্র কেনার। অর্থাৎ ব্যাপরটা যেই লাউ সেই কদুই হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

(যুদ্ধের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে)

যুদ্ধ প্রথমত দুই ধরনের হয়ে থাকে। আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষা মুলক। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হচ্ছে, অন্যের দেশে আগ বাড়িয়ে নিজেরাই হামলা করা। এই ক্ষেত্রে আবার দুইটি সিস্টেম থাকছে। শত্রুকে ধ্বংস করা এবং শত্রুর হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য শত্রুকে খুঁজে পাওয়াও এই ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায় আধুনিক যুদ্ধের সিস্টেমের কারনে। আগে যখন ময়দানে যুদ্ধ হতো তখন যুদ্ধে বিজয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সৈন্য সংখ্যা এবং সৈন্যদের শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করতো!তবে কৌশল ও প্রশিক্ষণের কারণেও অনেক ক্ষেত্রেই অল্প সৈন্য এবং শারীরিক শক্তিতে দুর্বলরাও বিজয়ী হতো!বর্তমান সময়ের ওয়ার স্ট্র্যাটেজিতে কৌশল, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রের ব্যাবহার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সৈন্য সংখ্যা যুদ্ধে বিজয়ের জন্য তেমন কোন ভুমিকা রাখে না। বরং দেখা যায় যে, অধিক সৈন্যর কারনে যুদ্ধের ব্যায় অনেক বেড়ে যায়। সৈন্যদেরকে ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে অপ্রশিক্ষিত সৈন্য মাঠে নামাতে হয়। এতে শত্রুর হাতে নিজেদের সৈন্যর ক্যাজুয়ালিটির পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

ব্যাপক সৈন্য মাঠে নামালে শত্রুর হাতে নিজেদের সৈন্য হারানোর সংখ্যাও অনেক বেশি হয়। পরিমাণে বেশি হওয়ার কারনে শত্রুর হামলা থেকে বাঁচতে যথেষ্ট পরিমাণ ডিফেন্সিভ জায়গাও খুঁজে পায় না সৈন্যরা। বেশি সৈন্য হলে তাদের সবাইকে ভালো মানের অস্ত্র ও অন্যান্য লজিস্টিক দেওয়াও সম্ভব হয় না। আবার অধিক সৈন্যর কারনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাপক সাপ্লাই পাঠাতে হয়। যেই সাপ্লাই পাঠানোটা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে খুবই কঠিন, শত্রুর নিয়ন্ত্রিত ভূমি হওয়ার কারনে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে লজিস্টিক ও ইকুইপমেন্টের সাপ্লাই ঠিক না থাকলে সৈন্যরা হয়তো শত্রুর হাতে বন্দী হবে কিংবা নিহত হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে তেল, খাবার, চিকিৎসক ও ঔষধ, গোলাবারুদের সাপ্লাই চেইন ও কমান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ধ্বংস করে দিতে পারলে

পৃথিবীর যেকোনো শক্তিশালী বাহিনীই যুদ্ধের ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে বা পরাজিত হতে বাধ্য হয়।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজেকে ও নিজেদের লজিস্টিক ও ইকুইপমেন্ট রক্ষা করার কাজটি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা করতে হয়। এখানে কোন পরিকল্পিত ডিফেন্স থাকে না। কেননা এটা অন্যের রাষ্ট্র বা অন্যের নিয়ন্ত্রিত ভূমি। প্রতিরক্ষা মুলক যুদ্ধে তিনটা সিস্টেম থাকে, শত্রুর উপর হামলা করা, শত্রুর হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজের জনগণকে রক্ষা করা। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বিষয়টি হচ্ছে, এক্ষেত্রে শত্রুর হামলা থেকে নিজের জনগণ, সম্পদ ও স্থাপনা রক্ষা করার কোন ঝামেলা থাকে না, যদি না শত্রু পাল্টা তার ভুমিতে হামলা করে!প্রতিরক্ষা মুলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করার বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত হয়ে থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ভুমি হওয়ার কারনে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে বড় ভারী অস্ত্রের বেশি প্রয়োজন পড়লেও প্রতিরক্ষা মুলক যুদ্ধে ছোট হালকা অস্ত্র বেশি কার্যকরি। মুল কথা হচ্ছে, যুদ্ধের দুইটা ধাপ থাকে, একটি হচ্ছে শত্রুর উপর হামলা করা আরেকটি হচ্ছে শত্রুর হামলায় ধ্বংস হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। প্রতিরক্ষা মুলক যুদ্ধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্মুখের যুদ্ধ থেকে গেরিলা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়ে যায়।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সব সময়ই সম্মুখের যুদ্ধ করতে হয়। সম্মুখের যুদ্ধ হচ্ছে কোন শহর-নগরের দখল শত্রুর থেকে নেওয়া বা শত্রুর দখলে নেওয়া থেকে দখল ধরে রাখা। অর্থাৎ সম্মুখের যুদ্ধের মুল লক্ষ্য থাকে, ভুমির দখল নেওয়া বা ধরে রাখা। বিপরীতে গেরিলা যুদ্ধে কোন ভুমির দখল ধরে রাখা হয় না এবং প্রাথমিক ভাবে কোন ভুমির দখল ধরে রাখার লক্ষ্য উদ্দেশ্যও থাকে না। গেরিলা যুদ্ধের মুল লক্ষ্য থাকে শত্রুর উপর হামলা করে শত্রুকে ধ্বংস করা এবং যতটুকু পারা যায় শত্রুর ক্ষতি করা। শত্রু যখন যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং গেরিলা যোদ্ধাদের হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং শত্রু কিছুটা পলায়ন পর হতে থাকে তখন আস্তে আস্তে ভুমির দখল নেওয়া। যাতে করে শত্রুকে ধাওয়া করা যায় এবং শত্রুকে দ্রুত চলে যেতে বাধ্য করা যায়। পাশাপাশি শত্রু চলে গেলে যেন নিজেদের ভুমি অন্য কারো দখলে চলে না যায় সেই জন্যও আস্তে আস্তে ভুমি দখলে নেওয়া হয়। গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুর উপর হামলা করে জনগণের সাথে মিশে যায় অথবা কোথাও লুকিয়ে পড়ে। যাতে তাদেরকে খুঁজে না পাওয়া যায়।

গেরিলা যুদ্ধের দুইটি মূলনীতি হচ্ছে, এটাক এন্ড হাইড এবং হিট এন্ড রান। এই মূলনীতিতে হামলা করতে হলে স্মল আর্মস সবচেয়ে কার্যকর। যুদ্ধের কিছু মূলনীতি হচ্ছে, শত্রু যেই দিক থেকে শক্তিশালী সেই দিকে আঘাত না করা। শত্রুর দুর্বল দিকে আঘাত করা। শত্রু সামরিক দিক থেকে যেই বিষয়ে শক্তিশালী সেই একই বিষয়ে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা না করা। শত্রু যদি দিনে আঘাত করে এবং দিনে যুদ্ধ করা পছন্দ করে তাহলে তাকে রাতে আঘাত করা এবং তার সাথে রাতে যুদ্ধ করা। একই ভাবে শত্রু যদি বর্ষাকাল অপছন্দ করে বা শীতকাল অপছন্দ করে তাহলে নিজেদেরকে এগুলো পছন্দ করতে হবে। শত্রু সূর্যের আলো চাইলে নিজেদেরকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ চাইতে হবে অথবা চাঁদের আলো চাইতে হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই শত্রুর চাহিদার বিরোধী চাহিদা রাখা যাবে না। এমনটা করলে শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে। এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যে, শত্রু যেটা পছন্দ করে সেই একই বিষয়টা পছন্দ করা নিজেদের জন্যও সুবিধা জনক এবং শত্রুর অপছন্দনীয় বিষয়টা নিজেদের জন্যও অপছন্দনীয় হওয়া উচিত ক্ষতিকারক হওয়ার কারনে!

চতুর্থ অধ্যায়

(যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে)

বর্তমান সময়ে এসেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বাহিনী হচ্ছে, ল্যান্ড ফোর্স। এয়ারফোর্স দিয়ে যেকোনো জায়গায় হামলা করা যায় এবং এয়ারফোর্স গ্রাউন্ড ফোর্সকে সাপোর্ট দিয়ে শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে ভুমির দখল ধরে রাখা এয়ারফোর্স দ্বারা সম্ভব হয় না। একটা এয়ারক্রাফট সর্বোচ্চ হলে দিনে দুই ঘন্টা আকাশে উড়তে পারে। তারপর গ্রাউন্ডেই ল্যান্ড করতে হয়। অর্থাৎ এয়ারফোর্স ২৪ ঘণ্টা একটিভ রাখা যায় না। যেমনটা গ্রাউন্ড ফোর্সকে ২৪ ঘন্টা একটিভ রাখা যায়। তাছাড়া এয়ারফোর্স দিয়ে গ্রাউন্ড ফোর্স ছাড়া খুব একটা গ্রাউন্ডের সিচুয়েশনও চেঞ্জ করা যায় না। গ্রাউন্ড ফোর্স যদি ভালো ফলাফল না করতে পারে তবে এয়ারফোর্স দিয়ে ব্যাপক হামলার দ্বারা হয়তো শত্রুর অনেক ক্ষতি করা যাবে কিন্তু ভূমির দখল ধরে রাখা যাবে না। এই কারনেই ন্যাটোর বিশাল এয়ারফোর্স থাকা সত্বেও আফগানিস্তানে বিজয়ী হতে পারেনি।

২০২২ সালে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার বিশাল এয়ারফোর্স থাকা সত্বেও সুবিধা করতে পারেনি রাশিয়ার ল্যান্ড ফোর্স লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার কারনে। এয়ারফোর্স রাখা যেমন খরচের ব্যাপার তেমনি মেইন্টেন্সও ঝামেলার ব্যাপার। সামান্য ভুল ত্রুটি হলেই ক্রাশ করবে। পাইলটের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ সব সময়ই। যুদ্ধ বিমানের ঠিকঠাক মেইন্টেন্স করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে এবং রানওয়ে ঠিক না থাকলে কোন যুদ্ধ বিমানই আকাশে উড়ানো সম্ভব না। তাছাড়া একেকটা যুদ্ধ বিমানের যা দাম! সেই অর্থ দিয়ে অনেক স্মল আর্মস ক্রয় করা বা তৈরী করা যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় অস্ত্রের চেয়ে ছোট ছোট অস্ত্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বড় অস্ত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শত্রুর হামলায় প্রথম ধাপেই দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলো শত্রুর জন্য খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। এগুলোকে তেমন একটা কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না। যদি শত্রুর ভালো এয়ার ফোর্স ও মিসাইল ফোর্স থাকে তাহল- তো কোন কথাই নাই!বড়

অস্ত্রগুলোর বিশাল মেইন্টেন্স কস্ট ও মেইন্টেন্সের জন্য খুচরা পার্টসের ঝামেলাও আছে। যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি তেল, গোলাবারুদের সাপ্লাই না থাকলে এই সব মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র শস্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের দখলে চলে যায়।

এই কারনেই পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি স্মল আর্মস সাপ্লাই করেছে। আফগানিস্তানের মুক্তিযোদ্ধারা ন্যাটোকে পরাজিত করেছে শুধু মাত্র একে-৪৭ আর RPG-7 এর মতো স্মল আর্মস দিয়ে। যেই আফগানিস্তানে ন্যাটো ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বোমা নিক্ষেপ করেছে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব পক্ষ মিলিয়ে সর্বমোট ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিলো!এত ব্যাপক এয়ারস্ট্রাইকের পরেও আফগানিস্তানের যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহন করা বিশ্বের শীর্ষ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী ৫৫ টি দেশের জোট ২০ বছর যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়ছে এমন এক দলের কাছে যারা সংখ্যায় ছিলো তাদের ১০ ভাগের একভাগ এবং অস্ত্র বলতে সংখ্যার অনুপাতে অপর্যাপ্ত সামান্য কিছু স্মল আর্মস ছাড়া কিছুই ছিলো না!নৌবাহিনী আধুনিক সময়ে খুব একটা যুদ্ধে ভুমিকা রাখে না। নৌবাহিনী কেবল নৌ ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে পারে। ভুমি দখলে থাকলে নৌ সীমানা এমনিতেই দখলে এসে যায়। ভুমি দখলে থাকলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এমনিতেই সমুদ্র সীমানা পাওয়া যাবে। পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো রাষ্ট্র যদি নৌ-সীমানা দখল করে রাখতে চায় তাহলে তাকে ভুমিতে জবাব দিলেই যথেষ্ট!তাছাড়া নৌবাহিনী তৈরীর খরচও অনেক বেশি। তবে নৌবাহিনী যে একেবারেই প্রয়োজন নেই ব্যাপারটা এমন নয়।

প্রতিবেশী নয় এমন কোন রাষ্ট্রের নৌবাহিনীর হামলাকে ঠেকাতে নিজস্ব নৌবাহিনীর কোন বিকল্প নেই। অবশ্য ভালো মানের এয়ারফোর্স থাকলে নৌবাহিনীর হামলা ঠেকানো সম্ভব কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি বহু দুরের রাষ্ট্র হয় তাহলে তার উপরে নৌবাহিনী ছাড়া এয়ারফোর্স দিয়ে হামলা করা সম্ভব না। মুল কথা হচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী হচ্ছে, ল্যান্ড ফোর্স ও এয়ারডিফেন্স ফোর্স। এরপরে এয়ারফোর্স। তারপরে হচ্ছে, নেভাল ফোর্স। গ্রাউন্ড ফোর্সের একজন সৈন্যকে যদি ভালো বেতন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো মানের পোশাক, খাবার, ঔষধপত্র সহ সবকিছুর সাপ্লাই ঠিকমতো দেওয়া যায়। তাহলে ঐ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা যেকোনো বাহিনীর জন্য খুবই কঠিন। সৈন্যদের বুট জুতা, জামা-পাজামা, বুলেট প্রুফ ভেস্ট, ব্যালিস্টিক হেলমেট, নাইট ভিশন স্কোপ ও গগলস, বাইনোকুলার, টার্গেটিং স্কোপ ও লেজার টার্গেটিং সিস্টেম সমৃদ্ধ ওয়েপনস। মাইন ডিটেক্টর সেন্সর, আইইডি নিষ্ক্রিয় করার মতো যথেষ্ট

প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি, আইইডি নিষ্ক্রিয় করার মতো লেজার সিস্টেম ওয়েপনস ইত্যাদি হচ্ছে একটি সেনাবাহিনীর প্রাথমিক চাহিদা। এগুলোতে যদি ঘাটতি থাকে তাহলে ঐ সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না।

বেতন কম হওয়া এবং অন্যান্য সব ইকুইপমেন্টের ঘাটতি সেনাবাহিনীর নৈতিকতা ও মানুষিক শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। তাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা থাকে না। ফলে শত্রুর হাতে কচুকাটা হতে হয়!

পঞ্চম অধ্যায়

(সেনাবাহিনীর বিভক্তিকরন ও গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট সম্পর্কে)

সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধের সুবিধার্থে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। এই ইউনিটগুলোর মাঝে সবচেয়ে ছোট ইউনিট হচ্ছে টিম। একটি টিমে সাধারনত ৪ জন সেনা সদস্য থাকে এবং কমান্ডার হচ্ছে একজন নন-কমিশন্ড অফিসার। দ্বিতীয় ইউনিট হচ্ছে, স্কোয়াড। একটি স্কোয়াডে ৬-১০ জন সেনা সদস্য থাকে এবং স্কোয়াডের কমান্ডার হচ্ছে একজন সার্জেন্ট । তৃতীয় ইউনিট হচ্ছে, প্লাটুন। একটি প্লাটুনে ৩-৪ টি স্কোয়াড বা ১৮-৫০ জন সেনা সদস্য থাকে এবং প্লাটুনের কমান্ডার হচ্ছে একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। চতুর্থ ইউনিট হচ্ছে, কম্পানি বা ব্যাটারি অথবা ট্রুপ। প্রতিটি কম্পানিতে ৩-৪টি প্লাটুন বা ৬০-২০০ জন সেনা সদস্য থাকে এবং কম্পানি বা ব্যাটারি অথবা ট্রুপের কমান্ডার হচ্ছে একজন ক্যাপ্টেন বা ফাস্ট লেফটেন্যান্ট অথবা মেজর। পঞ্চম ইউনিট হচ্ছে, ব্যাটেলিয়ন। প্রতিটি ব্যাটেলিয়নে ৩-৫টি কম্পানি বা ১০০-১০০০ জন সেনা সদস্য থাকে এবং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার হচ্ছে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

ষষ্ঠ ইউনিট হচ্ছে, ব্রিগেড বা রেজিমেন্ট। প্রতিটি ব্রিগেড বা রেজিমেন্টে ৩-৫টি ব্যাটেলিয়ন বা ২ হাজার থেকে নিয়ে ৫ হাজার জন সেনা সদস্য থাকে এবং ব্রিগেড বা রেজিমেন্টের কমান্ডার হচ্ছে একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা কর্নেল। সপ্তম ইউনিট হচ্ছে, ডিভিশন। প্রতিটা ডিভিশনে ৩-৫টি ব্রিগেড বা ১০ হাজার থেকে নিয়ে ১৫ হাজার জন সেনা সদস্য থাকে এবং ডিভিশনের কমান্ডার হচ্ছে একজন মেজর জেনারেল। অষ্টম ইউনিট হচ্ছে, কর্পস। প্রতিটি কর্পসে ২-৩টি ডিভিশন বা ২০ হাজার থেকে নিয়ে ৪৫ হাজার জন সেনা সদস্য থাকে এবং কর্পসের কমান্ডার হচ্ছে একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল।

নবম ইউনিট হচ্ছে ফিল্ড আর্মি। প্রতিটা ফিল্ড আর্মিতে ২টি কর্পস বা ৫০ হাজার

থেকে নিয়ে ১ লক্ষ সেনা সদস্য থাকে এবং ফিল্ড আর্মির কমান্ডার হচ্ছে একজন জেনারেল। সেনাবাহিনীতে আর্মি গ্রুপ ও আর্মি রিজিয়ন নামে আরো দুইটি ইউনিট থাকলেও এগুলো তেমন একটা গঠন করা হয় না। বহু দেশের মোট সেনাবাহিনীর সদস্যই এক লক্ষের নিচে। সেখানে একটি আর্মি গ্রুপ গঠন করা হয় এক লক্ষের বেশি সেনা সদস্য নিয়ে। সাধারণত ন্যাটোর মতো সামরিক জোটে একটি দেশের পাঠানো মোট সৈন্যদেরকে একটি আর্মি গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং ন্যাটোর মতো সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফোর্সকে একটি আর্মি রিজিয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামরিক বাহিনীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ইউনিট হচ্ছে স্কোয়াড ও ব্যাটেলিয়ন।

সামরিক বাহিনীতে ঝটিকা আক্রমণের জন্য বা কোন স্পেশাল অপারেশনের জন্য সৈন্যদেরকে স্কোয়াডে ভাগ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা স্কোয়াডে সর্ব নিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১০ জন সেনা সদস্য থাকে। তবে স্ট্যান্ডার্ড স্কোয়াড গঠন করা ৭ জন ও ১০ জন সেনা সদস্য নিয়ে। ঐতিহাসিক ভাবেও সামরিক বাহিনীতে স্কোয়াড গঠনের অনেক গুরুত্ব ছিলো। যদিও অতীত ইতিহাসে সামরিক বাহিনীকে প্লাটুন, কম্পানি, ব্যাটারি, ট্রুপ, ব্রিগেডে ভাগ করা হতো না!তবে আধুনিক যুগের সামরিক বাহিনীতে গঠিত বিভিন্ন ধরনের ইউনিটগুলোর মাঝে চারটি ইউনিট সিস্টেম স্কোয়াড, ব্যাটেলিয়ন, ডিভিশন ও ফিল্ড আর্মি ঐতিহাসিক ভাবেই ছিলো। স্পেশাল অপারেশনের জন্য স্কোয়াড গুরুত্বপূর্ণ হলেও ওভার অল সামরিক বাহিনীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাটেলিয়ন। মুসলিমদের কাছেও ব্যাটেলিয়ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক ইউনিট। মুসলিমদের ইতিহাসে সর্ব প্রথম যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের মোট সংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। বর্তমানে একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটেলিয়ন হচ্ছে ৩০০ জন সেনা সদস্যর। অতীতে এবং বর্তমানেও কিছু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলিমদের ইতিহাসের সর্ব প্রথম যুদ্ধের সেনা সদস্যদের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে ৩১৩ জন সৈন্য দিয়ে দিয়ে ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছিলো এবং করা হচ্ছে।

মুসলিমরা বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে মক্কার কুফফারদের অত্যাধুনিক এক হাজার সেনা সদস্যর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ করে আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার গায়েবী মদদে। যেই সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন বিশ্ব নাবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লহ সঃ স্বয়ং নিজেই। এই কারনেই এই ৩১৩ সংখ্যাটি মুসলিমদের কাছে বরকতময় একটি সংখ্যা। আফগানিস্তানের বর্তমান IEA এর সরকারের সেনাবাহিনীতেও বদরী ৩১৩ নামের একটি অত্যাধুনিক স্পেশাল ফোর্সের ব্যাটেলিয়ন আছে!৩১৩ জন সেনা সদস্যর একটি ব্যাটেলিয়নের ৭ জন সেনা সদস্য করে নিয়ে ৪৩টি স্কোয়াড ও ৬ জন

সেনা সদস্য করে নিয়ে ২টি স্কোয়াড গঠন করা যায়। অর্থাৎ ৩১৩ জন সেনা সদস্যর একটি ব্যাটেলিয়নে মোট ৪৫ টি স্ট্যান্ডার্ড স্কোয়াড থাকতে পারে।

অতীত ইতিহাসে ময়দানে মুখোমুখি যুদ্ধের সময় তীরান্দাজদেরকে নিয়ে কিছু স্কোয়াড গঠন করা হতো!তাদের কাজ ছিলো যুদ্ধের শুরুতে শত্রুর উপর তীর নিক্ষেপ করা। যুদ্ধ যখন পুরোপুরি শুরু হতো তারা তখন ময়দান থেকে সরে পড়তো। এরপর তাদের মুল কাজ ছিলো প্রতিপক্ষ পালাতে চাইলে তাদেরকে তীর মেরে হত্যা করা। তারা শত্রু সেনাবাহিনীর পালানোর পথে তীর নিয়ে অপেক্ষা করতো। কখনো কখনো এরা পলায়নরত নিজেদের সৈন্যদেরকেও হত্যা করতো। অনেক সময় অনেকগুলো স্কোয়াড একসাথে শত্রুর উপর আচমকা হামলা করে এমনভাবে পালিয়ে যেত, যাতে করে শত্রুপক্ষ তাদেরকে ধাওয়া করতে পারে। ধাওয়া করার এক পর্যায়ে হামলাকারীদের সমস্ত স্কোয়াডগুলো পৃথক হয়ে যেত। এতে করে ধাওয়াকারীরা দ্বিধায় পড়ে যেত যে, তারা কোন দিকে যাবে। এই দ্বিধায় পরে যাওয়া ধাওয়াকারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে হামলাকারীদের পিছনে ধাওয়া করতো। হামলাকারীরাও মুলত এটাই চাইতো। বিক্ষিপ্ত ধাওয়াকারীদেরকে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নিয়ে এসে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতো। মঙ্গলরা এই একই ট্যাকটিক্সটা একটু অন্যরকম ভাবে খাটাতো। তারা আচমকা ঘোড়ার পিঠে থেকেই উল্টো হয়ে ধাওয়াকারীদের উপর তীর নিক্ষেপ করতো।

অতীত ইতিহাসে শত্রুর উপর গুপ্ত হামলা বা আচমকা হামলার জন্য সব দিক দিয়ে পারদর্শী এমন শক্তিশালী সৈন্যদেরকে নিয়ে স্কোয়াড গঠন করা হতো। শত্রুর লজিস্টিক সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়া ও শত্রুর লজিস্টিক লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া, শত্রুর বানিজ্য কাফেলায় হামলা করে লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া, শত্রুর শাসনাধীন এলাকায় হঠাৎ এসে হামলা লুটপাট করে উধাও হয়ে যাওয়া, গেরিলা হামলা করে শত্রুর শক্তি দীর্ঘ মেয়াদে ধ্বংস করা এবং শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায়গুলো অস্থিতশীল করে রাখার জন্য স্কোয়াড গঠন করা হতো!বর্তমানেও এই ধরনের হামলা করে শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোকে অস্থিতশীল করে রাখা এবং এর শাসক সম্প্রদায়কে অযোগ্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের স্কোয়াড গঠন করা হয়ে থাকে।

সাধারন লোকজনের উপর হামলা করার অন্যতম একটি কারন হচ্ছে, ধারাবাহিক এই ভাবে হামলার স্বীকার হওয়ার কারনে জনগণের মন শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিষিয়ে উঠে। এতে জনগণ মনে করে যে, শাসক সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়

কিংবা শাসক সম্প্রদায় নিজেরাই সাধারন মানুষের উপর এই সব হামলায় জড়িত। একটা সময় গিয়ে জনগণ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এতে করে আস্তে আস্তে ঐ দেশটি পুরোপুরি ধ্বসে পড়ে!যা জনগণের উপর হামলাকারীরা চাইতো। এতে ঐ দেশটি দখল করা খুবই সহজ হয়। এই ট্যাকটিক্সটাই আফগানিস্তানে ২০২১ সালে IEA এর সরকার ক্ষমতায় আসার পর দাওলা প্রয়োগ করেছে।

ইতিহাসে সেরা কূটনীতিক ও সমরবীদদের একজন ছিলো হাসান সাব্বাহ!এই লোকের সমরনীতিগুলো আধুনিক যুগের গেরিলা যুদ্ধে বেশ ভালো কার্যকর!হাসান সাব্বাহ এক সময় মিশরের ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রোষানলে পড়ে পালিয়ে এসে সেলজুক সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো। আস্তে আস্তে সে তার নিজ জ্ঞান, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বিশ্বস্ততার মাধ্যমে সে সেলজুক সাম্রাজ্যের পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিতে পরিনত হয়। হাসান সাব্বাহ সব সময়ই বলতো, "আমি ৬ জন সহচর পেলেই সেলজুক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো!" হাসান সাব্বাহ ৬ জন সহচরের কথা বলার একটি বিশেষ কারন আছে। পূর্বেকার সময়ে একটি স্কোয়াড গঠন করতে একজন কমান্ডার ও ৬ জন সেনা নেওয়া হতো। এর কারন হচ্ছে, একটি স্কোয়াড যখন কোথাও অভিযান চালাতো তখন তারাও পাল্টা তীরান্দাজদের হামলার স্বীকার হতো!তীরান্দাজদের তীর থেকে বাচতে প্রতিটি স্কোয়াডের ৬ জন সৈন্য ঢাল নিয়ে ৩৬০ ডিগ্রি এংগেলে ঘুরে বসে যেত!প্রতিটা সৈন্য ঢাল দিয়ে ৬০ ডিগ্রি কাভার করতো। আর কমান্ডার ঢাল দিয়ে প্রতিপক্ষের তীরগুলোকে ঠেকিয়ে দেওয়া সৈন্যদের ঠিক মাঝে অবস্থান করে প্রতিপক্ষের দিকে পাল্টা তীর নিক্ষেপ করতো!

আবার কখনো কখনো একজন কমান্ডার সহ মোট ১০ জন সৈন্য নিয়েও স্কোয়াড গঠন করা হতো!তখন এই সব স্কোয়াড হামলার স্বীকার হলে ৮ জন সৈন্য ৩৬০ ডিগ্রি এংগেলে ঢাল নিয়ে বসে যেত!প্রত্যেক সৈন্য ঢাল দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি কাভার করতো!আর কমান্ডার সহ আরেকজন সৈন্য ঢাল দিয়ে ঘিরে রাখা সৈন্যদের মাঝে অবস্থান করে শত্রুর সৈন্যদের উপর পাল্টা তীর নিক্ষেপ করতো!বর্তমান সময়ে এই ধরনের তীর ঢালের প্রচলন না থাকলেও শত্রুর যেকোন দিক থেকে শুরু হওয়া হামলা থেকে বাঁচতে এবং চতুর্দিকেই নজর রাখতে অনেক স্কোয়াডই ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরে তারপর অভিযান পরিচালনা করে!অতীত ইতিহাসের যুদ্ধগুলোতে একত্রে থাকা বিশাল সামরিক বাহিনী চতুর্দিকে ও সৈন্যদের মাথার উপরে ঢাল ধরলেও শত্রুর তীর নিক্ষেপ থেকে বাঁচতে পারতো না!কখনো কোন মতে তীরের আক্রমণ ঢাল দিয়ে ঠেকাতে পারলেও শত্রুর উপর পাল্টা তীর নিক্ষেপ করতে পারতো না। এই কারনেও

অনেক সময় বিশাল সামরিক বাহিনীকে স্কোয়াডে ভাগ ভাগ করে পরিচালনা করা হতো!আবার বিশাল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের ছোট ছোট স্কোয়াডে ভাগ করে দেওয়া যেকোন ছোট সেনাবাহিনীও অনেক ক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করতো!

যদি স্কোয়াডে ভাগ করে দেওয়া তুলনামূলক অনেক ছোট সেনাবাহিনীটি পরাজিত হতো তবুও স্কোয়াডে ভাগ করে দেওয়া ছোট সেনাবাহিনীটির তুলনায় এক সাথে থাকা বৃহৎ সেনাবাহিনীর অধিকারী শত্রুর হতাহতের পরিমাণ অনেক বেশি হতো। ইসলামের ইতিহাসে ছোট ছোট স্কোয়াডে ভাগ করে ছোট সেনাবাহিনী নিয়ে বিশাল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার ট্যাকটিক্সটি সবচেয়ে সফল ভাবে ব্যাবহার করে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন সুলতান সালেহ আদ-দ্বীন রঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(আধুনিক যুগে সামরিক বাহিনীর প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে)

সামরিক বাহিনীতে অনেক ধরনেরই অস্ত্র-শস্ত্র থাকে। সেই সব অস্ত্রগুলোকে প্রথমত লাঞ্চার ও বারুদে ভাগ করা হয়ে থাকে। বারুদ দুই প্রকার হতে পারে, গাইডেড ও আন-গাইডেড। আবার এই লাঞ্চার এবং বারুদের গাইডেড ও আন-গাইডেড উভয় প্রকার মিলিয়েই এগুলো মোটা দাগে স্মল ওয়েপন ও হেভি ওয়েপনে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। স্মল ওয়েপন হচ্ছে সেগুলো, যেগুলোকে সৈন্যরাই বহন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। একটি সামরিক বাহিনীর মুল ওয়েপনস হচ্ছে স্মল-ওয়েপনস। বিভিন্ন ধরনের স্মল ওয়েপনস আছে। সেই সমস্ত অস্ত্রের মাঝে সর্ব প্রথম বলা যায় ছুরির কথা!বিভিন্ন ধরণের ছুরি হচ্ছে এমন একটি অস্ত্র যা লাঞ্চারও না আবার বারুদও না। কাউকে নিঃশব্দে হত্যা করতে চাইলে এখনো ছুরির কোন বিকল্প নাই। কোন সামরিক ক্যাম্পে নিঃশব্দে অভিযানের জন্যও ছুরি অপরিহার্য অস্ত্র। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ছুরি দিয়ে যত মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার সিকিভাগের এক ভাগও আধুনিক অস্ত্র দিয়ে করা সম্ভব হয়নি।

ছুরি দিয়ে হত্যা করার ক্ষেত্রে তেমন কোন ব্যায়ও নেই। শুধু মাঝে মাঝে ধার দিতে হয়। আর ছুরি ভেঙে গেলে নতুন ছুরি কিনতে যেই ব্যায় হয় সেটাই মুলত ছুরি দিয়ে হত্যা করার পিছনে মুল ব্যায়। নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখার মতো সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হচ্ছে, ছুরি। ছুরি দিয়ে নিজের হাতের বাঁধন কেটে কিংবা কারাগারের মাটির নিচ দিয়ে টানেল খনন করে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও রয়েছে অনেক। ছুরি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফলমুল মাংস কেটে খাওয়া সহ আরো অনেক কিছু করা যায়, যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব না। কোন সৈন্য বুলেটের আঘাতে আহত হলে তার শরীর থেকে বুলেট বের করে ব্যান্ডেজ করার জন্য ছুরি অপরিহার্য একটি বস্তু।

আধুনিক সময়েও ছুরি প্রতিটা সৈন্যর কাছেই থাকে। আধুনিক রাইফেলের মাথায়ও

ছুরি লাগানোর ব্যাবস্থা থাকে। যখন রাইফেলের বুলেট শেষ হয়ে যায় তখন একজন সৈন্যর কাছে ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র থাকে না। বুলেট ছাড়া রাইফেল হয়ে যায় একটি ভারি একটি লাঠির মতো, এটার মাথা ছুরি লাগানোর দ্বারা এটা একটা বল্লমে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক সময়ে এসেও কোন আদিম যুগের কোন অস্ত্রই একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি। আগের যুদ্ধাস্ত্র তীর, বর্শা বা বল্লম সহ অন্যান্য অস্ত্রগুলোও মুখোমুখি বা স্বল্প দুরত্বের যুদ্ধে এখনো কার্যর। বর্তমান সময়ে শুধু আগের অস্ত্রগুলোর কোয়ালিটির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র, মুল সিস্টেমের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি!আগে পাথরের আর্টিলারি ফায়ার করা হতো এখন বারুদ ভর্তি গোলা ফায়ার করা হয়। পরিবর্তন শুধু এতটুকুই!আদিম অস্ত্র তীর এখনো কোন সৈন্যের সরাসরি মুখোমুখি না হয়ে ক্লোজ রেঞ্জে নিঃশব্দে হত্যা করার জন্য সবচেয়ে ভালো কার্যকর অস্ত্র।

কোন সৈন্যকে নিঃশব্দে হত্যা করার জন্য তীরের মাথায় বিশ লাগিয়ে নিলে-তো কথাই নাই, কিল কনফার্ম। ঐ সৈন্য যদি ব্যালিস্টিক হেলমেট আর শরীরে বুলেট প্রুফ ভেস্ট বা বুলেট প্রুফ আর্মার পরা অবস্থায় থাকে তাহলে তীর দিয়ে তাকে হত্যা সম্ভব না। তবে একজন সৈন্যর পক্ষে শীতকাল না হলে গরম কালে এই ধরনের ভেস্ট বা আর্মার সব সময় পরে থাকা সম্ভব না। আধুনিক রাইফেলে সাইলেন্সার লাগানোর পরেও যথেষ্ট শব্দ হয়, যেটা তীরের ক্ষেত্রে খুবই অল্প!শব্দ হলেই আশেপাশে থাকা শত্রু বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যরা সাবধান হয়ে যায়। তখন আর গুপ্ত হামলা চালানো সহজ হয় না, তখন সরাসরি যুদ্ধে রুপ নেয়। দুর থেকে সৈন্যদের কোন রসদে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তীর এখনো সবচেয়ে ভালো সিস্টেমগুলোর একটি। তীর বাদে এই কাজটি শুধুমাত্র আধুনিক যুগের লেজার ওয়েপনস দিয়েই করা যায়। এমনকি আধুনিক সময়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য লোহার পেরেকও অনেক ফায়দা দেয়। সৈন্যদের ক্যাম্পের তাবু খাটানো, বাংকার তৈরী করার ক্ষেত্রে বাংকারের ভেতরে একটি কাঠ অপর কাঠের সাথে আটকে দেওয়া থেকে নিয়ে শত্রুর গাড়ির চাকা পাংচার করে দেওয়ার জন্য ফাঁদ পাতা পর্যন্ত সব জায়গাতেই সামান্য লোহার পেরেকও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর অস্ত্র বা যুদ্ধের ইকুইপমেন্ট হয়ে উঠতে পারে!

সপ্তম অধ্যায়

(আন-গাইডেড স্মল ওয়েপনস সম্পর্কে)

৯ মিঃমিঃ এর পিস্তল বা হ্যান্ড গান হচ্ছে সবচেয়ে ছোট অস্ত্রগুলোর একটি। একজন সৈন্য অনায়াসেই একটি হ্যান্ড গান লুকিয়ে নিজের শরীরে বহন করতে পারে। যেকোনো স্পেশাল অপারেশনের জন্য এবং ক্লোজ রেঞ্জে যুদ্ধের জন্য পিস্তল বা হ্যান্ড গান সবচেয়ে কার্যকরি অস্ত্র।

সামরিক বাহিনীর প্রথম ও প্রধান অস্ত্র হচ্ছে ৫.৫৬ মিঃমিঃ ও ৭.৬২ মিঃমিঃ এর এসল্ট বা ব্যাটেল রাইফেল। এই রাইফেলগুলোতে যদি টার্গেটিং স্কোপ বা লেজার টার্গেটিং সিস্টেম ও নাইট ভিশন স্কোপ লাগানো থাকে তাহলে তো কথাই নাই!আধুনিক রাইফেলে সাইলেন্সারও লাগানো থাকে। সাইলেন্সার লাগানোর দ্বারা বুলেট ফায়ারের শব্দ অনেকটা কমে যায়।

কর্নারশট রাইফেলগুলো যেকোনো স্পেশাল অপারেশনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুল রাইফেল থেকে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, যেকোনো দেয়াল বা কোন প্রতিবন্ধকতার কারনে যে কর্নার তৈরী হয় সেখানে কি আছে এটা দেখা যায় এবং টার্গেটে ফায়ার করা যায় এই ধরনের রাইফেলের সামনের একটি অংশ বাঁকানোর দ্বারা!যা সাধারণ রাইফেল দিয়ে করা যায় না এবং শুটও করা যায় না। সাধারণ রাইফেলের ক্ষেত্রে ঐ বাঁকানো অংশের কাজ করার জন্য কর্নারে স্ব-শরীরের একজন সৈন্যকে যেতে হয়। যা ঝুঁকিপূর্ণ, যাওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর গুলি খেয়ে সৈন্যরা নিহত বা আহত হতে পারে। যা কর্নারশট রাইফেলের ক্ষেত্রে হয় না। বরং আরো এটা দিয়ে শত্রুকে শত্রুর দৃষ্টি সীমানার ভিতরে আসার আগেই শত্রুকে হত্যা করে ফেলা যায়!

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শটগান রয়েছে। তার মাঝে একটি ধরন হচ্ছে, রাইফেলের ব্যারেলের নিচ দিয়ে সংযুক্ত করা শটগান সিস্টেম। এই সিস্টেমটা

সবচেয়ে আধুনিক সিস্টেম। শটগানের ক্যালিবারের সিস্টেমও অন্যান্য গানের ক্যালিবারের সিস্টেম থেকে ভিন্ন ধরনের হয়। শটগান দিয়ে বাটার ফ্লাই বুলেটের মতো বুলেটগুলো ফায়ার করা হয়। বাটার ফ্লাই বুলেটগুলো মানুষের শরীরে আঘাত করার পরে ভিতরে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। এতে করে মানব দেহের ভিতরের হাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এমনভাবে যা জোড়া লাগা সম্ভব না। ফলে আক্রান্ত স্থান থেকে কেটে ফেলতে হয়। পঙ্গু বানানোর জন্যই এই ধরনের বুলেট ব্যাবহার করা হয়। এই ধরনের বুলেট ব্যাবহার করা আন্তর্জাতিক ভাবে নিষিদ্ধ হলেও ইসরাইলের সন্ত্রাসী বাহিনী ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর এটা প্রয়োগ করে হরহামেশাই। এতে করে দীর্ঘ মেয়াদে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা একটি পঙ্গু জাতি হিসেবে তৈরী হবে। পঙ্গুত্ব যে কতবড় অভিশাপ তা যারা হয় তারাই কেবল বুঝে।

পঙ্গু হয়ে যাওয়া মানুষদের বড় একটা অংশই নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকে সব সময়। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে হয় তাদের কাছে!এর কারন হচ্ছে সবার অবহেলা!পঙ্গু মানুষদের পাশে তাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনও তেমন একটা থাকে না। এই পঙ্গুদের কষ্ট দেখে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা বিশেষ করে তরুণরা যাতে এই ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার মনস্তাত্ত্বিক সাহস হারিয়ে ফেলবে দীর্ঘ মেয়াদে। ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর এই বাটার ফ্লাই বুলেট ব্যাবহার করার পিছনে এই সবই ইসরাইলের সন্ত্রাসী বাহিনীর মুল উদ্দেশ্য!

অষ্টম অধ্যায়

(স্নাইপারদের প্রকারভেদ ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে)

গ্রাউন্ড ফোর্সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে স্নাইপাররা। স্নাইপারদের মুল অস্ত্র হচ্ছে এই ৭.৬২ মিঃমিঃ এর স্নাইপার রাইফেল এবং ১২.৭ মিঃমিঃ এর এন্টি ম্যাটারিয়াল স্নাইপার রাইফেল। স্নাইপার রাইফেলে টার্গেটিং সিস্টেম ও সাইলেন্সার-তো থাকবেই পাশাপাশি যদি নাইট স্কোপ থাকে তাহলে স্নাইপাররা শত্রুর জন্য সব সময়ই আতঙ্ক হয়ে থাকবে, বিশেষ করে রাতের বেলা। ১২.৭ মিঃমিঃ এর এন্টি ম্যাটারিয়াল স্নাইপার রাইফেলধারী স্নাইপাররা সব সময়ই সাধারণ সৈন্যদের দৃষ্টির সীমার বাহিরে থাকে। এই ধরনের স্নাইপাররা এক কিলোমিটার দুর থেকে অনায়াসেই শুট করতে পারে এবং সৈন্যদের শরীরে থাকা যেকোনো ধরনের বুলেট প্রুফ সিস্টেম ও মিডিয়াম ধরনের যেকোনো আর্মির অনায়াসেই ভেদ করতে পারে। ৭.৬২ মিঃমিঃ এর স্নাইপার রাইফেল ধারী স্নাইপারদের অনেকেই সাধারণ সৈন্যদের দৃষ্টি সীমার ভিতরে থেকে হামলা করলেও ক্যামোফ্লেজ করে থাকা ও অবস্থানের কারনে সাধারণ সৈন্যরা স্নাইপারদেরকে দেখতে পায় না এবং অবস্থানও শনাক্ত করতে পারে না।

ক্যামোফ্লেজের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে গিরগিটি। গিরগিটি যখন যেই পরিবেশে যায় তখন নিজে সেই পরিবেশের রং ধারণ করে। এতে করে গিরগিটিকে চিহ্নিত করা যায় না। দুর থেকে বুঝাই যায় না যে এখানে কোন গিরগিটি আছে। ঠিক একই ভাবে স্নাইপাররাও এমন রংয়ের পোশাক পরে এমন ভাবে আকৃতি ধারন করে নিজেদের রং পাল্টে ফেলে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিলে যায় যা দেখে কেউ বুঝতে পারে না যে এখানে কেউ আছে। এক কথায় ক্যামোফ্লেজ হচ্ছে, সেই সিস্টেম যা নিজেকে পরিবেশের সাথে এমন ভাবে মিলিয়ে রাখে যেখানে পরিবেশ থেকে ব্যাক্তিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে থাকে। যেকোনো ধরনের উদ্ধার অভিযানে বা বন্দী বিনিময়ের স্থানে নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য অথবা নিজেদের বন্দী লোককে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর শত্রুপক্ষের

বন্দী ও বন্দী বিনিময় করতে আসা শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করার ক্ষেত্রে স্নাইপারদের সবচেয়ে বেশি ভুমিকা থাকে। স্নাইপারদেরকে ডিটেক্ট করার জন্য ড্রোন, হেলিকপ্টার অথবা একই ধরনের আরেকদল স্নাইপারের প্রয়োজন পড়ে। তবে সন্দেহযুক্ত স্থানে ব্যাপক গান ফায়ারের কারনেও অনেক স্নাইপাররা নিহত হয় বা অবস্থান ত্যাগ করতে অথবা হামলা বন্ধ করে পালাতে বাধ্য হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, একজন পুরুষ টানেল ভিশনের অধিকারী হয়ে থাকে আর একজন নারী ফেরিফেরাল ভিশনের অধিকারী হয়ে থাকে। এই কারনেই আমরা দেখতেই পাই যে, পুরুষরা যেই সব জিনিস খুঁজে পায়না নারীরা সেই সব জিনিস অনায়াসেই খুঁজে পায়। একজন পুরুষ বহু দুরের কোন বস্তু দেখতে পেলেও আশেপাশের বস্তু তেমন একটা দেখতে পায় না। বিপরীতে নারীরা আশেপাশের বস্তু বেশি দেখতে পায় কিন্তু দুরের বস্তু তুলনামূলক কম দেখে। পুরুষের দৃষ্টি শক্তি প্রশস্ত নয়। সাধারণত পুরুষের দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট একটি বস্তুর দিকে বেশি ফোকাস করে। বিপরীতে নারীদের দৃষ্টি শক্তির প্রশস্ততা বেশি হয় পুরুষের তুলনায়!নারীদের দৃষ্টি শক্তি দুরের বস্তুর প্রতি অথবা নির্দিষ্ট একটি বস্তুর প্রতি ফোকাস কম করতে পারে। এই দৃষ্টি শক্তির পার্থক্যের কারনেই অতীতে পুরুষরা বন-জঙ্গলে খাবার জন্য শিকার ধরতো আর নারীরা ফলমুল খুঁজতো। কেননা পুরুষের টানেল ভিশন নির্দিষ্ট শিকারের প্রতি ফোকাস করে শিকার ধরতে বেশি উপযোগী আর নারীদের ফেরিফেরাল ভিশন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফলমুল খুঁজে পেতে বেশি উপযোগী। এমনিভাবে যুদ্ধে নারীরা স্নাইপার রোলে সবচেয়ে ভালো পারফর্মেন্স করে। এমনকি সেটা পুরুষের চেয়েও বেশি।

পুরুষের টানেল ভিশনের কারনে নির্দিষ্ট বস্তুকে টার্গেট করে ফায়ার করার উপযোগী হলেও একজন স্নাইপারের জন্য টার্গেট ফায়ার করাটাই মুল কাজ না। একজন স্নাইপারকে যুদ্ধের বিস্তীর্ণ ময়দানে প্রশস্ত জায়গায় টার্গেট খুঁজে বের করতে হয় এবং প্রতিপক্ষের স্নাইপারকেও খুঁজে বের করতে হয়, যেটা অনেক কঠিন ব্যাপার। নারী স্নাইপারদের ক্ষেত্রে এটা পুরুষের তুলনায় সহজ হয় তার ফেরিফেরাল ভিশনের কারনে!স্নাইপার রাইফেলের টেলিস্কোপের কারনে পুরুষের দুর দৃষ্টির আলাদা কোন কদর থাকে না। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টি শক্তিই একই রকমের কার্যকর হয়। তবে সাধারণ রাইফেল দিয়ে ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পুরুষের দুর-দৃষ্টির আলাদা একটি কদর আছে। পুরুষের দুর-দৃষ্টির কারনে শত্রুর উপর নিখুঁত হামলা করা যায়। স্নাইপারদেরকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় শত্রুর উপর হামলা করার জন্য এবং শত্রুর হামলা থেকে বাচার জন্য। নারীরা পুরুষের তুলনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যা একজন নারী স্নাইপারকে বেশি সুবিধা দেয় পুরুষের তুলনায়। তবে একটি যুদ্ধের কমান্ড পুরুষের হাতে থাকার কোন বিকল্প নেই। কেননা একজন পুরুষ দীর্ঘ সময় ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। যুদ্ধের কমান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ভেবে চিন্তা সিদ্ধান্ত না দিলে পরাজয় বা ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে।

একজন স্নাইপারের জন্য প্রতিপক্ষের স্নাইপারকে খুঁজে পাওয়া ও প্রতিপক্ষের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সঠিক সময়ে স্থান পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ভালো অনুমান শক্তির প্রয়োজন পড়ে। নারীর অনুমান শক্তি পুরুষের তুলনায় খুবই তীব্র হয়ে থাকে। এই জন্যই বলা হয় যে, পুরুষের চাক্ষুষ সত্য আর নারীর অনুমান উভয়টাই সমান। নারীর অনুমান তেমন একটা ভুল হয় না বললেই চলে। এই সব কারনেই একজন নারী একজন পুরুষের চেয়ে ভালো স্নাইপার হয়ে থাকে।

নবম অধ্যায়

(মেশিনগানের প্রকারভেদ, এর ব্যাবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে)

৫.৫৬ মিঃ মিঃ এর লাইট মেশিন গান হচ্ছে একজন সৈন্যের জন্য সবচেয়ে সহজে বহন ও ফায়ারের যোগ্য মেশিন গান। অনবরত ফায়ারের জন্য মেশিন গানের কোন বিকল্প নেই। লাইট মেশিন গান দিয়ে একজন সৈন্য দণ্ডায়মান ও চলমান অবস্থায়ই ফায়ার চালিয়ে যেতে পারে। যা অন্যান্য মেশিন গান দিয়ে সম্ভব নয়।

৭.৬২মিঃমিঃ এর জেনারেল পারপাস মেশিন গান ও এটার উপর ভিত্তি করে নির্মিত গান পড হচ্ছে মেশিনগানের মাঝে একজন সৈন্যর জন্য সহজে বহন যোগ্য এবং এবং ভালো ফায়ার ক্ষমতার অধিকারী মেশিনগান। এই ধরনের মেশিন গানের সর্বোচ্চ রেঞ্জ হয় ৭০০-৮০০ মিটার পর্যন্ত।

৯মিঃমিঃ সাব মেশিনগানও যুদ্ধ ক্ষেত্রে জেনারেল পারপাস মেশিনগানের মতোই একটি কার্যকরী অস্ত্র। বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর হত্যার সময় এই ধরনের চারটি সাব মেশিনগান ব্যাবহার করা হয়েছিলো।

১২.৭মিঃমিঃ এর মেশিন গান হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড একটি হেভি মেশিন গান ও১৪.৫মিঃমিঃ এর মেশিন গান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ার তৈরী একটি হেভি মেশিনগান। বর্তমানে বিশ্বে যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যাবহৃত অস্ত্র হচ্ছে এই দুইটি স্ট্যান্ডার্ডের মেশিনগান। শত্রুর সাধারণ দৃষ্টি সীমার বাহিরে থেকেই শত্রুর উপর বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় বুলেট ফায়ার করার জন্য এই ধরনের মেশিনগানগুলোর কোন বিকল্প নেই। তুলনামূলক ওজন হালকা হওয়া এবং রেঞ্জ বেশি হওয়ায় এর জুড়ি মেলা ভার। এগুলোর আরো একটি সুবিধা হচ্ছে, এগুলো এন্টি এয়ারক্রাফট রোলেও ব্যাবহার করা যায়। সাধারণত লো অল্টিটিউডে উড়ে যাওয়া যেকোনো হেলিকপ্টার, যুদ্ধ বিমান ও ড্রোন ধ্বংস করা যায় এই ধরনের মেশিনগানগুলো দিয়ে

সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া ও ইয়ামানের যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহার হয়েছে। সিরিয়াতে রাশিয়ার অনেকগুলো হেলিকপ্টার ও যুদ্ধ বিমান এই ধরনের মেশিন গানের হামলায় ধ্বংস হয়েছে। সেই ধ্বংসের লিস্টে আছে Su-30, Su-33 এর মতো আধুনিক যুদ্ধ বিমান এবং KA-52 এর মতো আধুনিক হেলিকপ্টার। সিরিয়াতে বিদ্রোহীরা ম্যানপ্যাড তো নয়ই তেমন কোন এন্টি এয়ারক্রাফট গানেরও সাপ্লাই পায়নি। শত্রুর থেকে প্রাপ্ত গনিমতের এন্টি-এয়ারক্রাফট ওয়েপনস ব্যাতিত!

এই ১২.৭ মিঃমি ও ১৪.৫ মিঃমিঃ এর বিভিন্ন ধরনের মেশিন গানগুলোর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হয় ১.২-১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। এগুলোর আরো একটি সুবিধা হচ্ছে, পার্টস ভাগ ভাগ করে কয়েকজন সৈন্য মিলেই এই ধরনের মেশিনগানগুলো বহন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। তবে ১৪.৫ মিঃমিঃ এর মেশিন গানকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এন্টি এয়ারক্রাফট রোলে ব্যাবহার করা হয় আর ১২.৭ মিঃ মিঃ এর মেশিন গানকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্ফেস টু সার্ফেস রোলে ব্যাবহার করা হয়। ১৪.৫ মিঃমিঃ এর পর থেকে ৩০ মিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যালিবারের এন্টি এয়ারক্রাফট গান, চেইন গান বা ক্যানন সিস্টেম আছে। তার মাঝে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ক্যালিবারের গান সিস্টেম হচ্ছে ৩০ মিঃমিঃ এর ক্যানন বা এন্টি এয়ারক্রাফট গান। এই ধরনের ৩০ মিঃমিঃ এর গানগুলোকে এন্টি ট্যাংক গানও বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাউন্ড এ্যাটাক এয়ারক্রাফট A-10 থান্ডার বোল্টের এন্টি ট্যাংক গান পডের ক্যালিবারও ৩০ মিঃমিঃ এর।

২০২২ সালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইউক্রেনের BTR-80 এপিসির ৩০ মিঃমিঃ এর গান দিয়ে রাশিয়ার অনেকগুলো T-72 ধ্বংস করে ফেলছে। এক্ষেত্রে ইউক্রেনের এপিসিগুলো রাশান ট্যাংকের ভিতরে রাখা গোলাবারুদের জায়গা বরাবর টার্গেট করে ফায়ার করেছে। এতে ট্যাংকের ভিতরে থাকা নিজের গোলাবারুদের বিস্ফোরনে ট্যাংক নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের গানগুলো পার্টস পার্টস করে সৈন্যদের কাঁধে বহন করা ওজনের কারনে কষ্টকর হলেও সৈন্যদের জন্য অল্প দুরত্বের জায়গায় বহন করা কঠিন কিছু না। ৩০ মিঃমিঃ এর ক্যালিবার পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গানগুলোর আরেকটি সুবিধা হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে উপযোগী টয়োটা হাইল্যাক্সের মতো গাড়িগুলোতে এই ধরনের গানগুলো বসিয়ে অনায়াসেই টার্গেটে ফায়ার করে খুব দ্রুতই স্থান ত্যাগ করা যায়। ৩০ মিঃমিঃ এর গানগুলো এন্টি এয়ারক্রাফট রোলেও বেশ ভালো পারফর্মেন্স করে। এন্টি এয়ারক্রাফট রোলে এগুলোর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হয় ৩ কিলোমিটারেরও বেশি। যখন এই ধরনের গানগুলো টয়োটা হাইল্যাক্সের

মতো হাই স্পিডের গাড়িতে ইনস্টল করা থাকে তখন-তো অব্যাহত ফায়ারের মুখে এয়ারস্ট্রাইক চালাতে গিয়ে এয়ারক্রাফটগুলো আরো সমস্যায় বেশি সমস্যায় পড়ে গ্রাউন্ড স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে।

এন্টি এয়ারক্রাফট রোলে ব্যাবহার করা অবস্থায় আন-গাইডেড ওয়েপনস দিয়ে এগুলোকে ধ্বংস করা খুব কঠিন হয়ে যায়। কেননা আন-গাইডেড ওয়েপনস এয়ারক্রাফট থেকে ড্রপ করার পর ড্রাইভার যদি চতুর হয় তাহলে সাথে সাথেই গাড়ির অবস্থান দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলে। তবে গাইডেড ওয়েপনস থেকে বাঁচা কষ্টকর। আবার হামলা করে দ্রুত সরে পড়ার কারনেও শত্রুর এয়ারক্রাফট এগুলোকে খুঁজে পায় না সহজেই!এই ধরনের মেশিনগান, চেইনগান বা ক্যাননগুলো হয়তো সিঙ্গেল ব্যারেলের হয়ে থাকে অথবা পড সিস্টেমের হয়ে থাকে। এই উভয় প্রকারই আবার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমেরও হতে পারে। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম হলে কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রের ডিফেন্স লাইনে এগুলো বসিয়ে নিরাপদ দুরত্বে বসেই শত্রুর আক্রমণকে ঠেকানো যায়। অথবা শত্রুর উপর আক্রমণ করলেও এর অপারেটর শত্রুর পাল্টা হামলা থেকে নিরাপদ দুরত্ব থাকতে পারে। যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অপারেটরের চেয়ে রিমোট কন্ট্রোল অপারেটরকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়!রিমোট কন্ট্রোল হওয়ার কারনে ম্যানুয়াল সিস্টেমের গানারের মতো শত্রুর হামলা থেকে নিজেকে বাঁচানোর কোন ঝামেলা না থাকায় শত্রুর ব্যাপক এয়ারস্ট্রাইকের সময়েও ম্যানুয়াল সিস্টেমের তুলনায় ব্যাপক ফায়ার করা যায়।

সিরিয়ার যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ১২.৭ মিঃমিঃ এর রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গান নিজেরাই তৈরী করেছিলো এবং ব্যাবহারও করেছিলো। এই ধরনের রিমোট কন্ট্রোল মেশিনগান যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সুবিধা দেয়। সিরিয়ার বিদ্রোহীরা যদি এটার ব্যাপক প্রোডাকশন করতে পারতো তবে এটা দিয়ে তারা শত্রুকে বেশ ভালো নাকানি চুবানি খাওয়াতে পারতো। রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গানগুলো ডিফেন্স লাইনে স্থাপন করার সিস্টেম হচ্ছে, মাটির নিচে এমন ভাবে লুকানো থাকবে যাতে বুঝা করে বুঝা যাবে না যে, এখানে মাটির নিচে কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে। শত্রু যখন এটার রেঞ্জের মাঝে আসবে তখনই মাটির নিচ থেকে এটা উপর উঠে ফায়ার শুরু করবে। এতে করে শত্রু হকচকিয়ে যাবে এবং অনবরত ফায়ারের কারনে কোথাও আশ্রয় নেওয়ারও সময় পাবে না। হামলা থেকে বাঁচাতে কোথাও আশ্রয় নিতে নিতে সৈন্যদের বড় একটা অংশ নিহত হয়ে যাবে। এগুলো ফায়ার করার পর আবার মাটির নিচে চলে যাওয়ার সিস্টেম ছিলো। এগুলো যেকোনো দেশের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গড়ে তোলা ডিফেন্স

লাইনে ব্যাপক পরিমাণে স্থাপন করা গেলে বেশ ভালো কাজ হবে। তবে গাদ্দারদের মাধ্যমে শত্রু আগেই এগুলোর অবস্থান জেনে গেলে তেমন একটা কাজে আসবে না!বরং শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা শত্রুর দখলে চলে যাবে!

দশম অধ্যায়

(লেজার ওয়েপনস এর আবিষ্কারক ও আধুনিক যুগে এর ব্যাবহার সম্পর্কে)

লেজার ওয়েপনস এর শুরুটা করেছিলেন গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস!আর্কিমিডিস এর জন্ম শহর সিরাকিউস একবার রোমানরা বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে দখল করতে আসে। তখন আর্কিমিডিস নিরাপদ দুরত্বে থেকেই একটি কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে রোমান নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর পালে আগুন ধরিয়ে দিতে সক্ষম হন। এতে জাহাজে থাকা সদস্যরা অবাক হয়ে যান যে, জাহাজের আশেপাশে শত্রুদের কেউ না আসা সত্বেও কিভাবে জাহাজের পালে আগুন ধরলো। তখনকার সময়ে জাহাজে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করার সিস্টেম ছিলো, তীরের মাথায় কাপড় বেঁধে তাতে কোন দাহ্য পদার্থ লাগিয়ে সেই তীরটি জাহাজে নিক্ষেপ করা। বর্তমানে সেই শহরটি ইতালির অন্তর্ভুক্ত হলেও তখন এটি গ্রীসের দখলে ছিলো।

ম্যান পোর্টেবল লেজার সিস্টেম ওয়েপনস শত্রুর ছোট রিকোনাইসেন্স ড্রোন বা সুইসাইড ড্রোন ধ্বংস করতে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র। শত্রুর কোন স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য লেজার ওয়েপনস সবচেয়ে আধুনিক সিস্টেম। আগে এই কাজটি করা হতো তীরের মাথায় কাপড় বেঁধে সেই কাপড়ে দাহ্য পদার্থ লাগিয়ে তীর শত্রুর স্থাপনায় নিক্ষেপ করা হতো। লেজার ওয়েপনসের কারনে বহু দুর থেকেই শত্রুর রসদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাবে। শত্রু বুঝতেই পারবেনা কোথা থেকে কিভাবে আগুন লাগলো!শত্রুর পেতে রাখা বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক সিস্টেমের বিস্ফোরনের এড়িয়ার বাহিরে থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ম্যান পোর্টেবল লেজার ওয়েপনস একটি উত্তম সমাধান।

এগারোতম অধ্যায়

(যুদ্ধে ব্যাবহৃত বিস্ফোরক ধরনের প্রাথমিক অস্ত্র গ্রেনেড সম্পর্কে)

হ্যান্ড গ্রেনেড হচ্ছে হাতে নিক্ষেপ করার মতো সবচেয়ে সহজ অস্ত্র। এর জন্য কোন লাঞ্চারে প্রয়োজন পড়ে না। হ্যান্ড গ্রেনেডের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ আছে। কিছু আছে শুধু ধোঁয়া তৈরী করে কিংবা বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়াইয়া দেয়, আবার কিছু আছে বিস্ফোরন ঘটায়। হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে যেকোন ব্যাক্তিকে হত্যা করা যায় এবং সাধারণ কোন গাড়িতেও বিস্ফোরন ঘটিয়ে ধ্বংস করা যায়। সিঙ্গেল গ্রেনেড লাঞ্চার সিস্টেমের গ্রেনেড,

এটা রাইফেলের মতোই নির্দিষ্ট টার্গেটে ফায়ার করা হয়। তবে রাইফেলের মতো লাগাতার ফায়ার করা যায় না। একটা গ্রেনেড লাঞ্চারে ঢুকানো হয় এবং ফায়ার করা হয়, আবার একটা ঢুকানো হয় এবং ফায়ার করা হয়, এভাবেই চলতে থাকে। রাইফেলের চেয়ে এটার ভালো দিক হচ্ছে, রাইফেলের একটি বুলেট কেবল একজন মাত্র ব্যাক্তিকে হত্যা করতে পারে এবং গাড়ি বা এই জাতীয় কোন টার্গেট ধ্বংস করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু গ্রেনেড বিস্ফোরক সিস্টেমের অস্ত্র হওয়ার কারনে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরনে একাধিক ব্যাক্তিকে হত্যা করা যায় এবং গাড়ি বা এই জাতীয় যেকোনো টার্গেটে বিস্ফোরন ঘটিয়ে ধ্বংস করা যায়।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যরা ইউক্রেনের বিভিন্ন বাড়িঘরের দরজায় হ্যান্ড গ্রেনেড পেতে রেখে গেছে। কেউ যদি খেয়াল না করে দরজা খোলে তাহলেই বিস্ফোরন ঘটবে। আবার বিভিন্ন বন-জঙ্গলেও গাছের সাথে এই ধরনের গ্রেনেড আটকে দিছে এবং গ্রেনেড সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে আরেক গাছের সাথে এমনভাবে আটকে দিছে যেখানে কেউ খেয়াল না করে হাটলেই দড়ির সাথে পা বা দেহের কোন অংশ পেঁচিয়ে গিয়েই বিস্ফোরন ঘটবে এবং এতে ব্যাপক পরিমাণে হতাহত হবে। অর্থাৎ রাশিয়ার সৈন্যরা এগুলোকে ছোটখাটো আইইডিতে রূপান্তরিত করে ফেলছে। এই ধরনের ফাঁদগুলোকে ভিকটিম অপারেটেড ইম্প্রোভাইসড

এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা বুবি ট্রাপও বলা হয়। সোস্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে ফিলিস্তিনের যোদ্ধারা তাদের পতাকার সাথে গ্রেনেড রেখে দিয়ে ইসরাইলের সীমানার কটাতারের অপর পাশে পতাকাটি আটকে দিয়েছিলো। যখনি ইসরাইলি সেনাবাহিনী একজন পতাকাটা খুলে নিয়ে যায় তখনই পতাকার সাথে সংযুক্ত লাঠির ভেতরে রেখে দেওয়া রিমোট কন্ট্রোল গ্রেনেডটির বিস্ফোরন ঘটানো হয়। এটা বিস্ফোরিত হয়ে পতাকাটি নিয়ে যাওয়া ইসরাইলি সৈন্যটি মারা যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধরনের বুবি ট্রাপ শত্রুকে সবসময় মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে। এজন্য এটাকে সাইকোলোজিক্যাল ওয়েপনসও বলা হয়।

হ্যান্ড গ্রেনেডের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদের মাঝে একটা হচ্ছে, মলোটভ ককটেল। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহৃত একটি ওয়েপনস। যা ইরাকে মার্কিনিদেরকে অনেক ঝামেলায় ফেলেছিলো!দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন মলোটভ ককটেল অনেক বেশি ব্যাবহার করেছিলো, অন্যদের তুলনায়। এটা দিয়ে সাধারনত মার্কিন সৈন্য বা বিভিন্ন ধরনের আর্মাড বা নন-আর্মাড কার টার্গেট করতো মার্কিন আগ্রাসন বিরোধী ইরাকিরা। ৪-৬জন লোক এটা হাতে নিয়ে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকতো। যখন মার্কিন বহরের গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যেতো, ঠিক তখনই কোন একটি গাড়িকে সবাই মিলে টার্গেট করে নিক্ষেপ করতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহরের শেষ গাড়িকেই টার্গেট করা হতো। যাতে করে অন্য কোন গাড়ি থেকে হামলাকারীদেরকে টার্গেট করে কোন গুলি চালাতে না পারে। অনেক সময় বহরের প্রথম বা মাঝের গাড়িগুলোকেও টার্গেট করা হতো। তবে সেক্ষেত্রে যদি মার্কিন বহরের শুরুর অথবা মাঝের কোন একটি গাড়ি থেকে তার পিছনের গাড়িটির দুরত্ব এত বেশি হতো যে, হামলা কারীরা বহরের হামলাকৃত গাড়ির ঠিক পিছনে আসা গাড়ি থেকে কোন ধরনের পাল্টা হামলা বা আটক হওয়ার মতো কোন ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়বেনা, নিরাপদেই সরে পড়তে পারবে!তবেই বহরের শুরুর বা মাঝের কোন গাড়িকে টার্গেট করা হতো।

৩০-৪০ মিঃমিঃ এর বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক চেইন গ্রেনেড সিস্টেম আছে। যেগুলো মেশিন গানের মতোই অনবরত ফায়ার করতে পারে এবং শত্রু সৈন্যদের যেকোনো বড় দলকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এগুলোর ব্যাপক ফায়ারে বিভিন্ন ধরনের আর্মাড ভেহিকল ও হেভি টার্গেটের বস্তুও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের অটোমেটিক চেইন গ্রেনেড সিস্টেম দিয়ে ট্যাংকের চাকা ও দুর্বল জায়গা বরাবর কয়েকটা গ্রেনেড ফায়ার করলেই ট্যাংক ড্যামেজ বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বারোতম অধ্যায়

(আধুনিক সময়ের যুদ্ধে বহুল ব্যাবহৃত অস্ত্র রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড, রিকয়েললেস রাইফেল এর কার্যকারিতা ও ব্যাবহার সম্পর্কে)

এন্টি ট্যাংক বা এন্টি আর্মার ওয়েপনস এর অনেক ধরনের প্রকারভেদ আছে। তার মাঝে একটি আন-গাইডেড এন্টি ট্যাংক বা এন্টি আর্মার ম্যানপোর্টেবল ওয়েপনস হচ্ছে, ৪০ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ১২৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের RPG(রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড)। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা বর্তমান রাশিয়ার তৈরী AK-47 ও RPG-7 নামের এই দুইটি অস্ত্র তৈরি হওয়ার পর থেকে বিশ্বের এমন কোন লং টাইম যুদ্ধ নেই যেখানে এই AK-47 রাইফেল আর RPG-7ব্যাবহার করা হয়নি। বিভিন্ন ধরণের RPG এর মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যাবহৃত হয়েছে RPG-7 । এর কারন হচ্ছে, এটার হালকা ওজন, ভালো ধ্বংস ক্ষমতা, ফায়ার করার সুবিধা, খরচ কম, সহজেই তৈরি করা যায়, তৈরী করার জন্য জটিল কোন টেকনোলজির ঝামেলা পড়তে হয় না, অস্ত্রের বাজারে সহজলভ্য হওয়া ইত্যাদি।

প্রতিটি বস্তুরই কিছু দুর্বল দিক থাকে। তেমনি অত্যাধুনিক সমস্ত ট্যাংকগুলোতেও কিছু না কিছু দুর্বল দিক থাকে। ট্যাংকের সেই কমন দুর্বল জায়গাগুলো হচ্ছে, দরজা, মেইন গানের সাথে ট্যাংকের সংযোগ স্থল, ট্যাংকের অভ্যন্তরে গোলাবারুদ রাখার জায়গা, ভিতরের ফুয়েল ট্যাংক ও লং ডিস্টেন্সে অপারেশন পরিচালনা করার জন্য ট্যাংকের উপরে নেওয়া এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাংক, চাকার চেইন ইত্যাদি। ট্যাংকের চেইন সাধারণত স্টিল দিয়ে অথবা রাবার ও প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই চেইন বরাবর যেকোনো ধরনের বিস্ফোরক সিস্টেমের ওয়েপনস বা হেভি মেশিনগান ফায়ার করলেই এই চেইন ছিড়ে যাবে। চেইন ছিড়ে গেলেই ট্যাংক ড্যামেজ, এরপর ট্যাংক আর খুব বেশি দুরে যেতে পারবেনা। কোনমতে টেনেটুনে হয়তো কিছুদুর নিয়ে যাওয়া যাবে যদি চেইনের উপরে থাকা লোহার চাকা ঠিক থাকে। যদি চাকাও ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ঐ ট্যাংক আর নড়ানো যাবে না। ট্যাংকের চাকার চেইন ছিড়ে

গেলে একটি ট্যাংক কফিন বক্সে পরিণত হয়।

একই কথা অন্যান্য চেইন সিস্টেমের চাকার ভেহিকল ও টায়ারের চাকার ভেহিকলের ক্ষেত্রে। টায়ারের চাকার যেকোনো আর্মাড নন আর্মাড ভেহিকলের চাকা পাংচার হয়ে গেলে ট্যাংকের চেইন ছিড়ে যাওয়ার পরের অবস্থার মতো অবস্থা তৈরী হবে এবং চাকা ধ্বংস হয়ে গেলে ট্যাংকের মতোই কফিন বক্সে পরিনত হবে। একটি ট্যাংক ধ্বংস করতে না পারলে ড্যামেজ করাই যথেষ্ট। ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার পরে ঐ ট্যাংকে আর কোন ক্রুরা অবস্থান করে না। এই সব ট্যাংকে অবস্থান করা মানেই সর্বদা শত্রুর হাতে নিহত হওয়া বা বন্দী হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে অবস্থান করা। একটি ট্যাংক ধ্বংস করার চেয়ে ড্যামেজ করা অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক। শত্রু সৈন্যরা এই সব ট্যাংক ফেলে রেখে চলে যাওয়ার পর নিজেরা নিয়ে গিয়ে রিপেয়ার করে ব্যাবহার করা যায়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইউক্রেনের সৈন্যরা এই কাজটি রাশিয়ার ট্যাংক বা আর্মাড ভেহিকলের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ভাবে করছে। ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিরোধ যোদ্ধারা ইসরাইলের মারকাভার মতো অনেকগুলো অত্যাধুনিক ট্যাংক একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে RPG-7 দিয়ে। মারকাভাকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ট্যাংক বলা হয়। লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধারাও ব্যাপক পরিমাণে ইসরাইলের মারকাভা ট্যাংক ধ্বংস এবং ড্যামেজ করে দিয়েছিলো ২০০৬ সালে লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসনের সময়।

৪০ মিঃমিঃ এর RPG-7 দিয়ে বিশ্বের যেকোনো ট্যাংক ড্যামেজ করে দেওয়া যায় এবং জায়গা মতো হিট করতে পারলে সম্পূর্ণ ধ্বংসও করে দেওয়া যায় এবং ১২৫ মিঃমিঃ এর RPG-28 দিয়ে বিশ্বের যেকোনো ট্যাংক একেবারেই ধ্বংস করে দেওয়া যায়। RPG-7 বা RPG-28 এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হয় ১কিলোমিটার পর্যন্ত।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর ৫৫টি রাষ্ট্রের সরাসরি আফগান আক্রমণের পর আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যোদ্ধারা মুলত দুইটি অস্ত্র দিয়েই লড়াই করেছে। সেই দুইটি অস্ত্র হচ্ছে, AK-47 রাইফেল এবং RPG-7 । এই এক আরপিজি দিয়েই বিশ্বের শীর্ষ সামরিক শক্তির অর্ধশত জাতিগোষ্ঠীকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। RPG-7 দিয়ে Ch-47 চিনুকের মতো ট্যান্ডেম রোটরের অত্যাধুনিক হেলিকপ্টারও আফগানিস্তানে আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধারা ধ্বংস করেছে। তাও আবার আকাশে উড়ন্ত অবস্থায়ই। অবশ্য এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের একমাত্র রেকর্ড আরপিজি দিয়ে চিনুক হেলিকপ্টার খেয়ে দেওয়ার। আধুনিক যুদ্ধেও এন্টি

ট্যাংক ওয়েপনস হিসেবে আরপিজির একটি ভালো অস্ত্র।

আফগানিস্তানে আগ্রাসী ৫৫টি রাষ্ট্রের ২০২০ সালে সম্মিলিত ডিফেন্স বাজেট ছিলো প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার। বিপরীতে আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ডিফেন্স বাজেট বলতে কিছুই ছিলো না। এমনকি তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ RPG-7ই ছিলো না। যা ছিলো তার পরিমাণও খুবই অল্প। তার মধ্যে এগুলোতে আধুনিক কোন টার্গেটিং স্কোপ ও নাইট ভিশন সিস্টেম বা নাইট স্কোপও ছিলো না।

বর্তমান সময়েও কোন বাহিনীকে যদি আধুনিক রাইফেল আর শুধু ব্যাপক পরিমাণে আরপিজি ও আরপিজির জন্য তৈরী করা টার্গেটিং স্কোপ ও নাইটস্কোপ সহকারে দেওয়া হয়, তাহলেও সেই বাহিনী যেকোনো শক্তিশালী গ্রাউন্ড ফোর্সের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বেশ ভালো লেভেলের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। একুশ শতকের সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়ামান থেকে নিয়ে সমস্ত দেশের যুদ্ধেই আরপিজির মতো অস্ত্রগুলো যুদ্ধে মুল ভুমিকা রেখেছে।

আফগানিস্তানে এই সমস্ত আরপিজিগুলো ভালো ফলাফলের কারন পাহাড় নয়। পাহাড়ের কারনে শুধু প্রতিরোধ যোদ্ধারাই সুবিধা পেয়েছে ব্যাপারটি কোন ভাবেই এমন নয়। বরং প্রতিপক্ষের সৈন্যরাও সমানতালে সুবিধা পেয়েছে। আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ছিলো আফগান পুতুল বাহিনী ও বিভিন্ন গোলাম মিলিশিয়া বাহিনীর সৈনা সদস্য সংখ্যা। তারা যেমন আফগানিস্তানের স্থানীয় ছিলো ঠিক তেমনি বহুগুনে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রেও সজ্জিত ছিলো প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তুলনায়। প্রতিরোধ যোদ্ধারা বিজয়ী হয়ে যখন পানশিরের মতো চতুর্দিকে হিন্দুকুশ পাহাড় দিয়া ঘেরা অঞ্চলও কোন এয়ারসাপোর্ট ছাড়াই বিজয় করে ফেলেছে বিভিন্ন ধরনের আরপিজির মতো সামান্য অস্ত্র দিয়েই!সেখানের বিশাল পাহাড়ের সুবিধা নিয়েও আহমদ মাসুদের বাহিনী তেমন কিছুই করতে পারেনি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনও ঠেকানো হয়েছিল এই আরপিজির মতো অস্ত্রগুলো দিয়েই। আফগানের সেই প্রতিরোধের ধাক্কায় এমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনভাবে পরাজিত হয়েছে যে, আফগান যুদ্ধের ফলস্বরূপ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নই ভেঙে গেছে।

একইভাবে যেই ভুমিতে পাহাড় থাকবেনা সেই ভুমিতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ও শত্রুরা উভয় পক্ষই পাহাড়ি ভুমির কোন ধরনের সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ ব্যাপারটা সমানই হয়ে যাবে। আবার পৃথিবীর একেক দেশে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যুদ্ধের কৌশল

হয় একেক রকম। ভিয়েতনামে বন জঙ্গলে আর মাটির নিচের বাংকার ও টানেলকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিলো। ফিলিস্তিনের গাজায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা মাটির নিচের টানেল ভিত্তিক সিস্টেমে ইসরাইলি আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে।

সোমালিয়ার মতো সমতল ও মরুভূমির ভূখণ্ডেও প্রতিরোধ যোদ্ধারা ব্যাপক পরিমাণে আরপিজির মতো অস্ত্রগুলো ব্যাবহার করে প্রতিরোধ করছে, তাও আবার সম্মিলিত শত্রু যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা এবং আফ্রিকান সহযোগীদের বিরুদ্ধে। সেখানেও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো ব্যাপক পরিমাণে এয়ারস্ট্রাইক বা ড্রোন স্ট্রাইক চালাচ্ছে। সোমালিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য কিন্তু এয়ারস্ট্রাইক থেকে বাঁচার মতো কোন পাহাড় নেই!বরং আছে যুদ্ধ ছাড়াই স্বাভাবিক সময়েই প্রচন্ড তাপ ও শীতে কিংবা খাদ্য ঔ পিপাসায় যেকোনো ব্যাক্তির মরে যাওয়ার মতো রুক্ষ মরুভূমি!

আবার ইউক্রেনের রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়া ফাঁদে পড়ে গেছে শীতকালে ইউক্রেনের নরম কাদামাটিতে। একই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি রাশিয়ায় ফেঁসে গিয়েছিলো রাশিয়ার তীব্র শীত, ইউক্রেনের মতো নরম কাদামাটি ও রাশিয়ার পোড়ামাটি নীতির কারনে। ইউক্রেনের মতো সমতল ভূমির দেশেও ২০২২ সালে রাশিয়ার আগ্রাসনের সময়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ইউক্রেনকে আরপিজি সহ বিভিন্ন ধরনের স্মল আর্মসই সবচেয়ে বেশি সাপ্লাই দিয়েছে। পোড়ামাটি নীতি হচ্ছে, নিজের দখল হাতছাড়া হয়ে শত্রুর দখলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা শত্রুর দখলে চলে যাচ্ছে এমন কোন ভূখণ্ডে এমন কোন কিছুই অবশিষ্ট না রাখা, যা থেকে শত্রু কোন ধরনের উপকৃত হতে পারে দখলের পরে। এই নীতির কারনে আগ্রাসী দেশের সৈন্যরা ব্যাপক পরিমাণে খাদ্য সহ অন্যান্য অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সংকটে ভোগে। তখন তাদের জন্য পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

রিকয়েললেস রাইফেল এবং রিকয়েললেস গান হচ্ছে, এন্টি ট্যাংক বা এন্টি আর্মার অস্ত্রগুলোর মাঝে অন্যতম একটি অস্ত্র। একটি রিকয়েললেস রাইফেল বা রিকয়েললেস গান সাধারণত ৬০ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ১২০ মিঃমিঃ ব্যাসের হয়ে থাকে। তবে ৬০ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ৯০ মিঃমিঃ পর্যন্ত রিকয়েললেস রাইফেল এবং রিকয়েললেস গান ম্যান পোর্টেবল হয়ে থাকে। ৯১ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ১২৫ মিঃমিঃপর্যন্তগুলো ওজন ও আকৃতিতে বড় হওয়ার কারনে ম্যান পোর্টেবল নয়। রিকয়েললেস রাইফেলের মাঝে

সবচেয়ে আধুনিক ও ম্যান পোর্টেবল রিকয়েললেস রাইফেল হচ্ছে, সুইডেনের Carl Gustav রিকয়েললেস রাইফেল। কার্ল গুস্তাভের জন্য গাইডেড ও আন গাইডেড উভয় ধরনের গোলাবারুদ আছে। জার্মানির Penzerfast-3ও একটি আধুনিক ম্যান পোর্টেবল রিকয়েললেস রাইফেল। প্যানজারফাস্ট-৩ এর ডিজাইন অনেকটা RPG-7 এর মতোই এবং কার্যকারিতা RPG-28 এর মতোই। ম্যান পোর্টেবল রিকয়েললেস রাইফেলের মাঝে সবচেয়ে প্রচলিত হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরী SPG-9 রিকয়েললেস রাইফেল। এখন পর্যন্ত এটা বিশ্বের বহু দেশের যুদ্ধে ব্যাবহার করা হয়েছে।

তেরোতম অধ্যায়

(আন-গাইডেড মিসাইলের প্রকারভেদ, কার্যকারিতা ও ব্যাবহার সম্পর্কে)

আন গাইডেড এন্টি ট্যাংক বা এন্টি আর্মার মিসাইল এবং বিভিন্ন ধরনের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ১২২ মিঃমিঃ এর MLRS এর চেয়ে ছোট এবং ব্যাসের দিক থেকে ১২২ মিঃমিঃ এর চেয়ে বেশি নয় এমন MLRS এর সিঙ্গেল লাঞ্চারগুলোকে ম্যান পোর্টেবল স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যেগুলো একজন সৈন্য কাধে বহন করে নিয়ে যেতে পারে বা লুকিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়। এগুলোর সুবিধা হচ্ছে এটিজিএমের মতোই ফায়ার করা যায় এবং টার্গেট ধ্বংস করা যায়। তবে এটিজিএমের চেয়ে একুরেসি ও রেঞ্জ অনেক কম হয়। তবে ইলেকট্রনিক জ্যামার সমৃদ্ধ যেকোনো টার্গেট ধ্বংস করতে এগুলো কার্যকরি অস্ত্র। কেননা ইলেকট্রনিক জ্যামার সমৃদ্ধ যেকোনো টার্গেটে গাইডেড মিসাইল আঘাত করতে পারে না।

এই ধরনের মিসাইলগুলো ৬০ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ১২০ মিঃমিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলোর সর্বোচ্চ ওজন লাঞ্চারবিহীন শুধু মিসাইল ২০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে!এগুলোর মাঝে চীনের Type 63 আর্টিলারির সিঙ্গেল লাঞ্চারও অন্তর্ভুক্ত। তবে তুরস্ক ড্রোন থেকে লাঞ্চ করার জন্য একটি ৪০ মিঃমিঃ এরও আন গাইডেড রকেট তৈরী করেছে। যেটার ওজন মাত্র আধা কেজি। তুরস্কের তৈরী এই রকেটটি সার্ফেস টু সার্ফেস ওয়্যারেও ব্যাবহার করা যায়।

ম্যান পোর্টেবল অস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি মুল নীতি হচ্ছে, এগুলোর ব্যাস সাধারণত ১২৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এন্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইলের হিসাব ভিন্ন। এটিজিএমের ক্ষেত্রে ব্যাস ১৮০ মিঃমিঃ পর্যন্তও হয়ে থাকে। এবং এই সমস্ত ম্যান পোর্টেবল ওয়েপনসের একটি পার্টসের ওজন সর্বোচ্চ ৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। একজন মানুষ সাধারণত ৫০ কেজির বেশি ওজন বহন করে নিয়ে যেতে পারে না। এই কারনেই স্মল আর্মসগুলোকে একজন সৈন্য এককভাবে অথবা কয়েক জন সৈন্য

মিলে পার্টস পার্টস ভাগ করে বহন করে কোথাও নিয়ে যেতে পারে।

লব বোম বা IRAM(ইম্প্রোভাইস রকেট এসিস্টেড মিউনিশন) বা আন গাইডেড রকেট। এগুলো সাধারণত গ্যাসের সিলিন্ডারের সাথে ১০৭ মিঃমিঃ এর রকেট সংযুক্ত করে তৈরী করা হয়। সিলিন্ডারের ভেতরে বিস্ফোরক ভর্তি করে দেওয়া হয় এরপর সংযুক্ত রকেটের মাধ্যমে টার্গেটে নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর দুইটা সিস্টেম থাকে, একটা হচ্ছে টার্গেটে আঘাত হানার সাথে সাথে বিস্ফোরন ঘটে। আরেকটা হচ্ছে টার্গেট আঘাত হানার পর সাথে সাথে বিস্ফোরন ঘটে না। সুযোগ সুবিধা বুঝে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে বিস্ফোরন ঘটানো হয়। এগুলো ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইয়ামান, লিবিয়ার যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহার করা হয়েছে। এগুলো সাধারণত কোন সামরিক বেস বা বড় কোন স্থিতিশীল টার্গেট ধ্বংস করতে ব্যাবহার করা। এগুলোর রেঞ্জ সাধারণত ১৫০ মিটারের বেশি হয় না।

গাজার প্রতিরোধ যোদ্ধারা যেই ধরনের রকেটগুলো নিক্ষেপ করে সেগুলোও এই ধরনের আন গাইডেড রকেট। এই রকেটগুলো ক্ষেত্র বিশেষ স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর ওজনের দিকটা বিবেচনায় নিয়ে। আবার কখনো স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। একই ভাবে ১২২ মিঃমিঃ এর BM-21 MLRS এর সিঙ্গেল লাঞ্চারের মতো অন্যান্য ১২২মিঃমিঃ এর MLRS এর সিঙ্গেল লাঞ্চারও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে নন-প্রফেশনাল বাহিনী এগুলো প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহার করার কারনে স্মল আর্মসের মতোই হয়ে গেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে BM-21 MLRS এর সিঙ্গেল লাঞ্চার প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহার করেছে ভিয়েতনামের যোদ্ধারা। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধে গাঁজার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রকেটের মতো আন-গাইডেড রকেট প্রচুর পরিমাণে ব্যাবহার করা হচ্ছে!তবে এই ধরনের রকেট আন-গাইডেড হওয়ার কারনে খুব বেশি একটা নির্দিষ্ট কোন সামরিক টার্গেট এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করতে পারে না। বে-সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও তেমন একটা ধ্বংস করতে পারে না।

অন্যান্য আন-গাইডেড ওয়েপনস ফায়ারকারীর দৃষ্টিসীমার মাঝের টার্গেটেই ফায়ার করা হয় বিধায় টার্গেটে আঘাত হানতে পারে। কিন্তু এই ধরনের রকেটগুলো দৃষ্টি সীমার বাহিরের টার্গেটে নিক্ষেপ করা হয় বিধায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টার্গেটে আঘাত হানতে পারে না। বরং অনেক সময়ই দেখা যায় যে, একটি টার্গেট ধ্বংস করতে অনেক বেশি পরিমাণে নিক্ষেপ করতে হয়। একটি টার্গেট ধ্বংস করার জন্য এত

বেশি পরিমাণে এই ধরনের আন-গাইডেড ব্যাবহার করার দ্বারা দেখা যায় যে খরচ বেড়ে একটি গাইডেড মিসাইলের চেয়েও অনেক বেশি হয়ে যায়। এবং এগুলো প্রচুর পরিমাণে ফায়ার করার দ্বারা সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটিও বাড়ে। তবে টার্গেটই যদি সিভিলিয়ান হয় বা এগুলো নিক্ষেপ করে শত্রুকে ব্যাস্ত রাখাই মুল উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই। এরপর যেগুলো টার্গেটে আঘাত করতে পারে বা শত্রুর স্থাপনা সহ বিভিন্ন ধরনের জানমালের ক্ষয় ক্ষতি করতে পারে এটা উদ্দেশ্যর বাহিরে অতিরিক্ত হিসেবে পাওয়া যায়। যেমনটা উদ্দেশ্য করে ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিরোধ যোদ্ধারা ইসরাইলের দিকে এই ধরনের আন-গাইডেড রকেট ব্যাপক পরিমাণে নিক্ষেপ করে থাকে।

চৌদ্দতম অধ্যায়

(যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহুল ব্যাবহৃত বিস্ফোরক সিস্টেম ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লুসিভ ডিভাইস সম্পর্কে)

IED সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পাত্রে বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যাবহার করে তৈরী করা হয়। এগুলোর বিস্ফোরন ঘটানো হয় স্প্রিং সিস্টেম, কারেন্টের তার বা রিমোট কন্ট্রোল সেন্সরের মাধ্যমে। যা ঐ আইইডির পাত্রে সেট করা দেওয়া হয়। আইইডি সাধারণত রাস্তা বা বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে স্থাপন করা হয়। রাস্তায় ট্যাংক বা আর্মাড ভেহিকল ধ্বংসের জন্য রাস্তার মাটির নিচে রাখা হয়। যখন ঐ আইইডির উপর দিয়ে টার্গেটকৃত ট্যাংক বা কোন ধরনের আর্মাড নন-আর্মাড ভেহিকল অতিক্রম করতে নেয় তখনই বিস্ফোরন ঘটানো হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে আইইডি মাটির নিচে পুতে রাখা হয় অথবা আশেপাশে সিস্টেম করে লুকিয়ে রাখা হয়। যখনই ঐ আইইডির উপর দিয়ে অথবা আশেপাশে দিয়ে কোন টার্গেটকৃত গাড়ি বা সৈন্যদল যায় তখনই বিস্ফোরন ঘটানো হয়। কখনো কখনো শত্রুর মাঝে থাকা নিজেদের লোক দ্বারা স্যাবোটাজ করে শত্রুর অস্ত্র, খাদ্য ঔষধের গুদাম বা তেলের ডিপো ধ্বংস করতেও এই ধরনের আইইডি ব্যাবহার করা হয়।

আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় শত্রুর বিমানঘাঁটিতে থাকা যুদ্ধ বিমান ধ্বংসের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল খনন করে একেবারে শত্রুর বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গারে থাকা বিমানের নিচ বরাবর আইইডি দিয়ে বিস্ফোরন ঘটিয়ে শত্রুর বিমান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে অনেক সামরিক ক্যাম্পেও হামলা করা হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের টানেলের মাধ্যমে শুধু বিস্ফোরন ঘটানো পর্যন্তই ঘটনা সীমাবদ্ধ না। গাঁজার প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই ধরনের টানেল খনন করে ইসরাইলের বহু সৈন্যদেরকেও অপহরণ করেছে।

২০২২ সালের ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে ইউক্রেনের সৈন্যরা রাশিয়ান সৈন্যদেরকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে প্রবেশ ঠেকাতে বিভিন্ন ধরনের মর্টার ও হুইটজার বা

MLRS সিস্টেমের আর্টিলারির শেলকে আইইডিতে রূপান্তরিত করে প্রবেশের রাস্তায় পেতে রেখেছিলো। যাতে রাশিয়ান সৈন্যরা প্রবেশ করার সময় ব্যাপক ধ্বংস হয় এবং রাশিয়ান সৈন্যরা যেন কিয়েভে প্রবেশ করতে না পারে।

আইইডি তৈরীতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিস্ফোরক। অবশ্য বিস্ফোরক শুধু আইইডি তৈরীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ না। সমস্ত অস্ত্র তৈরির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিস্ফোরক সম্পর্কে ভালো ধারণা ও বিস্ফোরকের সাপ্লাই লাইন ঠিক না থাকলে কোন যুদ্ধই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। প্রাচীনকাল থেকে ব্যাবহৃত অস্ত্র ছুরি, তীর, ধনুক, বর্শা-বল্লম ও আধুনিক যুগের লেজার ওয়েপনস বাদে সমস্ত অস্ত্রের জন্যই বিস্ফোরক গুরুত্বপূর্ণ। বিস্ফোরক ছাড়া এই সমস্ত অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব না। এমনকি ছোট একটি পিস্তল বা হ্যান্ড গানের জন্য একটি বুলেট তৈরী করতে হলেও প্রাচীনতম বিস্ফোরক গান পাউডার অথবা আধুনিক যুগের বিস্ফোরক স্মোকলেস পাউডারের প্রয়োজন পড়ে। এমনকি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র নিউক্লিয়ার বোমা বা মিসাইল তৈরীতেও ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের মতো বিস্ফোরকের প্রয়োজন পড়ে।

এই সব বিস্ফোরকের মাঝে সবচেয়ে স্বস্তা, শক্তিশালী এবং বিশ্বের যেকোনো দেশে সহজেই খোলা বাজারে পাওয়া যায় এমন বিস্ফোরক হচ্ছে এমোনিয়াম নাইট্রেট। যেটাকে আমরা কৃষি কাজে ইউরিয়া সার হিসেবে ব্যাবহার করে থাকি। এরপরের সহজলভ্য দুইটি বিস্ফোরক হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। পটাশিয়াম ক্লোরাইড আমাদের দেশের দিয়াশালাইয়ের কাঠি তৈরীর অন্যতম উপাদান। আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে, চুন।

বিভিন্ন ধরনের আইইডির মাঝে ৫০ কেজি ওজনের এমোনিয়াম নাইট্রেট দিয়ে তৈরী আইইডি হচ্ছে, এন্টি ট্যাংক আইইডি। এই ধরনের আইইডির বিস্ফোরনের উপরে বিশ্বের কোন শক্তিশালী ট্যাংকই ঠিক থাকতে পারবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধরনের আইইডি তৈরী করার জন্য ৫০ কেজি ওজনের একটি ইউরিয়া সারের বস্তা থেকে সারগুলোকে বের করে পাত্রে পানি দিয়ে সারগুলোকে ঐ পানিতে ঢেলে দিয়ে কিছুটা আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। যাতে করে ঐ সারগুলো গলে গিয়ে কোন পাত্রে ঢালার পর পানি শুকিয়ে গিয়ে একটি একক খন্ডে পরিনত হয়। এরপর ঐ পাত্রে বিস্ফোরনের জন্য ডিভাইস ফিট করে দেওয়া হয়। ৫০ কেজির চেয়ে কম ওজনের বিভিন্ন ধরনের আইইডিও আছে। যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ভেহিকল বা অন্যান্য টার্গেট ধ্বংস করতে ব্যাবহার করা। টার্গেটকৃত বস্তুর অবস্থা বুঝে ৫০ কেজির চেয়ে বেশি

ওজনেরও আইইডি তৈরী করা হয়। সাধারণত এন্টি পার্সোনাল আইইডির ওজন ১০ বা এর চেয়ে কম হয়ে থাকে। তবে সৈন্যদের সংখ্যার অবস্থা বুঝে ১০ কেজির চেয়ে বেশি ওজনেরও এন্টি পার্সোনাল আইইডি তৈরী করা হয়।

পনেরোতম অধ্যায়

(বিভিন্ন ধরনের মাইনের ব্যাবহার ও মাইন ধ্বংসের পদ্ধতি সম্পর্কে)

এন্টি ট্যাংক ল্যান্ড মাইন, ও এন্টি পার্সোনাল ল্যান্ড মাইন পুরোনো এবং শত্রুকে ধ্বংস করার সহজ অস্ত্রগুলোর একটি। বিশ্বের প্রায় সব প্রফেশনাল নন-প্রফেশনাল সামরিক বাহিনীতেই ল্যান্ড মাইন ব্যাবহার করা হয়। নির্দিষ্ট একটি এরিয়ায় অথবা নির্দিষ্ট সীমান্ত পেরিয়ে শত্রুর সেনাবাহিনীর প্রবেশ ঠেকাতে ল্যান্ড মাইন ব্যাবহার করা হয়। ল্যান্ড মাইন এমনভাবে মাটিতে পুঁতে রাখা হয় যাতে করে শত্রু প্রবেশ করতে গেলেই হতাহত হয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট মানচিত্র একে সেই মানচিত্র অনুযায়ী সারিবদ্ধ ভাবে কয়েক ধাপের লেয়ার সিস্টেমে ল্যান্ড মাইন পুঁতে রাখা হয়। এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে ঐ স্থানের চারপাশে ও গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো প্রবেশ পথ এই ধরনের ল্যান্ড মাইন পুঁতে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষে হলে অথবা নিজেদের প্রয়োজন হদে ম্যাপ দেখে ল্যান্ড মাইনগুলো সরানো হয়।

একইভাবে শত্রুর নৌবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য পানির নিচে নেভাল মাইন পানির নিচে অথবা ভাসমান অবস্থায় সেট করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে নেভাল মাইন নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখার জন্য মাইনের সাথে লম্বা শেকল দিয়ে লোহা বা এই জাতীয় ভারি কিছু বস্তু শেকলের শেষের দিকে আটকানো থাকে। নেভাল মাইন পাতার পরে শেকলের সাথে আটকানো বস্তুটা পানির নিচে মাটিতে গিয়ে ঠেকে যায়। এক্ষেত্রে শেকলের দৈর্ঘ্য পানির গভীরতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আপনারা নিশ্চয়ই নদীতে ভাসমান বয়া দেখে থাকবেন। সেগুলো কিন্তু ঢেউয়ের কারনে স্থান পরিবর্তন করে না। নেভাল মাইনও এই বয়ার মতো করে সেট করা হয়।

মাইন ক্লিয়ারিং লাইন চার্জ সিস্টেম,

ল্যান্ড মাইন অপসারণের জন্য মাইন ডিটেক্টর সেন্সর দিয়ে মাইন খুঁজে এরপর অপসারণ করাটা অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ। অপসারণ করতে গিয়ে সামান্য ভুল হলেই বিস্ফোরণ ঘটে হতাহতের ঘটনা ঘটে। আবার শত্রুর প্রবেশ ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ স্থানে বা নির্দিষ্ট সীমানা জুড়ে সিরিয়াল দিয়ে লাইন তৈরী করে কয়েক কয়েক ধাপে ল্যান্ড মাইন স্থাপন করা হয়। এই সব মাইনের বড় একটা অংশ রিমোট কন্টোল অথবা তার দ্বারা অপারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। ম্যানুয়ালি যদি এই সব মাইন অপসারণ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে রিমোট কন্ট্রোল বা তার দ্বারা সংযুক্ত মাইনের বিস্ফোরনে উদ্ধারকারী নিহত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ওৎপেতে থাকা শত্রুর গুলিতেও অপসারণকারীরা নিহত হয়।

এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আধুনিক সিস্টেম হচ্ছে মাইন ক্লিয়ারিং লাইন চার্জ সিস্টেম। মিসাইলের মতো এগুলো লাঞ্চ করার পর নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত হেনে মাটিতে ঢুকে যায় কিছুটা এবং ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে এটার নির্দিষ্ট রেঞ্জের মাঝে থাকা মাইনগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষন পরই বিস্ফোরন ঘটে। এতে করে যেকোনো সামরিক ভেহিকল বা সৈন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই ঐ জায়গা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তবে এগুলো সম্পূর্ণ রুপে এর নির্দিষ্ট রেঞ্জর মাঝে থাকা ল্যান্ড মাইন বা আইইডি ধ্বংস করার নিশ্চয়তা দেয় না। তাছাড়া এই সব ল্যান্ড মাইন পেতে রাখা জায়গাগুলোতে শত্রুকে প্রতিপক্ষ এম্বুশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। ২০২০ সালে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে নগরানো কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধের সময় আজারবাইজান তুরস্কের তৈরী মাইন ক্লিয়ারিং লাইন চার্জ সিস্টেম ব্যাপক পরিমাণে ব্যাবহার করেছে এবং এগুলো বেশ সফলও হয়েছে।

ষোলতম অধ্যায়

(মর্টার শেল এর কার্যকারিতা ও ব্যাবহার সম্পর্কে)

মর্টার শেল হচ্ছে স্মল আর্মসগুলোর মাঝে দুর থেকে শত্রুর উপর এয়ার স্ট্রাইকের মতো হামলা করার জন্য সবচেয়ে ভালো অস্ত্র। ব্যাপক মর্টার শেলের হামলা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কোন C-RAM(কাউন্টার রকেট আর্টিলারি মর্টার) সিস্টেম দিয়েও শতভাগ ঠেকানো সম্ভব না। সেই C-RAM সিস্টেম হোক মিসাইল বেসড, গান বেসড অথবা লেজার বেসড। মর্টার শেলের তিনটা ধরন আছে, লাইট ওয়েট, মিডিয়াম ওয়েট ও হেভি ওয়েট মর্টার শেল। এর মাঝে ৬০ মিঃমিঃ এর মর্টার শেল হচ্ছে লাইট ওয়েট। এটা একজন সৈন্য একাই কাঁধে করে বহন করতে পারে এবং একাই ফায়ার ফায়ার করতে পারে। অতিরিক্ত কোন ক্রুর প্রয়োজন হয় না। ৮২ মিঃমিঃ এর মিডিয়াম ওয়েটের মর্টার শেল একজন সৈন্য একা বহন করতে পারে না। পার্টস পার্টস করে তিন থেকে চার জন সৈন্য মিলে বহন করতে পারে। একজনে ব্যারেল, আরেকজনে বেসপ্লেট, আরেকজন দ্বি-পদ বা ত্রিপদ স্ট্যান্ড ও টার্গেটিং সাইট, আরেকজন মর্টার শেল বহন করতে পারে।

১২০ মিঃমিঃ এর হেভি ওয়েট মর্টার শেলগুলো সাধারণত পার্টস পার্টস করেও সৈন্যরা বহন করে নিয়ে যেতে পারে না ওজনের কারনে। এগুলো সাধারণত দুইটি চাকা দিয়ে যুক্ত থাকে যা কোন সামরিক গাড়ির পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এগুলোর আকৃতিও বেশ বড় হয়। তবে Soltam K6 নামে ইসরাইলের তৈরী ১২০ মিঃমিঃ এর একটি মর্টারশেল এর ওজন গোলাবারুদ ছাড়া সব মিলিয়ে ১৪৫ কেজির মতো। এটা পার্টস পার্টস করে সৈন্যরা অল্প দুরত্বের কোন জায়গায় কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। টয়োটা হাইল্যাক্সের মতো গাড়ি গুলোর পিছনে পিক আপের মতো খালি জায়গাটিতে বসিয়েও এই মর্টার শেলটি ফায়ার করা যাবে এবং ফায়ার করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করা যাবে। এক্ষেত্রে ফায়ার করার জন্য মাটিতে নামানোর

বা উঠানোর কোন ঝামেলা থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্র এই Soltem K6 ১২০ মিঃমিঃ এর মর্টার থেকে ফায়ার করার জন্য জিপিএস গাইডেড সিস্টেম শেলও তৈরী করেছে। এই ধরনের গাইডেড শেল ব্যাবহার করার দ্বারা স্মল আর্মস দিয়েই শত্রুর নাগালের বাহিরে থেকে হামলা করে নিখুঁত ভাবে শত্রুর যেকোনো কিছু ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। এই ধরনের মর্টার শেলের সর্বোচ্চ রেঞ্জ হয় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত। সাধারণত সমস্ত গাইডেড ও আন গাইডেড উভয় ধরনের স্মল আর্মসের মধ্যে কোন ধরনের অস্ত্রেরই ১০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি রেঞ্জ হয় না।

সতেরোতম অধ্যায়

(ম্যানপোর্টেবল সার্ফেস টু সার্ফেস গাইডেড মিসাইল সম্পর্কে)

স্মল আর্মসের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হচ্ছে, ম্যানপোর্টেবল সার্ফেস টু সার্ফেস ও সার্ফেস টু এয়ার গাইডেড মিসাইল। সার্ফেস টু সার্ফেস ম্যানপোর্টেবল গাইডেড মিসাইলের মাঝে সবচেয়ে ছোট মিসাইল হচ্ছে ৪০মিঃমিঃ এর মিনিয়েচার মিসাইল। যা একটি এন্টি পার্সোনাল মিসাইল। এ্যাটাকে যেকোনো সাধারন নন-আর্মাড ভেহিকল ধ্বংসের জন্যও ব্যাবহার করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে আর্মাড ভেহিকল ধ্বংসের জন্য এন্টি আর্মার মিসাইল হিসেবেও ব্যাবহার করা হয়। এই মিসাইলগুলোর ওজন সাধারণত ১কেজি থেকে নিয়ে ৪কেজির ভিতরে হয়। এফেক্টিভ ফায়ারিং রেঞ্জ ১কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলোকে সার্ফেস টু সার্ফেস, সার্ফেস টু এয়ার, এয়ার টু সার্ফেস রোলে ব্যাবহার করা যায়। অর্থাৎ এগুলো সাধারণত মাল্টিরোল হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্পেশাল ফোর্স স্পেশাল অপারেশনের জন্য এই ধরনের মিসাইলগুলো ব্যাবহার করে থাকে। এগুলো লাঞ্চ করার জন্য অনেক মিসাইলের ক্ষেত্রেই এক্সট্রা কোন লাঞ্চারের প্রয়োজন পড়ে না। বরং ৪০মিঃমিঃ এর গ্রেনেড লাঞ্চারের মাধ্যমেই এগুলো লাঞ্চ করা যায়।

দ্বিতীয় ধাপের ম্যানপোর্টেবল সার্ফেস টু সার্ফেস গাইডেড মিসাইলগুলো হচ্ছে, এন্টি আর্মার ও এন্টি পার্সোনাল গাইডেড মিসাইল। যেগুলো দিয়ে এক সাথে অনেকজন সৈন্যকে হত্যা করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের আর্মাড ও নন-আর্মাড ভেহিকল ধ্বংস করা যায়। এগুলোর ব্যাস সাধারণত ১০০মিঃমিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং মিসাইলের ওজন সাধারণত ১০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

তৃতীয় ধাপের ম্যানপোর্টেবল সার্ফেস টু সার্ফেস গাইডেড মিসাইলগুলো হচ্ছে, এন্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল বা এটিজিএম। এই এটিজিএম শুধু ট্যাংকের বিরুদ্ধেই ব্যাবহার করা হয় না। বরং সব ধরনের ভেহিকল, স্থাপনা সহ যেকোনো হেভি টার্গেট

ধ্বংস করতে এটিজিএমের কোন বিকল্প নেই। এই এটিজিএম মোটা দাগে চার ধরনের হয়ে থাকে। প্রকারভেদে এগুলোর রেঞ্জ ও ওজনও চার ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাধারণত লং রেঞ্জের এটিজিএমের রেঞ্জ হয় ৮-১০ কিলোমিটার এবং শুধু মিসাইলের ওজন ২৫-৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের মিসাইলগুলো হচ্ছে তুরস্কের UMTAS-L, রাশিয়ার Kornet-EM, যুক্তরাষ্ট্রের AGM-114 হেলফায়ার, ইসরাইলের LAHAT ইত্যাদি।

মিডিয়াম রেঞ্জের এটিজিএমের রেঞ্জ হয় ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং ওজন ২৫-৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের মিসাইলগুলো হচ্ছে, তুরস্কের OMTAS, যুক্তরাষ্ট্রের BGM 71 TOW ইত্যাদি।

শর্ট রেঞ্জের এটিজিএমের রেঞ্জ ২ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ওজন ১৫-২৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের মিসাইলগুলো হচ্ছে, তুরস্কের KARAOK, যুক্তরাষ্ট্রের FGM 148 জ্যাভেলিন, চীনের HJ-12 ইত্যাদি।

লাইট ওয়েট এন্টি ট্যাংক মিসাইলের রেঞ্জ সাধারণত ৫০০ মিটার থেকে নিয়ে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলোর ওজন সাধারণত ১০-১৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের মিসাইলগুলো হচ্ছে, ব্রিটেনের NLAW, স্পেনের Alcotan-100, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের AT-3 Sagger ইত্যাদি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের নিকট সবচেয়ে পছন্দের এটিজিএম হচ্ছে, এই লাইট ওয়েট এন্টি ট্যাংক মিসাইল। এর সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে এগুলো বহন করার সুবিধা। সাধারণত যেকোনো অস্ত্রের রেঞ্জ যত বেশি হয় একুরেসি তত কম হয়। সার্ফেস টু সার্ফেসে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটিজিএমের রেঞ্জ বেশিই হোক না কেন, এটা দৃষ্টি সীমার বাহিরের কোন টার্গেট ফায়ার করা হয় না। ফায়ার করলেও টার্গেটে আঘাত হানার সম্ভবনা খুবই অল্প হয়ে থাকে।

সাধারণত মানুষের দৃষ্টিসীমা সাধারণ সমতল ভুমিতে ৫০০ মিটার থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ এক কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে সমুদ্রে, মরুভূমিতে এবং পাহাড়ের উপর থেকে দৃষ্টি সীমা এর চেয়ে বেশিও হতে পারে। তাই দেখা যায় যে, যেকোনো এটিজিএমই সাধারণত টার্গেটকৃত বস্তুর অবস্থান থেকে এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দুর থেকে ফায়ার করা হয় না। সেক্ষেত্রে এটিজিএমের এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি এই সব অতিরিক্ত রেঞ্জ তেমন কোন কাজের না। এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি অতিরিক্ত রেঞ্জ এয়ারক্রাফট থেকে এটিজিএমের ফায়ার করার ক্ষেত্রে

কাজে লাগে।

এই সব দিক বিবেচনায় নিয়েই ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে ইউক্রেনের সৈন্যদের নিকট সবচেয়ে পছন্দের এটিজিএম হচ্ছে ব্রিটিশ NLAW লাইট এটিজিএম। এই এন'ল লাইট এটিজিএমের এফেক্টিভ রেঞ্জ সাধারণত কোন স্থিতশীল বস্তুর ক্ষেত্রে ৬০০ মিটার, চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে ৪০০ মিটার এবং ওজন লাঞ্চার, PLOS সিস্টেম সহ সব মিলিয়ে ১২কেজি হয়ে থাকে। এই রেঞ্জের মাঝে রাশিয়ার যেকোনো ট্যাংক ইউক্রেনের মতো সমভূমির দেশের পরিবেশ পরিস্থিতিতে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট!

বাংলাদেশের মতো সমভূমির দেশেও এই ধরনের লাইট এটিজিএমগুলো বেশ ভালো কার্যকর হতে পারে। এই কারনেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনী স্পেন থেকে Alcotan-100 লাইট এটিজিএম ক্রয় করেছে। এই Alcotan-100 এটিজিএমের রেঞ্জ, হিট প্রবাবলিটি ব্রিটিশ এন'ল এর সমান এবং ধ্বংস ক্ষমতা এন'ল এর চেয়ে বেশি এবং ওজন সব মিলিয়ে ১৪কেজি। যদিও সব মিলিয়ে ওজন এন'ল এর চেয়ে দুই কেজি বেশি Alcotan-100 এর তবুও সব মিলিয়ে এন'ল এর চেয়ে কোন অংশেই খারাপ না!এই ধরনের মিসাইলগুলোর গাইডেড সিস্টেম হচ্ছে PLOS(প্রেডিক্টেড লাইন অফ সাইট), গাইডেড সিস্টেমের উপর নির্ভর করে Alcotan-100 এটিজিএমের আরেকটা প্রকার আছে। এই প্রকারটি VOSEL ফায়ার সিস্টেম কম্পিউটারের মাধ্যমে গাইড করা হলে এটার এফেক্টিভ রেঞ্জ ১ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি হতে পারে। বাংলাদেশ দুইটা সিস্টেমই ক্রয় করছে।

এই ধরনের লাইট এটিজিএমগুলোর মাঝে সোভিয়েত ইউনিয়নের AT-3 Sagger এটিজিএমটি হচ্ছে, ওয়্যার গাইডেড এটিজিএম। ওয়্যার গাইডেড এটিজিএমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি লাঞ্চ করার পরেও অপারেটরের কন্ট্রোলে থাকে। সূক্ষ্ম একটি তারের মাধ্যমে লাঞ্চারের কমান্ড কন্ট্রোল কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এতে করে মিসাইল লাঞ্চ করার পরে টার্গেট সরে গেলেও মিসাইলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ থাকেনা এবং মিসাইল লাঞ্চ করার পরে নতুন করে অন্য কোন টার্গেট নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। কেননা কমান্ড কন্ট্রোল কম্পিউটারে মাধ্যমে অপারেটর টার্গেটকে পুনরায় আবার সিলেক্ট করে দিতে পারে। এই ওয়্যার গাইডেড মিসাইলগুলো অন্যান্য সিস্টেমের গাইডেড মিসাইলের মতো জ্যাম করা যায় না। এই ধরনের ওয়্যার গাইডেড মিসাইল BGM 71 TOW এর সবচেয়ে ভালো পারফর্মেন্স ছিলো সিরিয়ার যুদ্ধে। তবে এই ধরনের ওয়্যার গাইডেড মিসাইলগুলোর সবচেয়ে বড়

সমস্যা হচ্ছে এগুলোর রেঞ্জ অল্প হয়। এবং জঙ্গল ভিত্তিক দেশে যুদ্ধে অনেক ঝামেলা করে। সিরিয়ার মতো শহর ভিত্তিক রাষ্ট্রে যুদ্ধের জন্য এগুলো সবচেয়ে উপযোগী। জঙ্গল ভিত্তিক রাষ্ট্রের যুদ্ধে এগুলো লাঞ্চ করার পরে মিসাইলের সাথে সংযুক্ত সূক্ষ্ম তার গাছ বা এই জাতীয় কিছুর সাথে আটকে ছিড়ে যেতে পারে। তখন মিসাইলটির এটিজিএমের কমান্ড কন্ট্রোল কম্পিউটারের সাথে আর কোন যোগাযোগ থাকেনা।

তবে এগুলো টার্গেট সিলেক্ট করে লাঞ্চ করার পর টার্গেট জায়গা থেকে খুব বেশি দুরে সরে না গেলে এবং তার ছিড়ে গেলেও টার্গেটে আঘাত হানে। পুরোনো হলেও বর্তমান যুদ্ধেও বেশ কাজের। সিরিয়ার যুদ্ধে আসাদ ও বিরোধীরা উভয় দলই এই এটিজিএমটি ব্যাবহার করেছে। এর সবচেয়ে ভালো দিকগুলো হচ্ছে, খরচ কম, ওয়্যার গাইডেড হওয়াতে টার্গেট মিস হওয়ার সম্ভাবনা কম, এর পরিচালনাকারী ব্যাক্তি এটিজিএমের লাঞ্চার থেকে দুরে বসেই লাঞ্চ করতে পারে। এই সিস্টেমটা হচ্ছে লাঞ্চারের সাথে তার দিয়ে যুক্ত থাকা অপারেটিং ও টার্গেটিং সিস্টেমকে দুরে সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়। এতে করে শত্রুর পাল্টা হামলায় পরিচালনাকারী ব্যাক্তি নিহত হওয়ার মতো কোন ঝুঁকি থাকে না। যেই সুবিধাটি অন্যান্য এটিজিএমের ক্ষেত্রে থাকে না এবং অন্যান্য সিস্টেমের এটিজিএমের অপারেট করার সময় পাল্টা হামলায় পরিচালনাকারী ব্যাক্তি নিহত হওয়ার অনেক ঝুঁকি থাকে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এটার চায়নিজ কপি HJ-73 এটিজিএম ক্রয় করেছিলো সেই আশির দশকে। এগুলো দিয়েও বর্তমানে যেকোনো শত্রুকে বেশ ভালো নাকানি চুবানি খাওয়ানো যাবে।

আঠারোতম অধ্যায়

(ম্যানপোর্টেবল সার্ফেস টু এয়ার গাইডেড মিসাইল সম্পর্কে)

একটি দেশের বর্ধিত শক্তি হচ্ছে এয়ারফোর্স। এয়ারফোর্স মুলত শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো আগাম হামলা করে গুড়িয়ে দেয়। গ্রাউন্ড ফোর্স নামানোর পরে গ্রাউন্ড ফোর্সকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এয়ারফোর্সের কোন বিকল্প নাই। এয়ারফোর্স মুলত গ্রাউন্ড ফোর্সকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই। এয়ারফোর্স দিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় কিন্তু শত্রুর ভুমি দখলে রাখা যায় না। এই শত্রুর এয়ারফোর্সকে ঠেকানোর দুইটা সিস্টেম আছে একটি হচ্ছে, নিজেদেল এয়ারফোর্স আরেকটি হচ্ছে, এয়ার ডিফেন্স ফোর্স। এয়ারফোর্সকে ঠেকানোর জন্য পাল্টা এয়ারফোর্সের চেয়ে এয়ারডিফেন্স ফোর্স সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শত্রুর এয়ারফোর্সকে ঠেকানোর জন্য সব সময়ই নিজের এয়ারফোর্সের এয়ারক্রাফটকে একটিভ রাখা যায় না। ২৪ ঘন্টার মাঝে সর্বোচ্চ হলে ২ঘন্টা এয়ারক্রাফটকে আকাশে রাখা যায়। আবার এই এয়ারক্রাফটকে দিয়ে শুধু শত্রুর এয়ারক্রাফটকেই সর্বোচ্চ হলে ধ্বংস করা যায়। শত্রুর নিক্ষিপ্ত কোন ক্রুজ বা ব্যালিস্টিক মিসাইলকে ঠেকানো যায় না। বরং এয়ারক্রাফট গ্রাউন্ডে থাকা অবস্থায় শত্রুর মিসাইল হামলায় নিজেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এয়ারফোর্স শত্রুর উপর হামলা চালানোর জন্য ভালো হলেও শত্রুর হামলা ঠেকানোর জন্য কখনোই এয়ারফোর্স ভালো কোন উপায় না। বিপরীতে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে শত্রুর যেকোনো এয়ারক্রাফট মিসাইল সহ সব ধরনের হামলা ঠেকানো যায়। এবং সব সময়ই একটিভ রাখা যায়। এয়ারডিফেন্স ফোর্সের মুল অস্ত্র হচ্ছে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল ও এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল প্রযুক্তির কারনে যেকোনো রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করতে করে দেওয়া খুবই সহজ। ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল ও এন্টি রেডিয়েশন মিসাইলগুলোকে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়েই ঠেকানো। যায়। কিন্তু যদি এয়ারডিফেন্স সিস্টেম এগুলোকে ঠেকাতে সক্ষম না হয় তাহলে এয়ারডিফেন্সের ধ্বংস নিশ্চিত।

একটি এয়ারক্রাফট আকাশে উড়ানোর পর যদি শত্রু কর্তৃক জ্যামার সিস্টেম দিয়ে এয়ারক্রাফটকে পুরোপুরি জ্যাম করে দেয় তাহলে ঐ যুদ্ধ বিমান শত্রুর এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল হামলায় অথবা গ্রাউন্ডের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে নিজেই ক্রাশ করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এয়ারডিফেন্স যদি শত্রুর জ্যাম হয়ে যায় তাহলেও শত্রুর হামলায় ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শত্রুর পক্ষে লোকেশন খুঁজে যেমন কঠিন। এন্টি রেডিয়েশন মিসাইলের হামলা থেকে বাঁচতে এর অপারেটর যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে এয়ারডিফেন্সের রাডার বন্ধ করে দিবে। এয়ারডিফেন্সের রাডার বন্ধ করে দেওয়ার কারনে শত্রু তার যুদ্ধবিমানের এন্টি রেডিয়েশন সেন্সরগুলোকে দিয়ে এয়ারডিফেন্সকে ট্রাক করতে পারবে না ফলে এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল বা ক্রুজ মিসাইল দিয়ে এয়ারডিফেন্সকে ধ্বংসও করতে পারবে না। তেমনিভাবে যদি শত্রু এয়ারডিফেন্সের লোকেশন আগে থেকে জেনেও থাকে তাহলে এয়ারডিফেন্স জ্যাম হয়ে যাওয়ার সাথে অবস্থান পরিবর্তন করানো যাবে। এতে করেও শত্রু এয়ারডিফেন্সকে ধ্বংস করতে পারবে না। এয়ারক্রাফটের মতো নিজে নিজেই ক্রাশ করে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন ঝুঁকিও এয়ারডিফেন্সের ক্ষেত্রে নেই।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ১৯৮২ সালে ইসরাইলের অপারেশন মোল ক্রিকেট-১৯ বা বেকা ভেলির যুদ্ধে ইসরাইলের কিভাবে সিরিয়া কেন ৩০ টি এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের মাঝে ২৯ এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করে দিলো?এর উত্তরে বলা যায়, ইসরাইল যুদ্ধ বিমান দিয়ে শুধু সিরিয়ার এয়ারডিফেন্স সিস্টেমই ধ্বংস করেনি। সিরিয়ার ৮৬টির মতো এয়ারক্রাফটও ধ্বংস দিয়েছে। যা মোট ধ্বংস হয়ে যাওয়া এয়ারডিফেন্সের তিনগুণ। ইসরাইল ১৯৭৩ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের মিশর সোভিয়েত ইউনিয়নের এয়ারডিফেন্সগুলো দিয়ে অর্ধ শতেরও বেশি ইসরাইলে যুদ্ধ বিমান শুট ডাউন করে। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরী মিশর এয়ারফোর্সের ব্যাবহৃত এয়ারক্রাফটগুলো তেমন কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। এই আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইল সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরী সিরিয়া মিশর জর্ডানের ব্যাবহৃত এয়ারডিফেন্স সিস্টেমগুলো নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। তারা আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যাবহৃত এয়ারডিফেন্সগুলোকে নিজেদের সবচেয়ে বড় থ্রেট বলে মনে করে। এরপর ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এয়ারডিফেন্সগুলো নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে এগুলোর দুর্বল পয়েন্ট খুঁজে বের করে।

ইসরাইলের এই গবেষণার কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে ইসরাইলের সেই

সব বন্ধু রাষ্ট্র যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের এয়ারডিফেন্সগুলো ব্যাবহার করতো। আবার বন্ধ রাষ্ট্র না হলেও অনেক রাষ্ট্র অর্থের বিনিময়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরী নিজেদের ব্যাবহৃত এয়ারডিফেন্সগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা চালাতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে থাকা ইসরাইলের গোয়েন্দারা ও অর্থের এগুলোর ব্যাপারে তথ্য দিতে রাজি হওয়া ইঞ্জিনিয়াররা তো আছেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেও সব সময় ইসরাইলের প্রতি সফটই ছিলো। ধারণা করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই হয়তো সিরিয়ার এয়ারডিফেন্সগুলোর কোড সহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য ইসরাইলের হাতে তুলে দিয়েছে। এটা অসম্ভব কিছু না। সিরিয়ার প্রশাসন সামরিক বাহিনী সহ বিভিন্ন জায়গায়ও ইসরাইলের বহু গোয়েন্দা ছিলো। ইসরাইল তাদের মাধ্যমেও এই এয়ারডিফেন্সগুলোর ব্যাপারে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিলো। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ইসরাইল সিরিয়ার এয়ারডিফেন্সগুলো মোতায়েনের পর এগুলোর পিন পয়েন্ট লোকেশন জেনে নিয়েছিলো। সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ছিলো খুবই দুর্বল। খোদ সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার ভিতরেই ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার বহু ডাবল এজেন্ট ছিলো ।

সিরিয়ার এয়ারডিফেন্স অপারেটররাও তেমন একটা দক্ষ ছিলো না এবং এগুলো মোবাইল সিস্টেম না হওয়ার কারনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত সরানোও সম্ভব ছিলো না। সমস্ত এয়ারডিফেন্স বেকা ভেলিতেই মোতায়েন করার কারনে এগুলোকে ধ্বংস করা ইসরাইলের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে। তবুও সিরিয়ার এয়ারফোর্সের তুলনায় ইসরাইলি এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে যতটুকু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলো সেটা এয়ারডিফেন্স ফোর্সই। সিরিয়ার এয়ারডিফেন্স দিয়ে দুইটি F-15 যুদ্ধ বিমান ড্যামেজ করা হয়েছিলো এবং একটি ড্রোন শুট ডাউন করা হয়েছিলো। সিরিয়ার তুলনায় ইসরাইলি এয়ারফোর্স ও আর্মাড ফোর্স সব সময়ই কোয়ালিটি ও কান্টিটি উভয় ক্ষেত্রেই যোজন যোজন এগিয়ে ছিলো। এমনতেই পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর অস্ত্র-শস্ত্রের মান সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্র শস্ত্রের চেয়ে বহু এগিয়ে ছিলো। তার উপরে ইসরাইল পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর লেটেস্ট ওয়েপনস ব্যাবহার করে। বিপরীতে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় মানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্র-শস্ত্রেরও লেটেস্ট কোন ওয়েপনস সিরিয়া পেতো না। সিরিয়ার কান্টিটির দিক থেকেও ইসরাইলের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলো।

সামরিক ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে শত্রুর চেয়ে মান বা কোয়ালিটির দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে সেটা অধিক সংখ্যা বা কান্টিটি দিয়ে শত্রুর সামরিক শক্তির সাথে

তৈরী হওয়া গ্যাপ পুরন করে ভারসাম্য তৈরী করতে হয়। সিরিয়া না মানের দিক থেকে আর না সংখ্যার দিক থেকে ইসরাইলের চেয়ে এগিয়ে ছিলো। তখনকার সময়ে প্রচলিত থার্ড জেনারেশনের যুদ্ধের সিস্টেমে সিরিয়া কোন ভাবেই ইসরাইলের সামরিক শক্তির সাথে ভারসাম্য তৈরী করতে পারেনি। তবে বর্তমানে ফোর্থ জেনারেশনের যুদ্ধ শত্রুর থেকে সামরিক শক্তিতে পিছিয়ে থাকলেও তেমন কোন সমস্যা নেই। বর্তমানে ভারসাম্য তৈরী করাটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। ফোর্থ জেনারেশনের ওয়্যারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কৌশল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা। ফোর্থ জেনারেশন ওয়্যারে কি কি যুদ্ধাস্ত্র হলেই যুদ্ধ করা যাবে এবং এর কৌশলগুলো কি সেই বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সামনে আমরা দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কি কি সক্ষমতা দরকার সেই বিষয়ে আলোচনা করবো।

এয়ারডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংসের নতুন একটি সিস্টেম হচ্ছে, গাইডেড MLRS আর্টিলারি সিস্টেম বা গাইডেড হুইটজার আর্টিলারি সিস্টেমকে লো অল্টিটিউডের ছোট ড্রোনের মাধ্যমে কো-অর্ডিনেট করে এয়ারডিফেন্সের উপর হামলা করে গুড়িয়ে দেওয়া। ড্রোনগুলো একেবারে লো অল্টিটিউডে থাকা ও ছোট আকৃতির হওয়ার কারনে যেকোনো এয়ারডিফেন্সের রাডার দিয়ে ডিটেক্ট করা কঠিন। তাই এগুলো ধ্বংস করাও যায় না। এয়ারডিফেন্সের দিকে ধেয়ে আসা গাইডেড আর্টিলারি সিস্টেমকে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে ধ্বংস করা সম্ভব না। এটা ধ্বংস করতে হলে C-RAM সিস্টেম লাগবে। তবে এয়ার ডিফেন্সের সাথে যদি ইলেকট্রনিক জ্যামার সিস্টেম থাকে তাহলে এয়ারডিফেন্সের দিকে ধেয়ে আসা শত্রুর ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল, এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল, গাইডেড আর্টিলারি সিস্টেমকে ঠেকানো সম্ভব জ্যামিং এর দ্বারা বিভ্রান্ত করে টার্গেট নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে!

এয়ারডিফেন্স সিস্টেম বিশাল আকৃতির হওয়ার কারনে সহজেই অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও লুকিয়ে একটিভ রাখা যায় না। আবার এগুলো পরিবহন করাও খুব ঝামেলার ব্যাপার। এই সব সমস্যার কারনে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম হিসেবে এন্টি এয়ারক্রাফট গান ও এন্টি এয়ারক্রাফট ম্যানপ্যাড উত্তম সমাধান। তবে ম্যানপ্যাড ও এন্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে ক্রুজ মিসাইল কিছুটা ঠেকানো গেলেও কোন ব্যালিস্টিক মিসাইল ঠেকানো সম্ভব না। ইতিহাসে ম্যানপ্যাড দিয়ে ক্রুজ মিসাইল ঠেকানোর মতো ঘটনা খুবই অল্প আছে তার মাঝে ২০২২ সালে ইউক্রেনের সৈন্যরা রাশিয়ার একটি ক্যালিবার ক্রুজ মিসাইল ম্যানপ্যাড দিয়ে ধ্বংস করে ঠেকিয়ে দিয়েছিলো। ম্যানপ্যাড

দিয়ে মুলত হেলিকপ্টার, ড্রোন ও এয়ারক্রাফট ধ্বংস করা সহজ ব্যাপার।

মিসাইল বেসড যেকোনো এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের একটা সমস্যা হচ্ছে শত্রুর বিমান থাকা ইলেকট্রনিক জ্যামার, ফ্লেয়ার, DIRCM সিস্টেম বা অন্য কোন ডিফেন্সিভ সিস্টেমের কারনে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্যে আঘাত হানাতে পারে না। এই যেকোনো ধরনের গাইডেড মিসাইল বা টর্পেডোকে বিভ্রান্ত করার সিস্টেমকে ডেকয় সিস্টেম বলা হয়। সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত decoy শব্দটি duck Cage থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, হাঁসের খাচা। ভাষার চিরন্তন নীতি হচ্ছে, সময়ের আবর্তে এর রুপ পাল্টে যাওয়া। সেই নীতির ব্যাতিক্রম ঘটেনি এই শব্দটির ক্ষেত্রেও!ভাষা-তো আর মানুষের মত স্বার্থপর নয় যে, নিজের স্বার্থটাকেই আগলে রাখবে। ভাষা তার সর্ব-স্ব টুকু বিলিয়ে দিয়েছে মানুষের জন্য। মানুষ তাকে টেনে হিচড়ে যেভাবে ইচ্ছা হয় সেই ভাবেই তার সুবিধামত উচ্চারন করেছে!যুগে যুগে ভাষাকে মানুষের এই ধরনের টানা হিচড়ার কারনেই ভাষার অনেক পরিবর্তন এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এতটাই পরিবর্তন এসেছে যে, তার আসল রুপ ও অর্থ কি ছিলো সেটা বুঝাই মুশকিল!

শিকারিরা বুনো হাঁস শিকার করতে নকল হাঁস তৈরি করে সেটাকে পানিতে ভাসিয়ে দুরে লুকিয়ে থেকেই নিজেরাই হাঁসের ডাক নকল করে হাঁসকে ধোকা দিয়ে ফাঁদে ফেলতো!বর্তমানেও বুনো হাঁসের ঝাঁককে এই সিস্টেমে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে এসে ফাঁদে ফেলে স্বীকার করা হয়। তুরস্কে বুনো টার্কি মুরগীও এই পদ্ধতিতে শিকার করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত জীবন্ত পোষ মানা ট্রেনিং প্রাপ্ত হাঁস বা টার্কি মুরগী দিয়েও এই ভাবে ফাঁদ পাতা হয়। এই বিষয়টিকে বলা হয় ডেকয় স্ট্র্যাটেজি। আর এই বিষয়টি এতটাই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো যে, সামরিক ক্ষেত্রে কোন মিসাইল বা টর্পেডোকে ধোকা দেওয়ার প্রযুক্তিকেও ডেকয় নামে ডাকা শুরু হয়।

এই সব দিক বিবেচনায় ম্যানপ্যাডের চেয়ে গান সিস্টেম বা অটো ক্যানন সিস্টেম এয়ারডিফেন্স ভালো। গান সিস্টেম বা অটো ক্যানন সিস্টেম এয়ারডিফেন্সের অব্যাহত ফায়ারের কারনে কোন এয়ারক্রাফট এর রেঞ্জের মাঝে থাকলে কোন ভাবেই বেঁচে যাওয়া সম্ভব না। আবার বহনকরার সুবিধা এবং গেরিলা যুদ্ধে হিট এন্ড রান পলিসির কারনে ম্যানপ্যাডই উত্তম।

গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স ফায়ার করার জন্য কোথাও এটাকে স্থাপন করতে হয়।

সেই স্থাপন হয়তো ভুমিতে অথবা টয়োটা হাইল্যাক্সের মতো গাড়ির উপরে করা হয়। গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স দিয়ে শত্রুর এয়ারক্রাফটের দিকে হামলা করার সময় পাল্টা হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে অনেক। এতে মেইন অপারেটর সহ অন্যান্য ক্রুরাও নিহত হতে পারে। সেই ধরনের কোন ঝুঁকি ম্যানপ্যাডের ক্ষেত্রে নাই।

ম্যানপ্যাডের রেঞ্জ ও অল্টিটিউডের পার্থক্যের দিক বিবেচনায় কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। একটি লং রেঞ্জের ম্যানপ্যাডের সর্বোচ্চ অল্টিটিউড হয় ৫ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ হয় ৮ কিলোমিটার। এই ধরনের ম্যানপ্যাডগুলো হচ্ছে সুইডেনের RBS-70 NG, যুক্তরাষ্ট্রের FM 92 D Stinger, , ফ্রান্সের Mistral-3, যুক্তরাজ্যের Star-streak-2, রাশিয়ার 9K333 Verba ইত্যাদি।

মিডিয়াম রেঞ্জের ম্যানপ্যাডের রেঞ্জ হয় ৬ কিলোমিটার এবং অল্টিটিউড হয় ৪ কিলোমিটার। এই ধরনের ম্যানপ্যাডগুলো হচ্ছে, পাকিস্তানের Anza MK-3, রাশিয়ার 9K338 Igla-S ইত্যাদি।

শট রেঞ্জের একটি ম্যানপ্যাডের রেঞ্জ হয় ৪ কিলোমিটার এবং অল্টিটিউড হয় ৩ কিলোমিটার। এই ধরনের ম্যানপ্যাড গুলো হচ্ছে, Anza Mk-1, Mestral Mk-1, রাশিয়ার Strela-2 ইত্যাদি।

একটি হেলিকপ্টার ম্যাক্সিমাম ৬ কিলোমিটার অল্টিটিউডে উড়তে পারে। তবে গ্রাউন্ডে এটাকের সময় হেলিকপ্টারের অল্টিটিউড ২.৫-৩ কিলোমিটারের নিচে থাকে। একটি যুদ্ধ বিমান গাইডেড ওয়েপনস ফায়ার করার ক্ষেত্রে তিন কিলোমিটার চেয়ে বেশি উচ্চতায় উড়তে পারলেও আন-গাইডেড ওয়েপনস ফায়ার করার ক্ষেত্রে হেলিকপ্টারের মতোই তিন কিলোমিটারের চেয়ে কম উচ্চতায় উড়তে হয়। তবে গাইডেড বা আন-গাইডেড উভয় ধরনের ওয়েপনস ফায়ার করার সময়ই ৬ কিলোমিটার চেয়ে বেশি উচ্চতায় কোন যুদ্ধ বিমান উড়ে না। এতে করে ঐ সময়ই যেকোনো ম্যানপ্যাড দিয়ে হেলিকপ্টার বা যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করা যাবে।

গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স অনেক ধরনেরই হয়ে থাকে। তবে আকার, আকৃতি, যুদ্ধে সফল ব্যাবহার ও ওজনের দিক বিবেচনায় নিলে ২৩ মিঃমিঃ এর টুইন ব্যারেলের ZU-23 সবচেয়ে ভালো ব্যাটেল প্রুফ গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স। এটার রেঞ্জ প্রায় ২.৫কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স গুলোর ব্যারেলের ব্যাস ৩০ মিঃমিঃ এর চেয়ে বেশি হলে অপারেট করা কষ্টকর!এর চেয়ে কম হওয়াটাই

সবচেয়ে ভালো। এবং এর চেয়ে বেশি হলে মেশিন গানের মতো অব্যাহত ফায়ারও করা যায় না। যা শত্রুর এয়ারক্রাফটের জন্য এই এয়ারডিফেন্সকে ধ্বংস করতে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়। তখন এগুলো একটিভ থাকা অবস্থায়ও সহজেই যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার বা ড্রোন দিয়ে ধ্বংস করা যায়। ৩০ মিঃমিঃ এর চেয়ে বেশি ব্যাসের ব্যারেলের এয়ারডিফেন্স গানের লাঞ্চার ও বারুদও বেশ ভারি হয়ে থাকে। যা এই গান সিস্টেম এয়ারডিফেন্স পরিচালনা করা, স্থানান্তর করা ও শত্রুর পাল্টা হামলা থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে অন্যতম একটি অসুবিধা।

ঊনিশতম অধ্যায়

(আধুনিক সময়ে ড্রোন টেকনোলজির ব্যাবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে)

আধুনিক সময়ে এসে এয়ারস্ট্রাইকের জন্য ড্রোন নিঃসন্দেহে একটি ভালো সিস্টেম। ড্রোন টেকনোলজির কারনে হেলিকপ্টার ও যুদ্ধ বিমান উভয়টার একটি সংমিশ্রন ঘটানো গেছে এবং এয়ারস্ট্রাইকের খরচও কমে গেছে। নির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত করার জন্য ড্রোনের সবচেয়ে ভালো সিস্টেম। তবে আধুনিক সময়ে ড্রোনের কিছু সমস্যাও আছে।

শত্রু যদি শক্তিশালী কোন দেশ হয় তবে প্রথমেই তারা সামরিক বা বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মিসাইল বা বোমা হামলা চালাবে। সেই হামলার আওতায় সব সময়ই বিমানঘাঁটিগুলো থাকে। শত্রুর হামলায় বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ঘাটিতে বিমান রেখে দেওয়ার হ্যাঙ্গারগুলো সহ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই একটি ফিক্সড উইং কমব্যাট ড্রোনকে আকাশে উড়ানোর জন্য রানওয়ের প্রয়োজন পড়বে। রানওয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারনে ড্রোন আকাশে উড়ানো যাবে না। হ্যাঙ্গারে থাকা ড্রোন শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয়ে যাবে সহজেই। এই ধরনের ড্রোন গুলো বিমান ঘাটির হ্যাঙ্গার ছাড়া অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখে ব্যাবহার করা যায় না।

যুদ্ধের সময় বিমানঘাঁটিতে হামলা করা একটি সাধারণ ব্যাপার। সেখানে কোন কিছু রেখে দেওয়া মানেই শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। একটি ভালো মানের কমব্যাট ড্রোন তৈরী করা বহু জটিল ব্যাপার। তাছাড়া চাহিদা অনুসারে লাভবান হওয়ারও একটা ব্যাপার সেপার আছে। একটি ড্রোন তৈরীতে বহু ধরনের পার্টসের প্রয়োজন পড়ে। যেগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নিজস্ব ভাবে একটি ড্রোনে সমস্ত পার্টস তৈরী করা খুবই কঠিন।

তুরস্কের মতো দেশও ড্রোনের ইঞ্জিন, ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল সিস্টেম সহ বহু কিছুই

আমদানি করে। আবার ভালো মানের ড্রোন যেকোনো দেশ চাইলেই তৈরী করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও বহু বছর ধরে আপগ্রেড করতে করতে MQ-9 রিপারের মতো একটা ড্রোন তৈরী করেছে। ড্রোন তৈরীতে সবচেয়ে সফল রাষ্ট্র তুরস্কের ড্রোনের বহু ক্রেতা থাকা সত্বেও তারা ড্রোনের সমস্ত পার্টস তৈরী করে না। কেননা সব কিছু নিজেরা তৈরী করতে গেলে ব্যাপক উৎপাদন করা ছাড়া লস হবে। আবার ড্রোনের মানও কমে যেতে পারে। পৃথিবীর একেক কম্পানি একেকটা জিনিস ভালো বানায়। একটি রাষ্ট্র চাইলেই সব কিছু ভালো কোয়ালিটির তৈরী করতে পারবেনা।

বিমানঘাঁটিতে থাকা ড্রোন শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করতে সার্বিয়ার মতো বাংকার সিস্টেমের বিমানঘাঁটি তৈরী করতে হবে। এবং রানওয়েকে নিরাপদ রাখতেও এই ধরনের বাংকারের ভিতর থেকে রানওয়ে তৈরী করতে হবে। আবার একটি ড্রোন পরিচালনার খরচও অনেক। দক্ষ ড্রোন অপারেটর তৈরী করাও সময় ও খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। ড্রোন প্রতিপক্ষের এয়ারডিফেন্স সিস্টেম, ম্যানপ্যাড, এন্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে সহজেই শুট ডাউন করা যায়। ড্রোনের মেইন্টেন্স ঠিকমতো না হলে প্রচুর পরিমাণে ক্রাশও করে। ড্রোনের মেইন্টেন্সও একটা জটিল ব্যাপার। চীন, রাশিয়ার মতো টেকনোলজিতে সমৃদ্ধ দেশগুলোও বহু চেষ্টা করেও খুব ভালো মানের কমব্যাট ড্রোন তৈরী করতে পারেনি। অথচ এরা বেশ ভালো যুদ্ধ বিমান তৈরী করছে।

এই ধরনের কমব্যাট ড্রোন জিপিএস বা স্যাটেলাইট সিস্টেম ছাড়া পরিচালনা করা যায় না। যেই সব দেশের নিজস্ব জিপিএস সিস্টেম নেই অথবা স্যাটেলাইট নেই তাদের ড্রোন পরিচালনার ব্যাপারটা অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আবার অনেক দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকলেও নিজেদের স্যাটেলাইট তৈরীর কোন ক্ষমতা নেই। সেক্ষেত্রেও অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে। স্যাটেলাইট তৈরীর ক্ষমতা থাকলেও একটি স্যাটেলাইট তৈরী করা অনেক জটিল টেকনোলজি, বিশাল অর্থ ব্যায় ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বর্তমানে এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইল দিয়ে স্যাটেলাইট ধ্বংস করার পরে পৃথিবীর খুব কম দেশের পক্ষেই দ্রুত নিজস্ব ভাবে একটি স্যাটেলাইট নতুন করে তৈরী করে পাঠানো সম্ভব। তাছাড়া একটি দেশ কখনোই স্যাটেলাইটের সমস্ত যন্ত্রাংশ নিজেরাই তৈরী করে না। অনেক কিছুই আমদানি করতে হয়। সেই আমদানি করতে না পারলেও স্যাটেলাইট তৈরী করা আটকে যাবে। তুরস্কের মতো ভালো ড্রোন তৈরীকারক একটি দেশেরও নিজস্ব জিপিএস সিস্টেম নেই। নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকলেও নিজস্ব ভাবে স্যাটেলাইট তৈরীর ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত নেই। যদিও তুরস্ক এই প্রজেক্টে কাজ করছে।

ড্রোন তৈরীতে সবচেয়ে সফল তিনটি রাষ্ট্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, ইসরাইল। অনেকেরই ধারণা যে, ড্রোন টেকনোলজির কারনে অন্য সব অস্ত্রের তেমন কোন প্রয়োজনই নেই। বিশেষ করে এই ধারণা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তুরস্কের TB-2 ড্রোনের সাফল্যের পর থেকে। আসলে তাদের এই ধারণাটি একেবারেই ভুল। যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন দিয়ে বহু সিভিলিয়ান হত্যা করছে ভুল বশত। অর্থাৎ ড্রোন স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে বহু ভুল টার্গেটে আঘাত হেনেছে। ড্রোন স্ট্রাইকে এই ধরনের ভুল টার্গেটে আঘাত হানা একটা সাধারণ ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়ায় ব্যাপক সৈন্য রাখার পাশাপাশি ড্রোন স্ট্রাইক চালিয়ে গেলেও তারা বিজয়ী হতে পারেনি। এই ধরনের ড্রোন স্ট্রাইক সাময়িক ভাবে শত্রুকে ধ্বংস করতে পারলেও ভালো গ্রাউন্ড ফোর্স ছাড়া ভুমির দখলের ম্যাপ তেমন একটা পরিবর্তন করতে পারে না।

ড্রোন তৈরীতে অন্যতম সফল রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তিনের গাঁজায় তেমন একটা ড্রোন স্ট্রাইক করে না। সরাসরি এয়ারস্ট্রাইক চালায়। কেননা গাঁজার আন্ডার গ্রাউন্ড বাংকার ও টানেল ভিত্তিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ড্রোন স্ট্রাইক একেবারেই অচল!ড্রোন ব্যাবহারে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পাওয়া রাষ্ট্র তুরস্ক সিরিয়ায় বর্তমানে ১৫ হাজারের বেশি সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। ড্রোন দিয়েই যদি ভুমির দখল ধরে রাখা যেত তাহলে তুরস্ক-সিরিয়ার সীমান্ত বরাবর ৯১১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩০ কিলোমিটার প্রস্থ বরাবর যেই ২৫-৩০ হাজার বর্গকিলোমিটারের ভুমি রয়েছে তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত সেফ জোন হিসেবে। সেখানে ১৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে রাখার প্রয়োজন ছিলো না। সেখানে তুর্কী সৈন্য বাদেও তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর ৮৫ হাজারের মতো সৈন্য আছে। অর্থাৎ মাত্র ২৫-৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গায় ১ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন আছে। তুরস্কের TB-2 ড্রোন শত্রুর উপর হামলা করে শুধু গ্রাউন্ড ফোর্সকে সাপোর্ট দিয়েছে এই সিরিয়ার ভুমি পরিপূর্ণ রুপে দখলে নিতে এবং রাশিয়া, ইরান আসাদ বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ড্রোনের মুল কাজ এতটুকুই। একটি ড্রোন চাইলেও সব সময়ই আকাশে রাখা সম্ভব না। শত্রুর হঠাৎ যেকোনো হামলা রুখে দেওয়ার জন্য এবং ভূমির দখল ধরে রাখা ও জনগণকে নিরাপদ রাখার জন্য গ্রাউন্ড ফোর্সের কোন বিকল্প নেই।

এই সব দিক বিবেচনায় নিয়ে সেনাবাহিনীর জন্য সব চেয়ে ভালো ড্রোন হচ্ছে মাল্টি রোটর কমব্যাট ড্রোন!এবং যেকোনো সেনাবাহিনীকে নাকানি চুবানি খাওয়ানোর জন্য রোটারি উইং বা ফিক্সড উইং সুইসাইড ড্রোন সবচেয়ে কার্যকরি অস্ত্র। ফিক্সড উইং সুইসাইডড্রোন একজন সৈন্য এটা অনায়াসেই বহন ও পরিচালনা করতে

পারে। এগুলো লাঞ্চ করার জন্য ক্যাটাপুল্টের প্রয়োজন হয় না। যেমনটা বেশিরভাগ ফিক্সড উইং সুইসাইড ড্রোনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। যেকোন জায়গা থেকে লাঞ্চ করা যায়। রোটারি উইং সুইসাইড ড্রোনের এক্সট্রা সুবিধাগুলো হচ্ছে, এটি একদম লো অল্টিটিউডে উড়ে গিয়ে টার্গেটে আঘাত হানতে পারে। যার কারনে এগুলোকে কোন এয়ার ডিফেন্স দ্বারা ডিটেক্ট করা এবং এ্যাটাকে ধ্বংস করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং এগুলো দ্বারা এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করা একেবারেই সহজ ব্যাপার। সাধারনত ফিক্সড উইং সুইসাইড ড্রোন একবার লাঞ্চ করার পর নির্দিষ্ট টার্গেট খুজে না পেলেও ধ্বংস করে দিতে হয়। কিন্তু রোটারি উইং সুইসাইড ড্রোন এর ক্ষেত্রে একবার লাঞ্চ করার পর নির্দিষ্ট টার্গেট খুজে না পেলেও যেকোন জায়গায় নিরাপদে ল্যান্ডিং করতে পারে।

রোটারি উইং সুইসাইড ড্রোনগুলো হামলার জন্য একাধিকবার আকাশে উড়ানো যায়। যা দিয়ে অনেকটা আর্মাড ড্রোনের রিক্যোনাইসেন্স উ সার্ভিলেন্সের কাজ সেরে ফেলা যাবে। এই মিশনে এগুলো শুট ডাউন হলেও তেমন কোন লস নাই, এগুলোর দাম খুবই অল্প হওয়ায়। এবং যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট খুঁজে পেলে তাতে হামলা করেও ধ্বংস করে দেওয়া যাবে খুবই দ্রুত। যেখানে বড় কোন আর্মাড ড্রোন আকাশে উড়ানোর ক্ষেত্রে শুট ডাউনের ঝুঁকি থাকে সেখানে এগুলোই সবচেয়ে ভালো সমাধান। এগুলো উড্ডয়নের জন্য কোন রানওয়ে, লাঞ্চার কিছুই প্রয়োজন পড়ে না। বন জঙ্গল সহ যেকোন জায়গা থেকে লাঞ্চ করা যায়। এগুলোর সোয়ার্ম এ্যাটাক ঠেকানো যেকোনো এয়ারডিফেন্স সিস্টেম পক্ষে খুবই কঠিন। এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ রোটারি উইং সুইসাইড ড্রোন। এগুলো লাঞ্চ করার জন্য কোন লাঞ্চার প্রয়োজন হয় না, যেমনটা প্রয়োজন হয় ফিক্সড উইং সুইসাইড ড্রোনের ক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই বিষয়টি শত্রুর বিরুদ্ধে আরো সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যায় এর অপারেটরদেরকে।

একজন সৈন্য এই ধরনের চারটি রোটারি উইং সুইসাইড ড্রোন একাই কন্ট্রোল করতে পারে। এগুলো অপারেটের জন্য কোন কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজন হয় না। কাধব্যাগে বহনযোগ্য ট্যাবের মত ছোটখাট কন্ট্রোলার দারাই এগুলো অপারেট করা যায়। বিস্ফোরক বহন করার দিক থেকে এই সুইসাইড ড্রোন গুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে।

এক, ফ্রাগমেন্টেশন বিস্ফোরকবাহী যা কোন ব্যাক্তি বা লাইট ভেহিকল ধ্বংসে ব্যাবহৃত হয়।

দুই, শ্যাপড চার্জ বিস্ফোরকবাহী যা কোন হেভি আর্মার ধ্বংসে ব্যাবহৃত হয়।

তিন, থার্মোব্যারিক বিস্ফোরকবাহী যা কোন বিল্ডিং কিংবা বাংকার ধ্বংসে ব্যাবহৃত হয়।

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে কোন দেশ কমব্যাট ড্রোন ডোনেট না করলেও যুক্তরাষ্ট্র সব মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক সুইসাইড ড্রোন পাঠিয়েছিলো। কেননা সুইসাইড ড্রোন স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত হলেও কমব্যাট ড্রোন হেভি আর্মসের অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রকে অস্ত্র ডোনেশন করলে স্মল আর্মসই পাঠায়, হেভি আর্মস না। কেননা রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা মিত্র বলে কিছু নেই। আজকে যাকে বন্ধু বলে অস্ত্র দেওয়া হলো আগামীকালকে হয়তো সে শত্রু হয়ে যাবে। তখন নিজের দেওয়া অস্ত্রই নিজের বিরুদ্ধে ব্যাবহার হবে। সেক্ষেত্রে ভারী অস্ত্র হলে এগুলোর হামলা ঠেকানোও কষ্টকর হবে এবং ক্ষয়ক্ষতিও বেশি হবে। কিন্তু স্মল আর্মসের ক্ষেত্রে এমনটা হবে না। এগুলোর হামলা সহজেই রুখে দেওয়া যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতিও কম হবে। তাছাড়া ভারী অস্ত্র তৈরী করাও জটিল, সময় ও খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। যুদ্ধের খরচ কমানো সহ এই সব ঝামেলা এড়াতেও স্মল আর্মস ডোনেট করা হয়।

ড্রোন স্ট্রাইকের জন্য সবচেয়ে ভালো ড্রোন হচ্ছে, হেলিকপ্টারের মতো সিঙ্গেল রোটর বা ডুয়েল রোটর ড্রোন ও মাল্টিরোটর মাল্টিরোল ড্রোন। যেই ড্রোনগুলো আকার আকৃতিতে ছোট হয়। যেকোনো জায়গায় কাঁধে করে বা চাকা থাকা ড্রোনগুলোকে টেনে অথবা টয়োটা হাইল্যাক্সের মতো গাড়িতে করে যেকোনো জায়গায় সহজেই বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। এগুলো রোটর ড্রোন হওয়ার কারনে ভার্টিক্যালি টেকঅফ ও ল্যান্ডিং করতে পারে কোন রানওয়ের প্রয়োজন হয় না। যেকোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়। তাই শত্রুর হামলায় ধ্বংস হওয়ার কোন ঝুঁকি থাকে না। পাহাড়, বন-জঙ্গল সহ যেকোনো জায়গা থেকে উড়ানো যায় এবং নামানো যায়। এই ধরনের ড্রোন তৈরী করাও সহজ এবং তৈরীর খরচ অনেক কম। অপারেট করার খরচও কম, অপারেট করার জন্য তেমন খুব বেশি প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। অপারেটর রুম বা বৃহৎ আকৃতির গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেমেরও প্রয়োজন হয় না।

এই ধরনের ড্রোনগুলোর মাঝে বেশিরভাগ ড্রোনের ওজনও ২৫ কেজির নিচে হয়। এই ধরনের ড্রোনগুলোর মাঝে সবচেয়ে বৃহৎ আকৃতির ড্রোন হচ্ছে তুরস্কের AL-BATROSS ড্রোন। এটার তিনটা ভার্সন রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ভার্সনের ম্যাক্সিমাম টেকঅফ ওয়েট হচ্ছে ১৫০ কেজি। এবং বাকি দুইটির ম্যাক্সিমাম টেকঅফ

ওয়েট হচ্ছে, ১০০ কেজি ও ৫০ কেজি। এই ড্রোনগুলো সর্বোচ্চ পে-লোড নিয়ে ৪৫ মিনিট আকাশে উড়তে পারে। এগুলো দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রিকোনাইসেন্স মিশন পরিচালনা করা যায় বেশ ভালো ভাবেই। ড্রোনের এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাংক ছাড়া অন্য কোন পে-লোড না থাকলে এগুলো আকাশে ৪ ঘন্টা পর্যন্তও উড়তে পারবে। এই ড্রোনগুলো দিয়ে খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানি তেল সহ যেকোনো ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট পাঠানো যায়। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে সেনাবাহিনীকে সাপোর্ট পাঠানোর জন্য এই ধরনের ড্রোনের কোন বিকল্প নেই

এই এলবাট্রোস ড্রোনটিতে ৭.৬২ মিঃমিঃ এর একটি গান পড অথবা ১২টি ১২০ মিঃমিঃ এর মর্টার বোমা বহন করা যায় অনায়াসেই। এই ধরনের ড্রোন দিয়ে স্ট্রাইক করে আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যোদ্ধারা যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো ট্যাংক, হেলিকপ্টার সহ বিভিন্ন বস্তু ধ্বংস করেছে। ইউক্রেনে-রাশিয়ার যুদ্ধেও ইউক্রেন এই ধরনের ড্রোন দিয়ে রাশিয়ার অনেকগুলো ট্যাংক ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধরনের হেলিকপ্টারের মতো সিঙ্গেল রোটর বা ডুয়েল রোটর ড্রোন ও মাল্টিরোটর মাল্টিরোল ড্রোনের আরো একটি সুবিধা হচ্ছে, এগুলো লাঞ্চ করতে কোন ধরনের ক্যাটাপুল্টেরও প্রয়োজন হয় না। তুরস্কের তৈরি এই ধরনের আরেকটি ড্রোন আছে Songar নামে। এই ড্রোনটি অস্ত্র হিসেবে রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল, মেশিন গান, ৪০ মিঃমিঃ এর গ্রেনেড লাঞ্চার, লেজার ওয়েপনস পড, মর্টার শেল টাইপের বোম, ৪০ মিঃমিঃ এর ০.৫ কেজি ওজনের ৮টি রকেট ইত্যাদি ক্যারি করতে পারে। চীনের Blowfish-3 ও AR500C ড্রোনটি হেলিকপ্টারের মতো সিঙ্গেল রোটর বা ডুয়েল রোটর কমব্যাট ড্রোনের ভালো একটি উদাহরণ হতে পারে। এগুলো এন্টি ট্যাংক মিসাইল, মর্টার বোম, গান পড সহ বিভিন্ন ধরনের ওয়েপনস ফায়ার করতে পারে।

যেকোনো ধরনের কমার্শিয়াল মাল্টিরোটর ড্রোনকে মডিফাই করে এই ধরনের আর্মাড ড্রোনে রূপান্তরিত করা যায়। ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়ার যুদ্ধে বহু কমার্শিয়াল ড্রোনকে মডিফাই করে আর্মাড ড্রোনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই সব মডিফাই এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে ইউক্রেনের তৈরি মলোটভ ককটেল বাহী ড্রোন। ড্রোন থেকে মলোটভ ককটেল নিক্ষেপের দ্বারা রাশিয়ার সৈন্যরা বেশ ভালো ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলো। বহু ট্যাংক, আর্মাড নন আর্মাড ভেহিকলও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো এই মলোটভ ককটেল বাহী ড্রোনের হামলায়।

এই ধরনের ড্রোনগুলো দিয়ে শত্রুর খাদ্য শস্য চাষকৃত ভূমিতে খাদ্য শস্যের উপর অতিরিক্ত বিষ ছিটিয়ে দিয়ে ফসল নষ্ট করে দেওয়া যায় অথবা অতিরিক্ত বিষ ছিটিয়ে দেওয়া ফসল খাওয়ানোর মাধ্যমে শত্রুর জনগণকে রোগাক্রান্ত করে অথবা সরাসরি মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। আবার এগুলো দিয়ে কৃষক পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল ভালো রাখতে প্রয়োজন মাফিক ফসলে বিষ ছিটানো ও ফসল তদারকির কাজেও ব্যবহার করতে পারে। এই সমস্ত ড্রোনগুলোকেও স্মল আর্মসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

বিশতম অধ্যায়

(চাকা ও চাকা চালানোর ব্যায় সম্পর্কে)

সম্ভবত মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে, চাকা!পোর্টেবল সবকিছু তুলনামূলক সহজেই সম্পাদন করা যায় চাকার কারনে। চাকার আবিষ্কার না হলে পোর্টেবল শব্দটি বোধহয় এতটা সফল হতো না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজকে যেই উন্নতি তার কিছুই সম্ভব হতো না চাকা আবিষ্কার না হলে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে(বর্তমান ইরাক) চাকা আবিষ্কৃত হয়। তবে ইতিহাস বলে চাকার সর্ব প্রথম উদ্ভাবন হযরত আদম আঃ এর হাতেই হয়েছিলো।

বলা হয়, গ্রাউন্ড ফোর্সের মুল অস্ত্রের জায়গাটি এখনো দখল করে রেখেছে ট্যাংক। ভুমির দখল টিকিয়ে রাখতে এখনো ট্যাংকের কোন বিকল্প নেই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি ট্যাংক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। শত্রুর উপরে হামলা করার জন্য যেমন এই ট্যাংককে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিতে হয় তেমনিভাবে একটি ট্যাংককে শত্রুর পাল্টা হামলা থেকে রক্ষা করতেও অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। ভাবুন তো!চাকা আবিষ্কার না হলে এই ধরনের বিশাল ট্যাংক আবিষ্কার করা সম্ভব হতো কিনা!

ট্যাংকের ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিমানের মতো তেমন কোন মেইন্টেন্স কস্ট না থাকলেও ট্যাংকগুলো চলাচল করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে তেল খায়। ৬০ টন ওজনের একটি ট্যাংক এক কিলোমিটার চলতে প্রায় ৬ লিটার তেলের প্রয়োজন হয়। একটি ট্যাংক চালিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করলে ঘন্টায় ৬০ গ্যালন তেলের প্রয়োজন হয়। (এক গ্যালন=৪.৫ লিটার)। একটি ট্যাংক বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে অপারেশন চালানো অবস্থায় ঘন্টায় ৩০+ গ্যালন তেল প্রয়োজন হয়। যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাড়িয়ে থেকেও ইঞ্জিন চালু রেখে অপারেশন চালায়

তাহলেও মোটামুটি ১০ গ্যালন তেলের প্রয়োজন পড়বে ঘন্টায়। একটি ট্রান্সপোর্ট ভেহিকলে যদি একটি ট্যাংক ট্রান্সপোর্ট করা হয় তবে প্রতি কিলোমিটারে এক লিটার তেল প্রয়োজন হয়। এবং ট্যাংকে যদি মাইনপ্লাউ(ল্যান্ড মাইনের থেকে বাঁচার জন্য ট্যাংকে সামনের দিকে লাগানো এক ধরনের লাঙ্গল বিশেষ) ব্যাবহার করা হয় তবে তেলের প্রয়োজন ২৫% বৃদ্ধি পায়। সাধারণত একটা ট্যাংকের ফুয়েল ক্যাপাসিটি ১২০০ লিটার হয়ে থাকে। এই ফুয়েলে সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটার জায়গা অতিক্রম করতে পারে।

একুশতম অধ্যায়

(যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বাহনের প্রকারভেদ সম্পর্কে)

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বস্তু হচ্ছে, বাহন। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই বাহনের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বাহনের মোটা দাগে তিনটি প্রকার আছে, ভুমিতে চলে, পানিতে চলে এবং বাতাসে উড়ে বেড়ায়। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ভুমিতে চলা বাহন। এরপর পানিতে চলা এবং বাতাসে উড়ে বেড়ানো বাহন।

যুদ্ধ মানবজীবনের ইতিহাসের সব জায়গাতেই আছে, যদিও মানুষ এটা অপছন্দ করে তবুও করতে হয়। একটি যুদ্ধ একটি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। মানব জীবনের দৈনন্দিন কাজে এবং যুদ্ধের ময়দানে উভয় ক্ষেত্রেই বাহনের কোন বিকল্প নেই। কোন অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য, চিকিৎসার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ও ঔষধপত্র ইত্যাদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার সবচেয়ে ভালো সিস্টেম হচ্ছে, চাকা লাগানো থ্রি বা ফোর হুইলার ট্রলি, সাইকেল এবং প্যাডেল চালিত যেকোনো গাড়ি বাংলাদেশের ভ্যান গাড়ির মতো!যাতে কোন জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে না। কেননা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জ্বালানি তেল বা গ্যাসের সংকট থাকে সবচেয়ে বেশি।

প্রাচীন যুগ থেকে সৈন্য ও অস্ত্র পরিবহনের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে, ঘোড়া। ঘোড়া শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রেই না বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কিছু বহন করার জন্য ঘোড়ার কোন বিকল্প ছিলো না। ঘোড়ার মাধ্যমে মানুষ কোন ধরনের জ্বালানি খরচ করা ও নিজে কষ্ট করা ব্যাতিতই পরিবহন করতে পারে। আধুনিক সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধেও ঘোড়া একটি ভালো পরিবহন সিস্টেম। যেকোনো মাল ভর্তি ট্রলি ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিলেই বহু দুর নিয়ে যাওয়া যাবে। ঘোড়া হচ্ছে এমন একটি যুদ্ধের বাহন, যাতে তেমন কোন মেইন্টেন্স কস্ট নেই। ঘোড়া তার মালিকের প্রতি অনেক বেশি ভক্ত হয়ে থাকে। ঘোড়া তার মালিকের অনেক ইশারা ইঙ্গিত বুঝে।

ঘোড়ার নেভিগেশন সিস্টেম নেকড়ের মতোই খুব শক্তিশালী। স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর মাঝে ঘোড়া আর নেকড়ে দিয়ে বার্তা আদান প্রদান করা সবচেয়ে ঝুঁকিমুক্ত। অতীত ইতিহাসে ঘোড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বার্তা আদান প্রদান করা হতো।

ঘোড়ার মাঝে আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তায়ালা এমন অনেক গুন দিয়েছেন যা খুব কম প্রানীর মাঝেই রয়েছে। তার মাঝে কয়েকটি হচ্ছে, শত্রু মিত্র চিনতে পারার বিশেষ ক্ষমতা। আগাম বিপদ অনুভব করে মালিককে বিশেষ আচরণের মাধ্যমে সাবধান করে দিতে পারা, খুব শক্তিশালী খুর ও দ্রুত গতির অধিকারী হওয়া, আহত মালিককে শত্রুর হামলা থেকে বাচিয়ে নিরাপদ গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া, এবং প্রানীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি। ঘোড়াকে পৃথিবীর যত শক্তিশালী বিষধর সাপেই কামড় দিক তাতে ঘোড়ার মৃত্যু হয় না। সর্বোচ্চ হলে কিছুদিন অসুস্থ থাকে, এরপর সুস্থ হয়ে যায়। ঘোড়ার মাঝে এই অসুস্থ থাকার কয়েকদিনের মাঝেই এন্টি ভেনম তৈরী হয়ে যায়।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তায়ালা ঘোড়াকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যাতে সে, সাপ বিচ্ছুর শত কামড়ের পরেও বন জঙ্গল পেরিয়ে তার আরোহীকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে। এই কারনেই সমস্ত এন্টি ভেনম ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় ঘোড়ার মাঝে সাপের বিষ প্রয়োগ করে। সাপের বিষ প্রয়োগের পর ঘোড়ার শরীরের এন্টি ভেনম তৈরী হলে ঘোড়ার রক্ত সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। তবে ঘোড়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, ঘোড়ার খুব ভালো যত্ন নিতে হয়। শরীর ও খুর খুব ভালো ভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়। ঘোড়া খুরা রোগে আক্রান্ত হয় বেশি, এর জন্য খুর চেঁছে ভালো ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হয়। যুদ্ধের সময় শত্রু বা ভিতরে থাকা গাদ্দাররা স্যাবোটেজ করে ঘোড়াকে খাবারের সাথে বিষ দেয়। এতে ঘোড়া মারা যেতে পারে কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে একেবারে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। যার কারনে ঐ ঘোড়া দ্বারা কোন কাজ করা যাবে না। ভিতরে থাকা শত্রুর লোকজন স্যাবোটাজ করে ঘোড়ার খুর কেটে ফেলে যাতে ঘোড়া চলতে না পারে। ঘোড়া চলাচলের রাস্তায় শত্রু কর্তৃক লোহার পেরেক জাতীয় কিছু ফেলে রাখা হয় যাতে পেরেকের উপর ঘোড়া পারা দেওয়ার কারনে ঘোড়ার পা ছিদ্র হয়ে যায় এবং এতে করে ঘোড়া যেন আর চলতে না পারে ঐ পেরেক ফুটে যাওয়ার আঘাত না শুকানোর আগে।

যুদ্ধ শুরু হলে যেকোন দেশের প্রথম টার্গেট থাকে শত্রু দেশের যোগাযোগ ব্যাবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া। এবং তারা সর্বদাই শত্রু দেশের রাস্তার উপর নজরদারি করে।

আধুনিক কোন যানবাহন রাস্তা ছাড়া বন জঙ্গল পাহার পর্বত দিয়ে চালানো সম্ভব না। কিন্তু ঘোড়া যেকোন জায়গায় চালানো সম্ভব!শত্রু যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন শক্তিশালীরাষ্ট্র হয়, আর যুদ্ধের সময় যদি রাস্তা দিয়ে কোন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসা হয়, তাহলে সাধারন ভাবেই এটা শত্রু দেশের নজরে পড়বে। আর তারা সাথে সাথেই এয়ারস্ট্রাইক করে সেটা ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু ঘোড়া দিয়ে যদি বন জঙ্গল পাহার পর্বত পেরিয়ে কোন কিছু স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে শত্রু দেশের নজরে পড়ার সম্ভবনা খুবই কম। শত্রু যেহতু যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন দেশ তাই এরা স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নিজেদের শত্রু দেশের উপর তেল, গ্যাস ইত্যাদির মতো এনার্জি গুলোর উপর অবরোধ দিবে!তেল, গ্যাস ইত্যাদি ছাড়া গাড়ি চালানো কখনোই সম্ভব না। তারা গাড়ি চালানো বন্ধ করতে পারলেও ঘোড়া চালানো কখনোই পুরোপুরি বন্ধ করতে পারবে না!গাড়ি চালানোর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মান করা লাগলেও ঘোড়া চালানোর জন্য কোন পয়সা ব্যায় করতে হয় না। আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যোদ্ধারা সোভিয়েত ও মার্কিন বিরোধী যুদ্ধে অনেকগুলো ঘোড়া ব্যাবহার করেছে।

এমনকি বর্তমানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু উন্নতে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতই একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট আছে। ঘোড়ার ব্যাপারে কিছু তথ্য দেই, একটি ভালো জাতের ঘোড়া একদিনে স্বাভাবিক ভাবে ৪ ঘন্টা চলতে পারে। প্রতি ঘন্টায় সাধারন ভাবে ৮ মাইল বা ১২.৮কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে। অর্থাৎ একদিনে ৩২কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে। একটি হাইস্পিড ঘোড়া ঘন্টায় ৬০-৯০কিঃমিঃ গতিতে দৌড়াতে পারে। এই স্পিডে এক দিনে সর্বোচ্চ ৪ ঘন্টা দৌড়াতে পারে। অবশ্য এই স্পিডে ঘোড়া একদিন দৌড়ানোর পর টানা কয়েকদিন পর্যন্ত ঘোড়ার বিশ্রাম করতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে চালালে প্রতিদিন চলবে।

গতি, মাইলেজ বেশি এবং দাম কম এমন বাইকগুলোও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভালো কাজে দেয়। আফগানিস্তান ও ইয়ামানে এই ধরনের বাইকের পিছনে ১২.৭ মিঃমিঃ এর হেভি মেশিন গান বাইকের পিছনে সংযুক্ত করে যুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণে ব্যাবহার করা হয়েছিলো। যেগুলো অনেকটা নাট সিস্টেমে খুলা যায় আবার লাগানোও যায়। মেশিন গান লাগানোর পরেও দুইজন বাইকটিতে চড়তে পারে। একজন ড্রাইভার আরেকজন গানার। এই ধরনের বাইকগুলো দিয়ে যেকোনো টার্গেটে খুব দ্রুত ফায়ার করে পালিয়ে যাওয়া যায়। বাইক দুই চাকার সরু জিনিস হওয়ায় অলি-গলি, চিপা-চাপা, পাহাড়ের ঢাল, গিরিপথ, বন-জঙ্গল সহ যেকোনো জায়গা দিয়ে যেতে পারে।

এবং খুব দ্রুত এই বাইকটি লুকিয়ে ফেলা যায়!শত্রুর পাল্টা হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন ঝুঁকি নেই। এতে গেরিলা যুদ্ধের নীতি হিট এন্ড রান, এটাক এন্ড হাইড পলিসিটা ভালো ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

আবার নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী তৈরী করেছিলো ৭.৬২ মিঃমিঃ এর জেনারেল পারপাস মেশিনগান বাইক। যেগুলোর সামনে ড্রাইভার থাকে এবং ড্রাইভারের সামনের দিকে আর্মার থাকে। যাতে সে প্রতিপক্ষের মেশিন গানের বুলেট থেকে নিরাপদ থাকে। আর বাইকের মাঝে একটি লোহার স্ট্যান্ডের উপর ৭.৬২ মিঃমিঃ এর মেশিন গানটি ইনস্টল করা থাকে এবং পিছনে একটি স্টিলের চেয়ার লাগনো থাকে যেখানে গানার বসে ফায়ার করে। এতে করে ঐ সব বাইকগুলো কোথাও থামানোর প্রয়োজন পড়ে না ফায়ার করার জন্য। বরং চলন্ত অবস্থায়ই খুব ভালো ভাবে ফায়ার করতে পারে। একটি সাইকেল বা বাইক দিয়ে শুধু যুদ্ধই নয়, নিজের দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজই করা যায়।

কাদামাটি, পাহাড়ি ভুমি থেকে নিয়ে বালুর মরুভূমি পর্যন্ত সব জায়গায়তেই যুদ্ধের বাহন হিসেবে টয়োটা হাইল্যাক্স, ফোর্ড রেঞ্জার, মিতসুবিশি ট্রিটনের মতো গাড়ি গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এগুলোর মাইলেজ, লাইট ওয়েট, হাই স্পিড ও পিছনে ট্রাকের মতো যেকোনো কিছু পরিবহন ও সামনে প্রাইভেট কারের মতো লোকজন বহন করা যায় বিধায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে এগুলোর বেশ ভালো চাহিদা রয়েছে। এই ধরনের একটি সুন্দর গাড়ি আপনার দৈনন্দিন জীবনে গাড়ির চাহিদাও মিটাতে পারে আবার ট্রাকের মতো যেকোনো পণ্যও পরিবহন করতে পারে। সময় হলে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও ব্যাবহার করা যাবে। যুদ্ধে ব্যাপক মানুষ রিফুজি হয়ে যায়। নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও বহন করতে হয়। যুদ্ধের সময় নিজেদেরকে এবং জিনিস পত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো গাড়িও তেমন একটা পাওয়া যায় না। নিজের যদি এই ধরনের একটা গাড়ি থাকে তাহলে আর কোন চিন্তাই নাই। রিফুজি ক্যাম্পে যাওয়ার পরে তাবু খাটানো এবং সেই তাবুতে বসবাস করাও অনেক ঝামেলার ব্যাপারে। তাছাড়া আমাদের দেশের মতো বর্ষাকালের দেশে তাবু বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সিরিয়াতে এই ধরনের তাবুগুলো বৃষ্টিতে প্রায়ই ডুবে যায় আর মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না।

যদি এই ধরনের গাড়িগুলোর পিছনের অংশতেই তাবু খাটানো হয় তাহলে বর্ষাকালে কোন ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে না। এই গাড়িগুলোর মাঝের পাটিশন খুলে

ফেলানোর ব্যাবস্থাও আছে। পাটিশন খোলার পুরো গাড়ি মিলে যতটুকু জায়গা হবে সেই জায়গার তুলনায় রিফুজি ক্যাম্পের একটা তাঁবুর আয়তনও এর চেয়ে খুব বেশি বড় হয় না। গাড়িটা যদি একটু লার্জ সাইজ হয় তাহলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এই গাড়িগুলোতে তাবুর সিস্টেমটা হবে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সদস্যদের বহনকারী গাড়িগুলোর মতো। গাড়ির উপরে হওয়ার কারনে যেকোনো সময় অবস্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যাওয়া যাবে।

গাড়ির চেসিসের উপর নির্মান করা বিলাশবহুল বাড়ি অথবা গাড়িটাই বিলাশবহুল বাড়ি এই ধরনের জিনিস উন্নত দেশগুলোতে বহু আছে, সামান্য গুগল করলেই দেখতে পাবেন। সেখানে রিফিউজি হয়ে গাড়ির উপর বসবাস করাটা অস্বাভাবিক কিছু না। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায় প্রজন্মান্তর সামান্য নৌকাও বসবাস করে যাচ্ছে। সেই হিসেবে গাড়িগুলোতে বসবাস করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় ও আরামদায়কই হবে।

এই ধরনের গাড়িগুলোর সামনে বসার মতো ছয়টি সিট থাকে। তবে এতে আটজনও বসা যায়। পিছনের উন্মুক্ত জায়গাও ছয় থেকে আট জন বসা যায়। তবে অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপন করা থাকলে চারজন বসা যায়। অর্থাৎ এই ধরনের গাড়িগুলোতে অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই অনায়াসে ১০ জন সৈন্যের একটি স্কোয়াড বহন করা যায়। বর্তমানে যেকোনো অ-পেশাদার সেনাবাহিনীর চাহিদার শীর্ষে রয়েছে এই ধরনের গাড়িগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের থেকে নিয়ে বিশ্বের বহু পেশাদার সেনাবাহিনীও এগুলো বেশ ভালো পরিমাণে ব্যাবহার করে। কেননা এগুলো যেকোনো আর্মাড কারের চেয়ে দামেও অনেক কম, আবার আর্মাড পার্সোনাল ক্যারিয়ার বা এপিসির মতোই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া সিভিলিয়ান ও মিলিটারি সব ধরনের কাজই করা যায় বিধায়ও এগুলোর চাহিদা অনেক বেশি।

বাইশতম অধ্যায়

(যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে)

আমরা পূর্বে ছোট যুদ্ধাস্ত্র ও বাহনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যেই সব যুদ্ধাস্ত্রগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছি চাইলেই সেগুলো যেকোনো রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিজেরাই তৈরী করতে পারবে। সেই সব অস্ত্রগুলো তৈরীর খরচ কম, সহজেই বহনযোগ্য, শত্রুর হামলায় ধ্বংস হবে না তেমন একটা যেকোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা যাবে এবং এগুলো দিয়ে শত্রুর উপর বেশ ভালো আঘাত হানা যাবে। এখন আমরা যুদ্ধের জন্য অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবো।

যুদ্ধের জন্য একজন ব্যাক্তিকে প্রথমেই শারীরিক ভাবে শক্তিশালী হতে হবে। এই জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। বেশ ভালো সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অন্তত স্মল আর্মস গুলো পরিচালনা করার মতো দক্ষতা থাকতে হবে। গোয়েন্দা সংস্থার কাজ সম্পর্কে পুর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে এবং গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। গাড়ির ড্রাইভিং শিখতে হবে। নদী মাতৃক দেশে সাতার শিখতে হবে। এবং স্পিড বোট সহ যেকোনো ধরনের বোট খুব দ্রুত চালানো এবং খুব দ্রুত ইউটার্ন নেওয়া শিখতে হবে। যাতে করে শত্রুর যেকোন ধরনের অব্যাহত ফায়ার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যুদ্ধ করার জন্য সামরিক জুতা, পোশাক, বুলেট প্রুফ ভেস্ট, ব্যালিস্টিক হেলমেট, টেলিস্কোপ, হাত ও পায়ের মোজা, ক্যামোফ্লেজ প্যাটার্ন, ইনফ্যান্ট্রি কমব্যাট সুইট, বডি আর্মার, লোড বিয়ারিং ভেস্ট, গ্যাস মাস্ক, বোম্ব সুইট, ক্যামিক্যাল প্রটেকশন সিস্টেম, নন-লেথাল ওয়েপনস, কমব্যাট রেডিও, মাইন ডিটেক্টর সেন্সর, ক্যামিক্যাল রিকোনাইসেন্স ডিভাইস, বিভিন্ন ধরনের ম্যান পোর্টেবল রাডার, লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার, থার্মাল ইমেজার, নাইট ভিশন সিস্টেম, ইনফরমেশন কন্ট্রোল এন্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম সহ পুরো কমব্যাট সিস্টেম থাকতে হবে। অর্থাৎ যত ইনডিভিজুয়াল ইকুইপমেন্ট আছে সম্ভব হলে সবগুলোই সংগ্রহ করতে হবে। তবে এগুলো না

থাকলেও যুদ্ধ করা যাবে, তেমন কোন সমস্যা হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সব সময়ই যুদ্ধ চলেনা। বিশ্রামের জন্যও অনেক সময় পাওয়া যায়। এই বিশ্রামের জন্য তাবু খাটাতে হবে। ত্রিপলের মতো তাবুর কাপড় সংগ্রহ করতে হবে। যা একজন সৈন্যকে রোদ, ঝড়-বৃষ্টি সহ সব কিছু থেকে রক্ষা করবে। তাবু খাটানোর জন্য স্টিলের নাট বল্টুর মাধ্যমে সংযুক্ত স্ট্যান্ড পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এবং দ্রুত তাবু খাটানো শিখতে হবে। তাবুর স্ট্যান্ড মাটিতে গাড়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছোট শাবল বা এই ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় সেগুলোও সংগ্রহ করতে হবে।

যেকোনো যুদ্ধের জন্য মিলিটারি গ্রেডের ব্যালিস্টিক আইগ্লাস সংগ্রহ করে রাখতে হবে। কেননা চক্ষু হচ্ছে একজন মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চক্ষু নাই তো পুরো দুনিয়া বরবাদ!একটা পা না থাকলে বা হাত না থাকলেও দুনিয়ায় চলা যাবে। কিন্তু চক্ষু ছাড়া চলা মুশকিল!

ঘুমানোর জন্য তোষক বা বালিশ ও মশারির প্রয়োজন পড়বে। এই কাজের জন্য একেবারেই হালকা ওজনের রাবার ও প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে তৈরি এক ধরনের তোষক পাওয়া যায়। যেগুলোর ভেতর হাওয়া ভরে নিতে হয়। এবং সিটের সাথে আটকানো স্ট্যান্ডের মশারি আছে। সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরনের তোষকগুলো পানিতে ভাসাইয়া দিয়ে যেকোনো ছোটখাটো নদীও পার হওয়া যাবে। অর্থাৎ এই বায়ু ভর্তি তোষকগুলো দিয়ে ছোট খাটো নৌকার কাজও করা যাবে।

রাতে চলাচলের জন্য ব্যাটারি ও চার্জ দেওয়ার মতো সিস্টেমের শক্তিশালী একটি লাইট সংগ্রহ করে রাখতে হবে। তেলের হারিকেন জাতীয় কিছুও সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। শীতকালে নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্য আধুনিক হিটার জাতীয় কিছুও সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে।

শত্রুকে শত্রুর অজান্তেই হত্যা করার জন্য সবচেয়ে ভালো সিস্টেম হচ্ছে বিষ দেওয়া। এই বিষ, বিষের প্রতিষেধক এবং এটার প্রয়োগ সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান রাখতে হবে। নিজের সাথে প্রস্তুতকৃত এই ধরনের বিষ ও বিষের প্রতিষেধক রাখতে হবে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় খাদ্য নিয়ে। এই জন্য নিজের সাথেই এমন কিছু খাদ্য বহন করতে হবে যা অল্প খেলেই অনেক ক্যালরি পাওয়া যায়। সহজেই বহন যোগ্য এবং দীর্ঘদিন ভালো থাকে এমন খাবারগুলোর মাঝে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, খেজুর, কিসমিস, বাদাম, ছোলা বুট, মধু, গুড়া দুধ,

চকোলেট ও ডিম। তবে ডিমটা সাময়িকভাবে খাওয়া যেতে পারে। এবং দীর্ঘ দিন ভালো থাকে বিস্কুট, চানাচুর, চিড়া, সহ আরো অনেক খাবারই বহন করা যেতে পারে যেগুলো খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত!রুটি কেক এই সবও সাময়িক সময়ের জন্য নেওয়া যেতে পারে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেক খাবারই পুড়িয়ে খেতে হয় রান্না করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে বা রান্নার হাড়ি পাতিল না থাকার কারনে। এইসব পোড়ানো খাবারে কোন মসলা থাকে না। এই মসলা ছাড়া পোড়া খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। খাবার পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য নিজের সাথে কিছু চিকন স্টিলের শিক রাখা যেতে পারে।

আগুন ধরিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্যাস লাইট সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যেকোনো খাবারে তেল আর লবন দিলে বাকি কোন মসলা না দিলেও বেশ ভালো ভাবেই খাওয়া যায়। এই জন্য নিজের সাথে কিছুটা তেল ও লবন বহন করা যেতে পারে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করা থেকে নিয়ে নিজের খাবার সংগ্রহ করা পর্যন্ত সব জায়গাতেই ছুরি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কাজের জন্য ভালো কিছু ছুরি সংগ্রহে রাখতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য ব্রাশ, পেস্ট, সাবান, টিস্যু, চুল কাটার কাঁচি, নেল কাটার, রেজার, ব্লেট সহ যাবতীয় জিনিসগুলো-তো অবশ্যই নিজের সাথে রাখতেই হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধ (যেমন মাথা ব্যাথা জ্বরের জন্য নাপা ট্যাবলেট, পেটের সমস্যার জন্য ইমোটিল, ব্যাথার জন্য টরি, ক্লোফেনাক ট্যাবলেট ইত্যাদি), ব্যান্ডেজ করা সহকারে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যত কিছু লাগে সেগুলোও সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ওয়্যারলেস সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। ফোর্থ জেনারেশনের মিডিয়া ওয়্যারের মতো যুগে ভালো বাটন ফোন বা স্মার্ট ফোনও রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো বর্ষাকালের দেশে যুদ্ধ করার জন্য মুখমণ্ডল সহ ঢেকে রাখার জন্য ফুল সেট রেইন কোট ও প্লাস্টিকের বুট জুতা সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর বহর আটকানোর জন্য বিভিন্ন গাছ কেটে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়। আবার কখনো নিজেদের সামরিক বহর নদী পারাপারের জন্য গাছ কেটে সাময়িক

পারাপারের ব্যাবস্থা করতে হয়। কখনো বাংকার খনন করার পরে সেই বাংকারের ভিতরে যদি রড সিমেন্টের ঢালাই না দেওয়া হয় তাহলে মাটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই মাটি ধ্বসে পড়া আটকানোর জন্য গাছ কেটে কাঠ তৈরী করে সেই কাঠ দিয়ে ঢালাই এর বিকল্প তৈরী করা যায়। বাংলাদেশের মতো বর্ষাকালের দেশে বাংকারের মাটি ধ্বসে পড়াটা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই গাছ কাটা ও কাঠ তৈরী করার কুঠার, করাত, আধুনিক মেশিনের করাত সহ অন্যান্য আরো যত যন্ত্রপাতি আছে এবং কাঠগুলো একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়ার জন্য হাতুড়, বাটাল, লোহার পেরেক, প্লাস, গুনা সহ যাবতীয় যা আছে সেগুলোও সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

শত্রুর হামলা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন ধরনের ট্রেঞ্চ ও বাংকার খনন করা হয়। বাংকার খনন করা অনেক সময় সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার হওয়ার কারনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রেঞ্চ খনন করা হয়। এই ট্রেঞ্চ বা বাংকার খনন করার জন্য শাবল, বিভিন্ন ধরনের বড়, ছোট;প্রশস্ত, সংকীর্ণ কোদাল আছে এবং মাটি সরানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র সহ এই কাজে ব্যবহৃত যত যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখতে হবে। বিভিন্ন সময়ে শত্রুর আগমন ঠেকাতে রাস্তা কেটে দেওয়া হয়। সেই কাজেও এই সব যন্ত্রপাতি কাজে লাগবে।

ভবন, ব্রিজ ভাঙা ও রড কাটার জন্য জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করে রাখতে হবে। শত্রুর আগমন ঠেকানোর জন্য নদীর উপরের ব্রিজ ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। আবার শত্রুর হামলায় বিভিন্ন ভবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারনে অনেক সামরিক বে-সামরিক লোকজন ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে। এই সমস্ত লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভবন ধ্বংস ও রড কাটার যন্ত্রপাতির কোন বিকল্প নেই।

গাছ কেটে কাঠ তৈরী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভেহিকল আছে। বাংকার ও ট্রেঞ্চ খনন করা জন্য ভেকু সহ বিভিন্ন ধরনের ভেহিকল আছে। ব্রিজ, ভবন ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভেহিকল আছে। এই সব ভেহিকল দিয়ে ম্যানুয়াল যন্ত্রপাতির চেয়ে খুব দ্রুত কাজ সেরে ফেলা। এই ধরনের ভেহিকলগুলো বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতেই সার্ভিসে থাকে। এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকলের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় প্রফেশনাল সামরিক বাহিনীর জন্য এই ধরনের ভেহিকলগুলো সার্ভিসে রাখা অপরিহার্য। ব্যাক্তি

উদ্যোগেও চাইলে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাহাড় বা বড় কোন ভবনে উঠা নামা সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের দড়ি সংগ্রহ করে রাখতে হবে। এবং নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বহনের জন্য একটি ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

যুদ্ধ কালীন সময়ে জ্বালানি তেলের সবচেয়ে সংকট থাকে। যেই সব দেশের নিজস্ব তেলের খনি আছে তাদেরই জ্বালানি তেলের সংকট শুরু হয় যুদ্ধের সময় শত্রুর হামলায় তেল উত্তোলন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা শত্রুর দখলে চলে যাওয়ার কারনে। তার মধ্যে যাদের নিজস্ব তেলের খনি নাই তাদের জন্য যুদ্ধের তেল আমদানি করা সহজ কোন ব্যাপার না। একে-তো তেল আমদানি করার মতো বিদেশী মুদ্রার সংকট থাকে যুদ্ধের কারণে বিদেশির সাথে সমস্ত ব্যাবসা বানিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। আবার আমদানির ওয়েল ট্যাংকার জাহাজ বা ট্রাক শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অথবা শত্রুর দখলে চলে যেতে পারে। আবার তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো যুদ্ধে বিপরীতে মেরুতে অবস্থান করার জন্য সেই দেশটির উপর সমস্ত বানিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা হওয়ার কারনে যুক্তরাষ্ট্র যদি নিষেধাজ্ঞা দেয় তাহলেও বহির্বিশ্ব থেকে কিছুই আমদানি করা যাবে না। তখনতো কোন তেলই আমদানি করা যাবে না।

এই সব সমস্যা থেকে বাঁচতে বাংলাদেশের মতো উর্বর ভূমির দেশে সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে, বায়ো ডিজেল উৎপাদন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অপশন হচ্ছে পাম তেল!ব্যাক্তিগত উদ্যোগে যুদ্ধ কালীন সময়ে জ্বালানি তেলের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ৮-১০ ব্যারেল তেল আন্ডার গ্রাউন্ড বাংকারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাষ্ট্রের সমস্ত চাহিদা মিটানোর জন্য বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য নূন্যতম ১০-১২ কোটি ব্যারেল তেল আন্ডার গ্রাউন্ড বাংকারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। যা দিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য ৩-৫ বছরের মোট চাহিদা মিটানো যাবে।

তেইশতম অধ্যায়

(যুদ্ধকালীন সময়ের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে)

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় বিদ্যুৎ নিয়ে। শত্রুর হামলায় বিদ্যুতের পাওয়ার প্ল্যান্ট ধ্বংস হয়ে যায়। অথবা শত্রুর দখলে চলে গেলেও বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় যতক্ষন না আপনি তার আনুগত্য স্বীকার করেন, ততক্ষন পর্যন্ত বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ থাকে। আবার যুদ্ধের কারনে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনা করার মতো লোকজনেরও অভাব থাকে। এই পরিচালনায় কাজ করা লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে যায়। কেউ আবার এই সব সেন্সেটিভ জায়গায় হামলার ভয়েই আসেনা কাজ করতে!আবার পাওয়ার প্ল্যান্টের বিভিন্ন ধরনের পার্টস নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আমদানি করতে না পারার কারনেও বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ তৈরী করতে যেই শক্তি ব্যাবহার করা হয়, সেটার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনেও বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থ সংকটের কারনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দিতে না পারায়ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা থেমে থাকতে পারে। অথবা শত্রুর হামলায় কোন এলাকায় বিদ্যুতের তার বা খুঁটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারনেও বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সব ছাড়াও আরো বহু সংকটের কারনে বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঢাকার মতো জনবহুল শহরের পরিবেশে সামান্য সংকট তৈরী হলেই বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার উপরে ঢাকার বিদ্যুতের তারের যেই ঘিঞ্জি অবস্থা!তাতে এগুলোতে কোন সমস্যা হলেও সহজেই ঠিক করা যাবে না। বাংলাদেশের শহরগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই ধরনের ঘিঞ্জি মার্কা বিদ্যুতের তার ঠিক করতে গিয়ে প্রতি বছর গড়ে ১০০ জন মানুষ মারা যায়।

আবার বাংলাদেশে প্রতিবছরই অনেক ঝড় তুফান হয়। তখন বহু অঞ্চলেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিদ্যুত থাকে না। একদিন বিদ্যুৎ না থাকলে শহরগুলোতে পানির জন্য

হাহাকার শুরু হয়ে যায়। শহরে বিদ্যুৎ ছাড়া পানি পাওয়ার কোন উপায়ই নাই। পানি ছাড়া জীবন যাপন করা কোন ভাবেই সম্ভব না। শহরের পানির নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট কিছু কম্পানির হাতে থাকে। এতে করে তারা না চাইলে কেউ পানি পাবে না। আবার সেই পানি পাওয়ার জন্য এবং বাসা, অফিস, কল-কারখানার ছাদের উপরের টাংকিতে উত্তলোনের জন্যও বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

বিদ্যুৎ না থাকলে শীতের দিনে রাতের বেলায় আলোর এবং দিনে-রাতে তাপ উৎপাদনের সমস্যায় পড়তে হয়। আর গরমে রাতের বেলায় আলো ও দিনে-রাতে গরম থেকে শীতল হওয়ার জন্য ফ্যান বা এসি চালানো যায় না অর্থাৎ শীতল হওয়া যায় না। বিদ্যুৎ না থাকার কারনে সৃষ্টি হওয়া এই সব সমস্যাগুলোকে কিছুটা মেনে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া গেলেও কিন্তু পানির ক্ষেত্রে সংকটের কোন সমাধান না করে অভ্যস্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

বলা হয়, কিয়ামতের আগে দাজ্জাল যেই সমস্ত জিনিসের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, সুপেয় পানির উৎস। এবং পৃথিবীতে পানির উৎসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। ইতিমধ্যেই দাজ্জালের অনুসারীরা পানির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করেছে নির্দিষ্ট কিছু কম্পানির মাধ্যমে। পানির তৃষ্ণায় কাতর এমন একজন ব্যাক্তি পানির বিনিময়ে ঈমানও ত্যাগ করতে পারে।

তাছাড়া পানি কম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার সেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে এবং যেকোন দেশের সরকার আরো বেশি স্বৈরাচারী হয়ে উঠার সুযোগ পাচ্ছে। সরকার বিরোধী কোন আন্দোলন করলেই পানি বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়। এতে সরকারের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীরা। কোন ভাবেই কোন কিছুকেই সেন্ট্রালাইজ করতে দেওয়া যাবে না এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র অথবা জায়ান্ট কোন গ্রুপের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এতে করে অন্তত সাধারন মানুষের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকবে এবং তারা চাইলেই সাধারন জনগণকে যেকোন কিছু করতে বাধ্য করতে পারবে না।

লিবিয়াতে গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকে বহু শহরে লাগাতার বিদ্যুৎ ছিলোনা ৬ মাস বা এক বছর পর্যন্ত। তাতেও লোকজন তেমন কোন সমস্যা মনে করেনি। কেননা তখন পানির সাপ্লাই ঠিক ছিলো। লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে সক্রিয় কোন দলই এই পানির লাইনে হাত দেয়নি। বাংলাদেশে লিবিয়ার মতো কোন গৃহযুদ্ধ হলে সর্ব প্রথম বিভিন্ন দলগুলো এই পানির সাপ্লাই লাইনেই হাত দিবে। আরবদের অনেক ধরনের ইনসাফ আছে যা

বিশ্বে কোন জাতিগোষ্ঠীর মাঝেই নেই। কিন্তু লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় দফার শেষের দিকে যখন লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের বেনগাজি ভিত্তিক ক্ষমতাশীল খলিফা হাফতারের বাহিনী লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের ত্রিপলী ভিত্তিক শাসিত অঞ্চলের পানির লাইন বন্ধ করে দিয়েছিলো, তখনই সারা বিশ্বে জুড়ে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। পশ্চিমাঞ্চলের যারা খলিফা হাফতারের পক্ষে ছিলো তারাও হাফতারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলো। এতে করে হাফতার বাহিনী দেশে ও বিদেশে বেশ ভালো চাপের মুখে পড়ে গিয়েছিলো। যদিও লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে সেই বন্ধ করে দেওয়া পানির লাইন বেশি দিন বন্ধ থাকেনি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধেও আসাদ বাহিনী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত শহরে পানির সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছিলো বিদ্রোহীদেরকে দমন করতে।

সিরিয়ার হাসাকায় পানি আসে তুরস্ক থেকে। তুরস্ক SDF এর নিয়ন্ত্রিত হাসাকায় পানির সাপ্লাই দুই একদিন বন্ধ রেখেছিলো SDF এর বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযানের সময় SDFকে দুর্বল করতে এবং হাসাকার স্থানীয় জনগণের চাপের মুখ রাখতে। এতে করে তুরস্ক স্থানীয় লোকজনকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছে যে, তোমরা SDF কে সহায়তা করলে এবং তাদের শাসন মেনে নিলে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটুকু করবো। সেই সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের অংশ হিসেবে পানির সাপ্লাইও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যেকোনো কিছুকেই লাথি মারতে পারে। সেখানে SDF এর মতো স্বজাতির তৈরী একটি স্ব-শস্ত্র বাহিনীকে লাথি মেরে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াটা কোন ব্যাপারই না।

বলা হয়ে থাকে, সুপেয় পানির নিয়ন্ত্রণ যার হাতে থাকবে বিশ্ব তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বাংলাদেশে আল্লাহর অশেষ রহমতে পানির কোন অভাব নাই। মরুভূমির দেশেগুলোতে যেই পরিমাণ পানির হাহাকার থাকে, সেগুলো দেখলেই বুঝা যাবে পানির নিয়ামত কি জিনিস!বাংলাদেশের অনেকেই আফসোস করে এটা বলে যে, "আরব দেশে এত তেলের খনি আল্লাহ দিছে আমাদেরকে দেয় নাই কেন!"সেই আরব দেশে এক লিটার সুপেয় পানির দাম নূন্যতম ০.৫ ডলার। আরব দেশগুলো তেল বেচে যা পয়সা কামায় তার বড় একটা অংশ ব্যায় হয়ে যায় জনগণের জন্য সুপেয় পানির ব্যাবস্থা করতে গিয়ে। আর বাংলাদেশে কয়েক হাত মাটির নিচে গেলেই সুপেয় পানি পাওয়া যায় অনায়াসেই!এখন চিন্তা করে দেখুন যে পানি যদি বাংলাদেশের লোকজনকে এই দামে কিনে খেতে হতো, তাহলে কি অবস্থা হতো!এখন বাংলাদেশের মানুষ যেই ভাবে প্রচুর পানি পান করে সেই ভাবে পান করতে পারতো কিনা!তখন পানির ঢোকও হিসেব করে গিলতে হতো। পৃথিবীর বহু রোগের শিফা আছে শুধু এই সুপেয়

পানিতে। মানুষ পানি ঠিকমতো পান না করার কারনে বহু রোগে আক্রান্ত হয়। কেউ দৈনিক যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করে, তাহলে পেটের গ্যাসের সমস্যা থেকে সে অনেকটাই সুস্থ থাকবে। গরমকালে ঠিকমতো পানি পান না করার কারনেও বহু মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়।

বিদ্যুৎ ও পানির এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বড় আকৃতির শক্তিশালী সাউন্ড লেস জেনারেটর সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যাতে পানির মটর সহ সব কিছু চালানো যায় এবং একই সাথে বহু পরিবারের বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেওয়া যায়। ফিলিস্তিনের গাঁজায় ইসরাইলের হামলায় প্রায়ই এভাবে বিদ্যুতের পাওয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ধ্বংস হয়ে যায়। তাই গাঁজায় প্রচুর পরিমাণে জেনারেটর ব্যাবহার করা হয়।

আরেকটি সমাধান হচ্ছে, বিদ্যুতের তার, খাম্বা এগুলো মাটির নিচে দিয়ে ক্যাবলের মাধ্যমে নেওয়া এবং বিদ্যুতের পাওয়ার প্লান্ট আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া। এতে করে শত্রুর হামলায় বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন হবে না এবং বিদ্যুতের উৎপাদনও বন্ধ হবে না। বিদ্যুতের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো ডিসেন্ট্রালাইজ করে প্রতিটি থানায় ছোট ছোট আকারে স্থাপন করা এবং বিদ্যুৎ তৈরীর উৎস নবায়ন যোগ্য সিস্টেমের উপর করা। যেমন, হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট, সূর্যের আলো, বাতাসের বেগ, সমুদ্রের ডেউ, জোয়ার ভাটা, মাটির নিচের তাপ, পচনশীল বর্জ্য থেকে উৎপাদিত গ্যাস পুড়িয়ে অথবা পোড়ানোর মতো বর্জ্য পুড়িয়ে তাপ ভিত্তিক বিদ্যুৎ তৈরী ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করা। তেল গ্যাস কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী তখনই করা উচিত যখন এই সবের নিজেদের খনি থাকবে।

বিদ্যুতের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে এই ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ করার দ্বারা কোন আগ্রাসী শত্রু রাষ্ট্রের পক্ষেই পুরোপুরি একই সময়ে সারা দেশের বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে না। এবং পাওয়ার প্ল্যান্টে কোন সমস্যা হলেও সারা দেশের বিদ্যুৎ বন্ধ হবে না। শুধু ঐ থানার বিদ্যুৎ বন্ধ হবে। যা তুলনামূলকভাবে দ্রুত ঠিক করে ফেলাও যাবে।

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে নদী ও খাল আছে। বাংলাদেশেকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। এই নদীমাতৃক দেশের বহু নদী ও খাল বর্তমানে মরে গেছে বা ভরাট হয়ে গেছে। যদি সেই মরে যাওয়া বা ভরাট হয়ে যাওয়া নদী ও খালগুলোকে নতুন করে খনন করা যায় এবং বিদ্যমান নদী, খালগুলোকে নির্দিষ্ট একটি আয়তনে নিয়ে আসা যায়, তাহলে এই সব নদী ও খালে প্রচুর ছোট ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরী

করা যাবে। অন্তত বর্ষাকালে এগুলো থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য সময়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিন্তু তুলনা মুলক কম উৎপাদন হবে। কেননা বর্ষাকালে আমাদের দেশের নদী খালগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানির চাপ থাকে।

এভাবে তৈরী করা ছোট ছোট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরী করার কারনে কোন দেশের পক্ষেই এগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব না। এগুলো ধ্বংস করতে হলে তাকেও বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে। বড় হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করার মাধ্যমে ইন্ডিয়ার প্রতি বছর হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া বিপুল পরিমাণের পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে আস্তে আস্তে ছাড়া যাবে। এতে করে হঠাৎ পানি ছেড়ে দেওয়ার কারনে সৃষ্টি হওয়া বন্যা থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে এবং বাংলাদেশের নদীগুলোতে সারা বছর বেশ ভালো একটি পানির প্রবাহ ধরে রাখাও যাবে। প্রতিবছর ইন্ডিয়ার ছেড়ে দেওয়া পানিতে বহু মানুষের ঘরবাড়ি যে তলিয়ে যায় এবং বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, বহু মানুষ মারা যায়। সেই সব ক্ষতিও আর হবে না।

নদী ও খাল খনন করা ও নির্দিষ্ট আয়তনে নিয়ে আসার দ্বারা প্রাকৃতিক ভাবেই একটা ডিফেন্স তৈরী হবে। মরে যাওয়া খাল ও নদীগুলোকে যদি সিস্টেম করে শহরের চারপাশে খনন করা যায় তাহলে প্রাকৃতিক ভাবেই একটা বেশ ভালো ডিফেন্স তৈরী হয়ে যাবে। আগেকার সময় নদীর চারপাশ বেষ্টিত জায়গায় পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলা হতো। বাংলাদেশের সোনারগাঁও বারো ভুইয়াদের আমলে সেরকমই একটা শহর ছিলো। সোনারগাঁও এর চারপাশে শীতলক্ষ্যা নদীর দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার কারনে বহিরাগত কোন বাহিনীর পক্ষে সোনারগাঁওয়ে পৌছানোই অনেক কঠিন ছিলো!সোনারগাঁও বিজয় করা-তো অনেক পরের ব্যাপার।

এই ধরনের শহরগুলো দখল করতে আসা সৈন্যরা নদী পার হওয়ার সময়েই নদীর পাশে প্রতিরক্ষার জন্য নির্মিত দুর্গ থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হতো। তীরান্দাজরা সাধারণ তীর ও আগুনের তীর নিক্ষেপ করে পারাপার হতে চাওয়া সৈন্যদেরকে হত্যা করতো অথবা নৌজান পুড়িয়ে ডুবিয়ে দিতো। শত্রু পক্ষের দুই একজন সৈন্য যদি যদি কোনভাবে তীরে পৌঁছাতেও পারতো, তাহলে তীরে থাকা সৈন্যরা তাকে হত্যা করে ফেলতো। কোন নৌবাহিনী নিয়ে এসেও এই ধরনের শহরগুলো দখলের ক্ষেত্রে সুবিধা করা যেত না। এই ধরনের ডিফেন্সিভ নদীগুলোতে নৌবাহিনীর জাহাজ আটকে দেওয়ার জন্য নদীর দুই পাশে নির্মিত দুর্গে শেকলের

ব্যাবস্থা থাকতো। এই শেকল নদীতে টানা দিয়ে স্থাপন করা হতো। যখন শেকল পানির নিচে ডুবানো থাকতো তখন যেকোনো জাহাজই শেকলের উপর দিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু যখনই দুর্গের ভেতর থেকে শেকলটি টেনে পানির সমান সমান করে রাখা হতো তখন কোন জাহাজই ঐ শেকলের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারতো না।

এই ধরনের সুরক্ষিত একটি শহর ছিলো বাইজেন্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। যেটা বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর। আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী রাউন্ড আকৃতির বাগদাদও এই ধরনের সুরক্ষিত শহর ছিলো। এত সুরক্ষিত শহর বাগদাদকে ১২৫৮ সালে বিজয় করে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিলো মঙ্গল শাসক হালাকু খা। হালাকু খার বাগদাদ বিজয়ের প্রায় দুই শত বছর পর বাইজেন্টাইনদের সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী কনস্টান্টিনোপলও ১৪৫৩ সালে বিজয় করেন উসমানীয় সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ। এর আগে সেলজুক সুলতান মুহাম্মদ আল্প আরসালানও এই নগরী বিজয় করেছিলেন কিন্তু দখল ধরে রাখতে পারেননি।

আধুনিক সময়েও ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ এইভাবে নদী দ্বারা প্রাকৃতিক ডিফেন্সিভ শহর। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া বহু চেষ্টা করেও কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারার অন্যতম কারন হচ্ছে কিয়েভকে বেস্টন করে রাখা নিপার ও ইরপিন নদী!এই নদী দুইটি পার হতে গিয়ে ইউক্রেনের হামলায় বহু সামরিক যানবাহন ও সৈন্য হারিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেন কিয়েভে প্রবেশে করার জন্য এই দুইটি নদীর উপর নির্মিত সমস্ত ব্রিজ বা সেতুগুলো ভেঙে ফেলেছিলো। যাতে করে রাশিয়ার সেনাবাহিনী সহজে কিয়েভে প্রবেশ করতে না পারে। আবার কিয়েভ ছাড়া অন্যান্য অনেক শহরে প্রবেশের জন্য নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ ঠিক থাকলেও রাশিয়ার বহু ট্যাংক আর্মাড ভেহিকল পার হতে গিয়ে ব্রিজ থেকে সটকে নদীতে পরে গিয়েছিলো। এটা রাতে পার হতে গিয়ে বেশি ঘটেছিলো।

কিয়েভে প্রবেশের জন্য রাশিয়ার বিভিন্ন ট্যাংক আর্মাড ভেহিকলগুলো কিয়েভের আশেপাশে জড়ো করা হয়েছিলো। ইউক্রেন নিপার নদীর উপর নির্মিত বাধ ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ার কিয়েভের আশেপাশে জড়ো করা বহু ট্যাংক, আর্মাড ও নন-আর্মাড ভেহিকল পানিতে ও কাদায় ডুবিয়ে দিয়েছিলো। তখন সেই সব ভেহিকলগুলো ছেড়ে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। বর্তমান সময়ে যেকোনো রাষ্ট্র চাইলে এই ধরনের নদীতে ইউক্রেনের মতো বাঁধ দিয়ে নিজেদের শহরের জন্য ডিফেন্সিভ সিস্টেম তৈরী করতে পারবে এবং আগ্রাসী

শত্রুর ট্যাংক ও আর্মাড বা নন-আর্মাড ভেহিকলগুলোকে কাদা পানিতে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে পারবে।

বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে পানির সমস্যা থেকে বাচার আরেকটা উপায় হচ্ছে, উপ-শহর বা খাঁটি গ্রামে বসবাস করা। গ্রামে নদী, নালা, খাল, বিল, জোয়ার ভাটার পুকুর, সাধারণ আবদ্ধ পুকুর, পানির কুপ সহ বহু ধরনের প্রাকৃতিক সিস্টেমে পানি পাওয়ার উৎস রয়েছে। গ্রামে একটু খানি মাটি খনন করলেই পানি পাওয়া যায়। কিন্তু শহরের মাটির নিচের পানির লেয়ার অনেক নিচে থাকে, শহরের গরম ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিবেশর কারনে। গ্রামে প্রচুর চাপকলও রয়েছে। সেগুলো থেকে খুব ভালো সুপেয় পানি পাওয়া যায়। চাপকলের পানি গরমের দিনে ঠান্ডা থাকে আবার শীতে কিছুটা উষ্ণ থাকে। গ্রামে চাপকলের সাথেই বিদ্যুতের সাহায্যে টাংকিতে পানি উঠানোর জন্য ইলেকট্রিক্যাল পানির মটরও সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। এতে বিদ্যুৎ থাকলে শহরের মতো আধুনিক সুবিধাও পাওয়া যায়, আবার বিদ্যুৎ না থাকলে পানির কল চেপেই পানি পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ থাকা বা না থাকা নিয়ে কোন চিন্তা করতে হয় না। ইউরোপের ধনী মানুষদের সবারই গ্রামে একটি লাক্সারিয়াস বাড়ি থাকে। তারা তাদের অবসর সময় গ্রামের সেই বাড়িতেই কাটায়।

চব্বিশতম অধ্যায়

(গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানো সম্পর্কে)

যুদ্ধের সময় আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো প্রথমে একটি দেশের সামরিক স্থাপনাগুলোতে টার্গেট করে। যদি সামরিক স্থাপনাগুলোকে ধ্বংস করে ঐ দেশকে দখল করতে ব্যার্থ হয়। অথবা সামরিক প্রতিরোধকে ঠেকাতে সক্ষম না হয়। তখন দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা করে। এই হামলার উদ্দেশ্য থাকে প্রতিরোধকারী সামরিক বাহিনীর সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক শক্তির উৎসগুলো ধ্বংস করে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যেই দেশটির গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফ্লাইওভার, সেতু, রেল ও রেল স্টেশন, অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী নৌ যানবাহন ও নৌ বন্দর, সমুদ্র বন্দর, এয়ারপোর্ট, বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল ভবন, ইন্ডাস্ট্রি সহ যত ধরনের আয়ের উৎস আছে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এগুলো রক্ষা করার তেমন কোন সিস্টেম এয়ারডিফেন্স সিস্টেম বাদে। সারা দেশের সমস্ত সড়ক, রেললাইন, এয়ারপোর্টকে আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব না। সীমিত পরিসরে হয়তো আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, যা বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশেই আছে। তবে কমার্শিয়াল উচু ভবন গুলোর ক্ষেত্রে একটা ভালো সমাধান আছে।

বিশ্বের যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে প্রধান টার্গেট উচু উচু কমার্শিয়াল ভবনগুলো। এই কারনেই যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল কমার্শিয়াল ভবন টুইন টাওয়ারে হামলা করা হয়েছিলো এবং এটা বাস্তবায়ন করা যায় এমন টার্গেটগুলো মাঝে সবচেয়ে সহজ টার্গেট ছিলো। এই জন্য সব সময়ই ছোট ছোট ভবন করা উচিত। যাতে যেকোনো হামলায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।

আরব আমিরাতের ১৬৩ তলা বুর্জ খলিফা নির্মানে ব্যায় হয়েছে ১.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এটার নির্মান শুরু হয়েছিলো ২০০৪ সালে শেষ হয়েছিলো ২০০৯ সালে। বর্তমানে নির্মান সামগ্রীর বাজার দর হিসেবে এই রকম ভবন নির্মান করতে গেলে

নূন্যতম ২ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন পড়বে। বুরুজ খলিফার টোটাল ফ্লোর এরিয়া হচ্ছে ৩৩, ৩১, ১০০ ফুট। এই হিসেবে ১৬০০ ফুট বা প্রায় ২ কাঠা(৩.৭ শতাংশ) জমি নিয়ে করা এক তলা ২০০০ টা ভবনের ফ্লোর এরিয়ার সমান বুরুজ খলিফার ফ্লোর এরিয়া। বর্তমানের হিসেবে বুর্জ খলিফার নির্মানের ব্যায়ের ১০% ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়ে এই ২০০০ টি এক তলা ভবন খুব সুন্দর ভাবেই করা যাবে। প্রতিটা ভবন তৈরীতে খরচ হবে ১ লক্ষ ডলার বাংলাদেশের টাকার হিসেবে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা।

এই ধরনের বিশাল ভবনগুলোতে যদি এক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে এগুলোকে একেকটা মৃত্যুপুরি বলে মনে হবে। লিফট ছাড়া নেমে আসার কোন সিস্টেমই নাই। তাই বিদ্যুৎ না থাকলে এগুলো থেকে বের হয়ে আসাও যাবে না। এই ধরনের উচু ভবনগুলো প্রাকৃতিক ভুমিকম্প, সুনামিতে বা শত্রুর হামলায় ধ্বংস হলে একই সাথে বহু মানুষ নিহত হবে। তাদেরকে সহজে উদ্ধার করাও সম্ভব হবে না। এই ধরনের বৃহৎ ভবনগুলো নিজে ধ্বসে পড়ার সাথে সাথে আশেপাশের বহু ভবনকেও সাথে নিয়ে ধ্বসে পড়ে। কেননা বলা হয়ে থাকে যে, জিনিস যত বড় হয় তার পতনের আওয়াজও তত বড়। যে জিনিস তৈরীতে যত খরচ হয় সে জিনিস ধ্বংস হলেও ঠিক ততটাই লস হয় এবং সেটার ধ্বংসাবশেষ সরাতেও ঠিক ততটাই বিশাল খরচ হয়।

এই ধরনের বিশাল ভবনগুলোতে সর্বদাই বিদ্যুৎ লাগে। বিদ্যুৎ ছাড়া এই ধরনের বিশাল ভবন বলতে গেলে অনেকটাই অচল। এত বিদ্যুতের সাপ্লাই দেওয়াও কোন ঝামেলা হলেই কঠিন হয়ে যাবে। সংকটের সময় জেনারেটর দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া গেলেও ব্যায় অনেক হবে। এই ধরনের বিশাল ভবনগুলো পরিচালনার খরচও তুলনামূলক অনেক বেশি এবং কঠিন!

এইসব কারনেই আমরা দেখতে পাই যে, আরব আমিরাত কারো সাথে ঝামেলা করার সাহস করে না। ইয়ামানের যুদ্ধে আরব আমিরাত গাল্ফ জোটের পক্ষ হয়ে জড়ানোর কারনে হুথিরা দুইটা মিসাইল আরব আমিরাতকে লক্ষ্য করে মারার সাথে সাথেই হুথিদের সাথে বসে নিগোসিয়েশন করে নিয়েছিলো। কেননা হুথিদের হামলায় আরব আমিরাতের হারানোর মতো অনেক কিছু আছে। যাদের দুনিয়ায় হারানোর মতো অনেক কিছু থাকে তারা যেকোনো শক্তির গোলামি করতে সর্বদা বাধ্য থাকে। কারো যদি উৎসর্গ করার মতো একটি জীবন থাকে আর হারানোর মতো কোন কিছু না

থাকে, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তার মাথা নোয়াতে পারবে না। এই বিষয়টিই খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, আফগানিস্তানে মার্কিনিরা মানুষের জীবন বাদে তেমন কোন কিছুই ধ্বংস করতে পারেনি। কেননা আফগানিস্তানে ধ্বংস করার মতো তন কিছুই ছিলো না। ফলে আফগানিদের মাথা ২০ বছর যুদ্ধ করে বিশ্বের ৫৫টা দেশ মিলেও নোয়াতে পারেনি। বিপরীতে মার্কিনিরা আফগান যুদ্ধ করতে গিয়ে ২ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যায় করে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে।

এখন ধরুন, কোন দেশ আরব আমিরাতকে ধ্বংস করতে চাইলো। সেই দেশটি প্রথমেই যেই জায়গাগুলোতে আঘাত হানবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই বুরুজ খলিফা। এ্যাটাকে ধ্বংস করতে বেশি না সর্বোচ্চ হলে বুর্জ খলিফার ২৭টি স্ট্রাকচারের জন্য সর্বোচ্চ হলে ২৭টি ক্রুজ মিসাইল প্রয়োজন পড়বে। প্রত্যেকটি মিসাইলের দাম এক মিলিয়ন ইউএস ডলার করে হলেও ২৭টি মিসাইলের দাম মাত্র ২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার হবে। অর্থাৎ ২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি ভবন ধ্বংস করতে মাত্র ২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন হবে। এই বিশাল ভবনের লোকেশন খুঁজে পাওয়া এবং ক্রুজ মিসাইল দিয়ে পিন পয়েন্টে আঘাত করা কোন ব্যাপারই না। বিপরীতে যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২০০০ টা বাড়ি ক্রুজ ধ্বংস করতে হয় তাহলে কম করে হলেও ২০০০টা ক্রুজ মিসাইল প্রয়োজন পড়বে। প্রতিটা ক্রুজ মিসাইলের দাম যদি এক লক্ষ ইউএস ডলার করেও হয় তাহলেও মোট ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ হবে। অর্থাৎ দেখা যাবে যে বাড়ি নির্মাণের ও ধ্বংসের খরচ সমান। আবার প্রতিটা মিসাইলের দাম এক মিলিয়ন ইউএস ডলার করে হলে ধ্বংসের খরচ নির্মানের খরচের ১০গুণ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে শত্রুর ব্যায় সমান হবে অথবা বেশি হবে। নিজের লস কম। এই ভবনগুলো খুঁজে পাওয়া এবং পিন পয়েন্টে আঘাত করাটাও খুবই কঠিন ব্যাপার হবে শত্রুর জন্য।

এই ধরনের বিশাল ভবনগুলোর ধ্বংস ঠেকানোর জন্য ভালো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কোন বিকল্প নেই। অথচ আরব আমিরাতের নিজস্ব কোন এয়ারডিফেন্সই নেই। তবে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো থেকে ক্রয়কৃত অনেক এয়ারডিফেন্স সিস্টেম আছে। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আরব আমিরাতকে এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের সাপ্লাই না দিলে এই উঁচু ভবনগুলোর নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকবে না। এই বুর্জ খলিফা থেকে আরব আমিরাতের প্রচুর আয় হয় পর্যটন ও ব্যাবসার মাধ্যমে। কিন্তু আরব আমিরাতের দুবাইতে যদি কয়েকটা এলোপাতাড়ি ক্রুজ মিসাইল আঘাত হানে। পরের দিন পুরো বুরুজ খলিফা খালি হয়ে যাবে। কোন পর্যটক বা ব্যাবসায়ী কেউ-ই আর বুর্জ

খলিফাতে থাকবে না।

এই ছোট ছোট ২০০০ ভবন ধ্বংস হলেও ধ্বংস হয়ে যাওয়া কংক্রিটগুলোকে খোয়ার মতো নির্দিষ্ট আকারে ভেঙে এবং রডগুলোকে কিছুটা সোজা-ঠিকঠাক করে অল্প কিছু সিমেন্ট মিলিয়ে অল্প খরচেই পুনরায় নির্মান করা যাবে। কিন্তু বুর্জ খলিফার মতো ভবন

গুলোর ধ্বংসস্তূপ গুলো সরাতেই বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে। এভাবে অল্প খরচেই পুনরায় নির্মান করা সম্ভব হবে না। পুনরায় নির্মান করতে হলে সবকিছুই নতুন করে করতে হবে। আবার এগুলোর ডিজাইন করতে ও নির্মান করতেও নির্দিষ্ট কিছু ইঞ্জিনিয়ার লাগে, যারা এর বিনিময়ে বহু অর্থের মালিক হয়ে যায়। এই ধরণের উচু ভবনগুলো নির্মান করার কাজ সাধারনত বিভিন্ন কন্সট্রাকশন কম্পানিগুলো পেয়ে থাকে। এই সব কম্পানিগুলো ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তেমন একটা শ্রমিক ব্যাবহার করে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেশিনারি দিয়েই কাজ করে। এই কারনে কম্পানিগুলোর প্রচুর লাভ হয়। নির্দিষ্ট কিছু ব্যাক্তির সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যায়। অল্প শ্রমিক ব্যাবহারের কারনে মানুষের বেকারত্বও বাড়ে। এগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও ধ্বংসস্তূপ সরাতে ইঞ্জিনিয়ার ও কন্সট্রাকশন কম্পানিগুলোর প্রয়োজন পড়ে। এবং এই ধ্বংসস্তূপ দ্রুত সরাতেও মেশিনারির প্রয়োজন পড়ে। খুব দ্রুত সরানো যায় না। এগুলো ধ্বংস হলে বহু মানুষ মারা যায়। খুব দ্রুত ধ্বংসস্তূপ সরাতে না পারার কারনে ধ্বংসস্তূপের নিচে বেঁচে মানুষরাও মারা যায়। তাদেরকে দ্রুত উদ্ধার করা যায় না।

বিপরীতে ছোট ছোট ভবনগুলো নির্মানের জন্য তেমন একটা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন হয় না। বা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন হলেও উচু ভবনগুলোর তুলনায় বহু ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন হয়। সেই কারনে নির্দিষ্ট কিছু ইঞ্জিনিয়ার বহু অর্থের মালিক হয় না বরং বহু ইঞ্জিনিয়ার অল্প করে অর্থের মালিক হয়েও মোটামুটি ধনী হয়ে যায়। সম্পূর্ণ নির্মান কাজ শ্রমিকদের দিয়েই করানো হয়। এই কারনে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এগুলো নির্মানের দায়িত্ব বহু মানুষ পাওয়ার কারনে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বাড়ে না বরং বহু মানুষ অল্প করে অর্থের মালিক হয়েও মোটামুটি ধনী হয়ে যায়। ধ্বংস হলেও ধ্বংসস্তূপ সরাতে তেমন কোন মেশিনারির প্রয়োজন হয় না। খুব দ্রুত ধ্বংসস্তূপ সরানো যায়। ধ্বংস হলে খুব অল্প মানুষ মারা যায়। ধ্বংসস্তূপ দ্রুত সরাতে পারার কারনে ধ্বংসস্তূপের নিচে বেঁচে মানুষরাও বেঁচে থাকে। তাদেরকে দ্রুত উদ্ধার করা যায়।

বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ দশটি উচু ভবনের মালিক দেশগুলো হচ্ছে, আরব আমিরাত, সৌদি আরব কুয়েত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই রাষ্ট্রগুলোর মাঝে সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে দুর্বল রাষ্ট্র চারটিই(আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া) হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত। বাকী ৬টি রাষ্ট্রের মাঝে তিনটি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন বিশ্বের তিন পরাশক্তি। যারা নিজেরাই সমস্ত অস্ত্র তৈরি করে। তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের শীর্ষ দশটি সামরিক শক্তিশালী দেশের একটি। দেশটি প্রায় সব ধরনের অস্ত্রই নিজেরা তৈরী করে। তাইওয়ান প্রাকৃতিক ভাবেই চারদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার কারনে বিশাল ডিফেন্সিভ অবস্থায় আছে। তাইওয়ান সামরিক শক্তির দিক থেকেও ইসরাইলের মতোই আধুনিক ও শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র। প্রায় সমস্ত অস্ত্রই নিজেরা তৈরী করার মতো ক্ষমতা রাখে। শুধু ভিয়েতনাম একটু দুর্বল সামরিক দিক থেকে। তবুও তাদের ভালোই সামরিক শক্তি আছে। এই মুসলিম দেশগুলো সামরিক শক্তি ছাড়াই বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ করছে যেগুলোর নিরাপত্তা নির্ভর করছে পশ্চিমাদের উপর। অথচ বিশ্বের প্রায় সমস্ত সুন্দর বিলাসবহুল ভবনই কিন্তু খুব বেশি উচু হয় না। সাধারণত দুই-তিন তলা হয়ে থাকে।

পঁচিশতম অধ্যায়

(যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে)

যুদ্ধের মতো বিপর্যয় থেকে বাঁচতে প্রথমত বেসামরিক জনগণকে নিরাপদে রাখতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে, বোম্ব শেল্টার। বিভিন্ন দেশে সাবওয়ে বা আন্ডার গ্রাউন্ডওয়ে বোম্ব শেল্টার হিসেবে ব্যাবহার হয়। আবার অনেক দেশে সরকারি ভাবে বোম শেল্টার নির্মান করা হয়। বেসরকারি ভাবেও চাইলে লাক্সারিয়াস বোম শেল্টার তৈরী করা যায়। সুইজারল্যান্ড বিশ্বের একমাত্র দেশ যাদের সম্পূর্ণ জনগণকে বোম শেল্টারে রাখার মতো ক্ষমতা আছে, এমনকি সেটা নিউক্লিয়ার বোমার ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশে এই ধরনের কোন সাবওয়ে ও বোম শেল্টার নেই। সেক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় নিজে নিরাপদ থাকতে চাইলে বেসরকারি ভাবেই নিজস্ব উদ্যোগে বোম শেল্টার তৈরী করতে হবে।

সাধারণত একটি বোম শেল্টার ১০ ফুট বা ১০ মিটার থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ মিটার পর্যন্ত মাটির গভীরে তৈরী করা হয়। পৃথিবীতে অফিসিয়াল এখন পর্যন্ত এক মেগাটন টিএনটি শক্তি সম্পন্ন নিউক্লিয়ার ওয়েপনস আঘাত হানার পিন পয়েন্ট থেকে এক কিলোমিটার দুরত্বের মাঝে অবস্থান করে আঘাতের ধাক্কা সহ্য করার মতো নিউক্লিয়ার শেল্টার তৈরী করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস নিউক্লিয়ার হামলা থেকে সার্ভাইভ করার বিষয়ের এক রিপোর্টে সুইজারল্যান্ডের একজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য উল্লেখ করেছে। সেখানে সেই বিশেষজ্ঞের বক্তব্যটা ছিলো মুলত, "কোথাও নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের হামলা হলে করনীয় কি এবং কিভাবে এটার ক্ষতি থেকে বাচা যায়", সেই বিষয়ে!সেখানে তিনি বলেছেন, কোথাও নিউক্লিয়ার ওয়েপনস হামলার পর প্রথম দুই দিন বা ৪৮ ঘন্টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দুই দিন যাতে নিউক্লিয়ার শেল্টার থেকে কেউ বাহিরে বের না হয়। এবং অন্তত দুইদিনের খাদ্য ও পানীয় সব সব ধরনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু

শেল্টারে মজুদ করে রাখে। কোথাও নিউক্লিয়ার ওয়েপনস বিস্ফোরনের পর মোটামুটি দুইদিন পর্যন্ত পরিবেশে রেডিয়েশন ক্ষতিকর মাত্রায় থাকে। দুই দিন পরে নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের রেডিয়েশনের তীব্রতা কমে যায়। যতটুকু রেডিয়েশন অবশিষ্ট থাকে তা মানব দেহের জন্য বড় ধরনের কোন ক্ষতিকারক নয়। নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের ক্ষেত্রে যতটুকু না বিস্ফোরনে ধ্বংস হয়ে ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের রেডিয়েশনে।

এই ধরনের আধুনিক একটি নিউক্লিয়ার বোম শেল্টার তৈরী করতে চাইলে ব্যাক্তিগত ভাবে মোটামুটি খরচ পড়বে বাংলাদেশের হিসেবে ৫০ হাজার থেকে নিয়ে এক লক্ষ ডলারের মতো। যাতে ছয়জনের একটি পরিবার আয়েশের সাথে থাকতে পারবে। ৫-৬টি বেড রুম, টয়লেট, কিচেন রুম ডাইনিং রুম থেকে নিয়ে যাবতীয় সব থাকবে, সেই নিউক্লিয়ার বোম শেল্টারে। চাইলে বহু প্রতিবেশীদেরকেও সেই নিউক্লিয়ার বোম শেল্টারে আশ্রয় দেওয়া যাবে।

যদি টাকা পয়সা, নির্মান সামগ্রী, অথবা অনুমোদন সহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারনে স্ট্যান্ডার্ড নিউক্লিয়ার বোম শেল্টার অথবা সাধারণ বোম শেল্টার তৈরী করা সম্ভব নাও হয়। তাহলে অন্তত রড সিমেন্টের ঢালাই দিয়ে টানেল বা বাংকার তৈরী করা উচিত। টানেল বা বাংকারগুলো বোমার আঘাত সহ্য করার জন্য উপরের অংশে বাঁকা করে ডিজাইন করা হয়। এই বাংকার বা টানেলগুলোর একাধিক প্রবেশপথ রাখতে হয় এবং কিছু প্রবেশ পথ থাকে এমন যেগুলো সচরাচর তেমন একটা ব্যাবহার করা হয় না। এই প্রবেশ পথগুলো পরিবেশের সাথে এমন ভাবে মিলে থাকে যাতে করে কোন অপরিচিত ও অজানা ব্যাক্তির ক্ষেত্রে এই প্রবেশ পথগুলো খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হয়। অর্থাৎ এগুলো পরিপূর্ণ ক্যামোফ্লেজ মোডে থাকবে।

ইতিহাসে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন মার্কিন আগ্রাসন থেকে বাঁচতে একটি বাংকার তৈরী করেছিলো। মার্কিন আগ্রাসনের সময়ে সে এই বাংকারেই লুকিয়ে ছিলো। বাংকারটির প্রবেশ পথ এতটাই সরু ছিলো যে, মধ্যম দেহ আকৃতির একজন মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে কোনভাবে প্রবেশ করতে পারতো অথবা বের হতে পারতো। কেউ দেখলে কখনো মনেই করবে না যে, এই সরু ছিদ্রপথ দিয়ে কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে এবং এটার সাথে সংযুক্ত একটি আধুনিক বাংকার আছে, সেই বাংকারেরই প্রবেশ পথ এটা। এটাও কেউ ভাববেনা যে, এখানে মাটির নিচে কোন বাংকার আছে। অর্থাৎ প্রবেশ পথ ও বাংকার ফুল ক্যামোফ্লেজ অবস্থায় ছিলো।

অবশ্য এত কিছুর পরেও সাদ্দামের শেষ রক্ষা হয়নি, নিকটস্থ কারো গাদ্দারির কারনে। সাদ্দামের খুব কাছের হাতেগোনা কিছু লোক এই বাংকারটির ব্যাপারে ও এখানে মার্কিন আগ্রাসনের সময়ে সাদ্দামের অবস্থানের বিষয়টি জানতো। তাদেরই কেউ এই বিষয়টি মার্কিনিদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের সময় ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধারা এই ধরনের বহু বাংকার ও টানেল খনন করেছিলো, মার্কিন হামলায় নিরাপদ থাকতে এবং টানেল দিয়ে গিয়ে মার্কিন সৈন্যদের উপর পাল্টা হামলা করেই আবার দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার জন্য। ভিয়েতনামের এই বাংকার বা টানেলগুলো ও এগুলোর প্রবেশ পথ ফুল ক্যামোফ্লেজ অবস্থায় থাকতো!

শত্রুর পক্ষে যেন কোন ভাবেই বাংকার ও টানেলের গোপন প্রবেশ পথগুলো খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হয়, এই জন্য এই গোপন প্রবেশ পথগুলো সম্পর্কে শুধু এই বাংকার বা টানেলের মালিক ও নির্মাতারাই জেনে থাকে। এর বাহিরে কেউ যদি জানে বিশ্বাস ঘাতকতার অনেক সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বাস ঘাতকতা এড়াতেই এগুলোর অবস্থান সম্পর্কে সব কিছু গোপন রাখতে হয়। এই পথগুলো রাখা হয় মুলত শত্রুর হামলায় প্রবেশ পথ ধ্বংস হয়ে গেলে যাতে বাংকার বা টানেলের ভিতর থেকে বাহিরে বের হয়ে আসা যায়।

বাংকার বা টানেলের ভিতরে এমন সব যন্ত্রপাতি রেখে দেওয়া হয় যাতে করে শত্রুর হামলায় অথবা প্রাকৃতিক ভাবেই যদি বাংকার বা টানেল ধ্বসে পড়ে তাহলে যেন ঐ ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসা যায়। বাংকার বা টানেলের ভিতরে বাতাস চলাচলের জন্য পাইপ বা অন্য কিছু দিয়ে ভুমির উপরে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় অথবা ভিতরে অক্সিজেনের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার বা অন্য কোন উপায়ে অক্সিজেনের ব্যাবস্থা করা হয়। নিউক্লিয়ার বোম শেল্টারগুলোতে অক্সিজেন তৈরীর মেশিন সেট করা থাকা। আবার অনেক বোম শেল্টারে পাইপের মাধ্যমে ভুমির উপর থেকে অক্সিজেন রিফাইন করে ভেতরে পাঠানোর মতো মেশিন সংযুক্ত করা থাকে।

বাংকার বা টানেলের ভিতরে বসেই বাহিরের পরিস্থিতি দেখার জন্য ওয়াটার প্রুফ ক্যামেরা বা এই ধরনের কিছু ক্যামোফ্লেজ সিস্টেমে সেটিং করে দেওয়া হয় যাতে করে ক্যামেরাটা দেখা না যায়। অথবা সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মতো পেরিস্কোপ লাগানো হয়। এই ধরনের বাংকার বা টানেলগুলোতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া লাইট, ফ্যান, এসি, হিটার ইত্যাদি চালানোর জন্য। এগুলোর ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার

থাকে এবং গরমকালে ভিতরে প্রচন্ড গরম থাকে। তবে শীতকালে আরাম আছে, ভেতর উষ্ণ থাকার কারনে।

যদি কংক্রিটের ঢালাইয়ের বাংকার বা টানেল তৈরী করা সম্ভব না হয়, তাহলে সাধারণ ভাবেই মাটির বাংকার বা টানেল খনন করা হয়। এবং সম্ভব হলে কাঠ বা গাছের ডালপালা সাইজ করে কেটে বাংকার বা টানেলের উপরে এবং পাশে আটকে দেওয়া হয়। যাতে করে মাটি ধ্বসে না পড়ে অথবা ধ্বসে পড়লেও যাতে তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

অল্প সামর্থ্যের ভেতর ভালো বাংকার বা টানেল তৈরীর জন্য একটি সিস্টেম হতে পারে, ড্রেন বা পানির লাইন তৈরীর জন্য যে গোলাকার বিশাল বিশাল রড সিমেন্টের ঢালাইয়ের তৈরী পাইপ বসানো হয় সেগুলো অথবা মালবাহী জাহাজের কন্টেইনার সহ এই জাতীয় যা আছে। এগুলোকে মাটি খনন করে বসিয়ে তার উপরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে প্রবেশের জন্য পথ রাখলেই হবে। এতে খুবই কম খরচে একটি বোম শেল্টার তৈরী করা যাবে।

যেই সব দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বা তুষারপাত হয় সেই সব দেশে বর্ষাকালে বা শীতকালে বাংকার বা টানেলের মাটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। আবার বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে বাংকার বা টানেল ডুবে যাওয়া অথবা শীতকালে তুষারপাতে প্রবেশ পথ আটকে যাওয়া এবং তুষার গলে বৃষ্টির পানি জমে বাংকার বা টানেলে ব্যাপক আকারে পানি ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংকার বা টানেলের ভিতরে যাতে বৃষ্টির বা তুষার গলা পানি প্রবেশ করতে না পারে এবং তুষারপাতের কারনে প্রবেশ পথ যেন আটকে না যায়, সেই জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া এবং তুষারপাত হওয়া দেশগুলোতে বাংকারের প্রবেশ পথের উপরে টিন বা অন্য কিছু দিয়ে চাল দিয়ে দেওয়া হয়। অথবা এই ধরনের কোন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে বাংকার বা টানেলের ভিতর বৃষ্টির তুষার গলা পানি প্রবেশ করতে না পারে এবং তুষারপাতের কারনে প্রবেশ পথ যেন আটকে না যায়। বাংকার বা টানেলের প্রবেশপথ কিছুটা উচু হতে হবে যাতে বৃষ্টির সময়ে বা তুষার গলার কারনে আশেপাশে পানি না জমে। সম্ভব হলে প্রবেশ পথের আশেপাশে এক-দেড় হাত উচু দেয়াল করে দিতে হবে। যাতে পানি বাংকার বা টানেলের প্রবেশ পথের আশেপাশে না আসতে পারে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধারা এমনটাই করেছিলো তাদের বাংকার বা টানেলগুলো বর্ষাকালে ঠিকঠাক রাখার জন্য!

ছাব্বিশতম অধ্যায়

(যুদ্ধকালীন সময়ে খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্পর্কে)

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, খাদ্য পাওয়া বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খাদ্যের ব্যাবস্থা করা। খাদ্যের মোটাদাগে দুইটা প্রকার আছে, একটা রান্না করে খেতে হয় আরেকটা রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়। রান্না ছাড়াই যেটা খাওয়া যায় যুদ্ধ কালীন সময়ে এটা উত্তম। রান্না ছাড়া যেটা খাওয়া যায় সেই প্রকারটার বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরনের ফল হয়ে থাকে। এই ফল-মুল পাওয়ার জন্য অবশ্যই ফলের বাগান করতে হবে। ফলের বাগান করার দ্বারা আরেকটা উপকার হচ্ছে, এই সব বাগানে যুদ্ধের সময় লুকিয়ে থাকাও যাবে। তবে এই ধরনের বাগান করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বাগানের গাছগুলো মিডিয়াম উচ্চতার হয় এবং উচ্চ ফলনশীল হয়। একদম ছোট হাইব্রিডের গাছ যাতে না হয় আবার একেবারে বিশাল উচু গাছও যাতে না হয়। ছোট ফলের গাছ হলে এই বাগানে কোন কিছুই লুকানো যাবে না আবার বেশি উচু গাছ হলে এর ফল পেড়ে খাওয়াও সম্ভব হবে না, বেশিরভাগ ফলই নষ্ট হয়ে যাবে। গাছগুলো অনেকটা ঝুমকো টাইপের হবে এবং এর প্রচুর ঘন ডালপালা ছড়িয়ে থাকবে। যাতে করে এই গাছের নিচে কিছু লুকিয়ে রাখলে হেলিকপ্টার, যুদ্ধবিমান, ড্রোন, ট্যাংক বা আর্মাড ভেহিকল ইত্যাদি থেকে দেখা না যায়।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার জন্য শুধু ফলের বাগানই নয়, যেকোনো পতিত ভুমিতে ফলের বা কাঠের জন্য বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে রাখা যেতে পারে!যাতে এগুলো থেকে যুদ্ধের সময় বা যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় উপকৃত হওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুনামি, ঝড়, তুফান ইত্যাদির সময়েও এই সবের গতি গাছের কারনে অনেকটা কমে যায় এবং জনগণের বাড়ি ঘরের ক্ষতি কম হয়।

টিনের বা কাঠের বাড়ি, ফার্নিচার তৈরীতে গাছের কোন বিকল্প নেই। যেই সব

দেশগুলোতে প্রচুর শীত পড়ে সেই সব দেশে কাঠের ঘর বিল্ডিংয়ের চেয়ে উষ্ণ থাকে বেশি। কাঠ খুব দ্রুত ঠান্ডাও হয় না আবার খুব দ্রুত গরমও হয় না। এতে করে গরম শীত উভয় সময়েই কাঠের ঘরে আরাম। কাঠের ঘর বেশ দৃষ্টিনন্দনও হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশের মতো বর্ষাকালের দেশে কাঠের ঘর উপযোগী না।

খাদ্যের আরেকটি প্রকার হচ্ছে যেগুলো রান্না করে খেতে হয়। এই জাতীয় খাদ্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফসল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি। এই সমস্ত খাদ্যের মাঝে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় ফসল ও শাক-সবজি। এই খাদ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন পড়ে। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সার ও পোকামাকড় মারার জন্য বিষেরও প্রয়োজন পড়ে। এই ফসল ও শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে সেটা হচ্ছে, চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর। আধুনিক ট্রাক্টরগুলো দিয়ে শুধু চাষাবাদের কাজই নয় বরং আমাদের দেশের মতো কাদামাটির দেশে যুদ্ধের সময়ে শত্রুর ট্যাংক, আর্মাড বা নন-আর্মাড ভেহিকল ইত্যাদি ডেবে যাওয়ার কারনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অথবা ড্যামেজ বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভেহিকলগুলো টেনে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। আবার নিজেদের ডেবে যাওয়া ভেহিকলগুলো উদ্ধারের জন্য আধুনিক ট্রাক্টরগুলো একটি ভালো অপশন। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার পরিত্যক্ত সমস্ত ভেহিকলগুলো টেনে নিয়ে যেতে ইউক্রেনের কৃষকদের ব্যাবহৃত আধুনিক ট্রাক্টরগুলো ব্যাবহার করেছিলো ইউক্রেনের কৃষক ও সেনারা।

৬ জন সদস্যর পরিবারের খাদ্য উৎপাদন, বাসস্থান ও নিরাপদ থাকার জন্য বাংকার ইত্যাদি তৈরী করতে সব মিলিয়ে নূন্যতম ৩০ শতাংশের একটি উচু উর্বর ভুমির প্রয়োজন হবে। এতটুকু ভূমিতে সবকিছু তৈরী করা এবং ৬ জনের সারা বছরের চাহিদার সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা গেলেও একমাত্র লবন উৎপাদন করা যাবে না। তবে সমুদ্রের কাছাকাছি বসবাস করা লোকজন হলে সমুদ্রের পানি নিয়ে এসে লবনও উৎপাদন করা যাবে। সমুদ্র থেকে অনেক দুরে বসবাস করলেও পানি নিয়ে এসে লবন উৎপাদন করা যাবে কিন্তু এটা অনেক কঠিন ব্যাপার হবে। যেই সব দেশের নিজস্ব লবণাক্ত সমুদ্র সীমানা নেই তারা লবণের সাপ্লাই এর জন্য অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ কালীন সময়ে লবনের জন্য বড় ধরনের ক্রাইসিসে পড়ে। অন্য যেকোনো মসলা ছাড়া খাবার খাওয়া গেলেও লবন ছাড়া খাওয়া যায় না। তেল আর লবন হলে যেকোনো খাবারই স্বাদের হয়!মসলার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তেল আর লবণ!

যুদ্ধ কালীন সময়ে বা অন্য কোন দুর্যোগের সময়ে অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে, রান্না করা। যুদ্ধের সময়ে রান্নার জ্বালানির ব্যাপক সংকট থাকে। এই জন্য সম্ভব হলে লাইনের গ্যাস আছে এমন জায়গায় বাড়ি করা এবং লাইনের গ্যাস সংযোগ নেওয়া উচিত। যদি এটা করা না যায় বা লাইনের গ্যাস সংযোগ না থাকে তাহলে-তো আর কিছু করার নাই। লাইনের গ্যাস থাকুক অথবা না থাকুক উভয় অবস্থাতেই যুদ্ধ বা অন্য কোন দুর্যোগের সময়ের জন্য ইলেট্রিক চুলা, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, মাটির চুলা, গ্যাসের চুলা, তেলের স্টোভ, হিটার ইত্যাদি সবকিছু কিনে রাখা উচিত। যেই সব এলাকায় কয়লার খনি আছে এবং ভালো কয়লা পাওয়া যায় তারা কয়লার শিকের চুলাও বানিয়ে রাখা উচিত। যুদ্ধকালীন সময়ে একটা না হোক আরেকটা কাজে দিবেই।

যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের সময় ছাড়া উভয় অবস্থাতেই খাদ্যের কোন অপচয় করা যাবে না। বাংলাদেশে মিনিকেট চালের ক্ষেত্রে অনেকটা খাদ্যের অপচয় হয়। সাধারণ চালকে ছাঁটাই করে তৈরী করা হয় মিনিকেট চাল। এতে চালের পরিমাণ যেমন কমে যায় এবং প্রয়োজনী পুষ্টিরও ঘাটতি থাকে। সম্ভব হলে মিনিকেট চাল না খাওয়া উচিত। ভাত রান্না করার পরে মার গলানোর মাধ্যমে ভাতের চালের অনেকটা অপচয় হয়। যাদের গরু আছে তারা হয়তো গরুকে ভাতের মার খাওয়ায় কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এই মারটা ফেলে দেয়। মার ফেলে দেওয়ার দ্বারা ভাতের যে একটা লবণাক্ত স্বাদ আছে সেটাও থাকে না। এই জন্য ভাত যথা সম্ভব রাইস কুকারে অথবা মার গলানো ছাড়া অন্য কোন সিস্টেমে রান্না করা উচিত। ভাতের মার না গলানো হলে সেই ভাত খেয়েও আলাদা মজা পাওয়া যায়। সম্ভব হলে চিনিগুড়া, বাসমতী বা বাংলামতির মতো সুগন্ধি জাতীয় পোলাওয়ের চালের বেশি চাষাবাদ করা উচিত এবং সামর্থ্য থাকলে বেশি বেশি পোলাও, খিচুড়ি, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। এগুলো খেলে শরীরে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে শক্তির কোন বিকল্প নেই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে নিয়ে সব জায়গাতেই!

যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য নিজের বাড়িতে একটি পুকুর কেটে রাখা উচিত। যেটাতে জোয়ার ভাটার খাল সংযুক্ত থাকবে। খাল সংযুক্ত করা সম্ভব না হলেও একটা আবদ্ধ পুকুর কেটে রাখা উচিত। যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করা যাবে। সুন্দর একটি ঘাট বাঁধানো থাকবে। যাতে সেখানে বসে গল্প গুজব করা, বর্শি বা জাল দিয়ে মাছ ধরা, গোসল করা যায় এবং সংকটের সময়ে ঐ পুকুরে হাড়ি-পাতিল ও কাপড় ধোয়া সহ যাবতীয় সমস্ত পানির কাজ করা যায়। নিজের জমিতে হাস মুরগির গরুর ফার্মও

করে রাখা উচিত, একেবারে ছোট আকারে। যা যুদ্ধের সময় বা অন্য যেকোনো শান্তিকালীন সময়েও শুধু মাত্র পরিবারের চাহিদা মিটানোর জন্য যথেষ্ট হবে।

যুদ্ধ কালীন সময়ের জন্য জরুরি ঔষধগুলো ব্যাক্তিগত ভাবে মজুদ করে রাখা উচিত। বিশেষ করে ব্যান্ডেজ করতে ও রক্ত বন্ধ করার জিনিসপত্র। এবং হাড্ডিগোশত বোমার আঘাতে ক্ষতি গ্রস্থ হলে যেই সব ঔষধের প্রয়োজন হয় সেগুলো। নিয়মিত পরিবারের লোকজনের যেই সব ঔষধ লাগে এগুলোও সংগ্রহ করে রাখা উচিত।

তবে এই ঔষধ মজুদের ক্ষেত্রে মেয়াদ অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই বিক্রি করে আবার নতুন ঔষধ কিনে রাখতে হবে অথবা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে খেয়ে ফেলতে হবে। এরপর আবার ঔষধ কিনে রাখতে হবে। এভাবে চক্রাকারে চলতে থাকবে এই ঔষধ মজুদের ব্যাপারটা। ব্যান্ডেজ করার জিনিসপত্র সহ প্রেশার, ডায়াবেটিকস, ওজনের মাপার যন্ত্র, জ্বর মাপার জন্য থার্মোমিটার সহ যাবতীয় যা আছে এগুলো বহুদিন যাবত ব্যাবহার করা যায় সহজে নষ্ট হয় না। এবং ঔষধের মতো নির্দিষ্ট মেয়াদ না থাকায় এগুলো মজুদ করে রাখা যায় বহু দিন পর্যন্ত। এগুলোও সংগ্রহ করে রাখা উঠিত। যদিও ঔষধ মজুদ করা বেশ ঝামেলার ব্যাপার তবুও এটা করা যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

হাসপাতাল ও ঔষধ তৈরীর কারখানাগুলোকে ছোট ছোট আকারে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত, সাথে ডাক্তারদেরকেও!সম্ভব হলে হাসপাতাল ও ঔষধ তৈরীর কারখানাগুলোকে বোম শেল্টার টাইপের আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে চালু রাখা রাখতে হবে। ঔষধের সম্পূর্ণ কাচামাল অভ্যন্তরীণ ভাবেই তৈরী করা উচিত। যাতে কোন দেশের থেকে কিছু আমদানিরর জন্য নির্ভর করতে না হয়। কেননা যুদ্ধকালীন সময়ে কোন কিছু আমদানি করা অনেক কঠিন ব্যাপার!

প্রতি এক হাজার মানুষে অন্তত একজন চিকিৎসক প্রয়োজন বলে মতামত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। যুদ্ধ কালীন সময়ে ১০০ জনেই একজন ডাক্তার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এখনো ১০০০ মানুষে একজন করে ডাক্তারই নাই। যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য নূন্যতম ১০০ জনে একজন ডাক্তার তৈরী করা উচিত। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে মোট জনগণের ১% অন্তত ডাক্তার থাকতে হবে যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য।

যুদ্ধ কালীন সময়ে হাকিমী ডাক্তাররা অনেক উপকারে আসে। যখন সমস্ত ঔষধের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে যায় অথবা হাসপাতাল ও ঔষধ তৈরীর কারখানাগুলো ধ্বংস

হয়ে যায় বা ঔষধ তৈরীর কাচামালের সাপ্লাই ও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই হাকীমি ডাক্তাররা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কেননা তারা বন জঙ্গলের লতা পাতা দিয়ে চিকিৎসা করার বিশেষ একটি ক্ষমতা রাখে। এতে রোগী পুরোপুরি সুস্থ না হলেও অন্তত যুদ্ধ কালীন সময়টাতে বেঁচে থাকতে পারবে। পরে যুদ্ধ শেষ হলে উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা যাবে!

সাতাশতম অধ্যায়

(নিউক্লিয়ার ওয়েপনস সম্পর্কে)

যুদ্ধে আসলে নিউক্লিয়ার ওয়েপনসকে এত ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক চুল্লিতে ৪০% বিক্রিয়া ঘটেছে এমন ইউরেনিয়াম দিয়ে তৈরী বহু বোমা ইরাকে ফেলেছিলো। এই বোমাগুলোতে ব্যাবহৃত ইউরেনিয়ামের ৬০% বিস্ফোরণের ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিলো। এই সব নিয়ে পশ্চিমের স্বনামধন্য মিডিয়া দ্যা গার্ডিয়ান সহ অনেকগুলো মিডিয়ার রিপোর্ট আছে।

পশ্চিমা বিশ্বের বহু বিশেষজ্ঞদেরই নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের প্রচারিত ধ্বংস ক্ষমতা ও রেডিয়েশনের ব্যাপারে বিরোধি বক্তব্য আছে। যেখানে তারা এটা বলেছেন যে, নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের ধ্বংস ক্ষমতার ব্যাপারে যতটা প্রচার করা হয় নিউক্লিয়ার ওয়েপনস ততটা ধ্বংস করার মতো শক্তিশালী নয়। তবে সর্ব সম্মতিক্রমেই এটা স্বীকার্য যে, নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের মুল শক্তি হচ্ছে, বিস্ফোরনের শকওয়েভ আর রেডিয়েশন। এই দুইটা জিনিসকে এড়ানো গেলেই তেমন কোন সমস্যা হবে না, নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের হামলা হলেও।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জার বোমার ক্ষেত্রে বলা হয়, এটা একটা শক্তিশালী প্রপাগান্ডা ছিলো। কেননা সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চলা শীতল যুদ্ধে যেকোনো মূল্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে চাইতো। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি ছিলো যে, "শত্রুকে যদি তুমি আঘাত করতে না পারো দুর্বল হওয়ার কারনে তখন তুমি শত্রুকে এমনভাবে ভয় দেখাও যেন সে মনে করে তোমার উপর আঘাত করলেই সে ইতিহাস হয়ে যাবে। আর যখন তুমি শক্তিশালী থাকো তখন নিজেকে দুর্বল দেখাও যাতে শত্রু প্রলুব্ধ হয়ে তোমার উপর আক্রমণ করে। "এই নীতিটিই বাস্তবায়ন করেছে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসক নিকিতা

ক্রুশ্চেভ। এই নীতিটি সামরিক ক্ষেত্রে একটা বিখ্যাত নীতি। যা চীনের বিখ্যাত সমরবীদ সানঝু তার আর্ট অফ ওয়্যার নামের বইটিতেও উল্লেখ করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন এই জার বোমার পরীক্ষা চালায় তার পাল্টা জবাবে যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের কোন বোমার পরীক্ষা না চালিয়ে ট্যাকটিক্যাল ওয়েপনসগুলো ডেভেলপ করা শুরু করে। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারেই বোকা হয়ে গিয়েছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন আশা করেছিলো মার্কিনিরাও এই রকম কিছুর পরীক্ষা চালাবে। যুক্তরাষ্ট্র এই ট্যাকটিক্যাল ওয়েপনস আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদরকে সাপ্লাই দিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটিয়ে দিছে এবং বিলুপ্ত করে দিছে।

আবার বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রপাগান্ডা ছড়িয়েছিলো এটা বুঝার জন্য যে মার্কিনিরা এই রকম কিছু তৈরী করেছে কিনা!যদি তৈরী করে থাকে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রপাগান্ডার পড়েই হয়তো মার্কিনিরা তাদের সেই ওয়েপনসের পরীক্ষা চালাবে। এতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সত্যটা সহজে তেমন কোন খরচ ছাড়াই জানা যাবে!এবং কোন খরচ ছাড়াই এটাও বুঝা যাবে যে, এইরকম কিছু আসলেই তৈরী করা সম্ভব কিনা!কিন্তু সোভিয়েতের সেই আশায় গুড়ে বালি দিয়ে দিয়েছিলো মার্কিনিরা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে এই জার বোমার পরীক্ষা চালিয়েছিলো বলে প্রচার করেছিলো। সেই জায়গার কয়েক কিলোমিটার দুরেই লোকজন বসবাস করতো এই জার বোমার পরীক্ষার পরেও। তারা এই পরীক্ষার পরেও দিব্যি ঠিকঠাক ছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার আগ পর্যন্ত সেই পরীক্ষার জায়গাটিতে কোন সাংবাদিককে যেতে দেওয়া হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরে অনেক নিউক্লিয়ার বিশেষজ্ঞরা ও সাংবাদিকরা গিয়েছিলো সেই জায়গাটিতে। সেখানে তারা কোন রেডিয়েশনের উপস্থিতি পায়নি।

অথচ আমাদেরকে কত গাল গপ্পো শোনানো হয় যে, জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নাকি এখনো রেডিয়েশনের উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাতে বহু শিশুরা বিকলঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়। আরো কত কি!এ যেন আরব্য রজনীর সিন্দাবাদের সাত অভিজানের মতো অমর কল্প-কাহিনী!অনেকেই হয়তো রাশিয়ার চেরনোবিলের ঘটনা উল্লেখ করে বলতে পারেন যে, নিউক্লিয়ার আসলেই ধ্বংসাত্মক কিছু!তাদেরকে বলা যায় যে, আসলে চেরনোবিলে কি হয়েছে এটা রাশিয়ায়ই ভালো বলতে পারবে, যদি সত্যটা বলে আরকি!

সোভিয়েত ইউনিয়নের নিউক্লিয়ার ওয়েপনস-তো সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে যাওয়া ও দুর্বল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি। যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, নিউক্লিয়ার ওয়েপনস যেমনটা বলা হয় তেমন শক্তিশালী। তাহলে তো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, যেই অস্ত্র একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারেনা, যুদ্ধে বিজয়ী করতে পারে না, দুর্বল-ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনা সেই অস্ত্রের পিছনে ঐ রাষ্ট্রের বহু অর্থ ঢেলে তৈরী করা এবং বহু অর্থ ব্যায় করে বছরের পর বছর রক্ষনাবেক্ষন করে যাওয়ার কি মানে থাকতে পারে!তাছাড়া এই নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের মেইন্টেন্সে সামান্য ত্রুটি হলে কিংবা এটার উপরে কেউ হামলা করলে ব্যাপক বিস্ফোরন ঘটে শত্রুর নিউক্লিয়ার ওয়েপনস হামলার মতোই হয়ে যাবে!সেক্ষেত্রে এই সুইসাইড বোম্ব নিজের ঘরে পেতে রাখার আদৌ কি কোন মানে থাকতে পারে!

যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার বোম B-61 যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো যুদ্ধ বিমানে হরহামেশাই ব্যাবহার করা যায়। আকার আকৃতি দেখেও কারো পক্ষেই বুঝা সম্ভব না যে, এটা নিউক্লিয়ার বোম। যুক্তরাষ্ট্র এটার বহু পরীক্ষাও চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডবাহী আর্টিলারিও আছে। সেগুলোও দেখতে সাধারন আর্টিলারির মতোই। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে দেখে বুঝার কোন উপায় নেই যে, এটা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডবাহী আর্টিলারি। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক, আফগানিস্তানে এমন কোন অস্ত্র নেই যা নিক্ষেপ করেনি এবং এই ভুমিগুলোতে পরীক্ষা চালায়নি। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিজয়ী হওয়ার জন্য তার সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সেখানে এই ধরনের নিউক্লিয়ার বোমা যে নিক্ষেপ করা হয়নি তারই-বা গ্যারান্টি কি!যদি এমন কিছু যুক্তরাষ্ট্র নিক্ষেপ করেও থাকে তাহলে পশ্চিমের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া নিশ্চয়ই সারা বিশ্বের মানুষকে জানাবে না, পশ্চিমের অনুমোদন ব্যাতিত!। মিডিয়াই-বা এই নিউক্লিয়ার বোমা হামলার ব্যাপারে জানবে কি করে যদি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কিছু না জানায়!

কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যে, জার বোমা নিয়ে এতবড় ভাওতাবাজি যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন করেই থাকে তবে বিষয়টা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানেনি?

উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ তারা জেনেছে বিধায়ই এইসবকে পাত্তা না দিয়ে ট্যাকটিক্যাল ওয়েপনসগুলো ডেভেলপ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

জার বোমার প্রপাগান্ডার বিষয়ে কি মার্কিনিদের কোন অফিসিয়াল বক্তব্য আছে?

উত্তর হচ্ছে, না। এই বিষয়ে মার্কিনিদের পক্ষে কখনোই অফিসিয়াল বক্তব্য দেওয়া সম্ভব না। পৃথিবীর কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই এই বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া সম্ভব না। আর শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলোকে তো কেউ গণনাই করে না। তারা তো এমনিতেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর গোলাম। তাছাড়া তাদের এমন কোন ফ্যাসিলিটিও নাই যা দ্বারা তারা এটার ভাঁওতাবাজি প্রমাণ করতে পারে এবং সারা বিশ্বের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে অফিসিয়াল বক্তব্য দিলে নিউক্লিয়ারের জারিজুরি অফিসিয়াল ভাবে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা ফালানোর নামে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জুড়ে যেই ভয়ের রাজনীতি শুরু করেছে এবং যেই ভয়ের রাজনীতির মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে নিজের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রেখেছে, সেটা এই ধরনের একটি বক্তব্যের দ্বারাই ধ্বসে পড়তে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধরনের প্রপাগান্ডায় কি ধরনের ফায়দা থাকতে পারে?

উত্তর হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে জনগণের মতামত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বিশাল একটা অংশ সহ জনগণনের প্রতিনিধি সিনেটরদের অনেকেই সোভিয়েতের এই প্রপাগান্ডার ব্যাপারে জানেনা। যারা জানে তাদের পক্ষেও এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করা সম্ভব না যে, এটা একটা প্রপাগান্ডা ছিলো কোন অফিসিয়াল বক্তব্য না থাকার কারনে। আবার সবার মনেই একটা সন্দেহ আছে যে, যদি এটা সত্য হয়!মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, সন্দেহের সাথে প্রপাগান্ডার প্রতি বিশ্বাস রাখে যারা জানে তারা সবাই। এখন যদি যুক্তরাষ্ট্র কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধে জড়ায় সরাসরি অথবা প্রক্সি। তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমেই নিউক্লিয়ার ওয়েপনস হামলার হুমকি দিবে। বর্তমানে যেমনটা সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরি রাশিয়া করে থাকে।

এই ধরনের হামলার হুমকির দিকটি বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটররা কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমস্ত নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের মালিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে কোন ধরনের যুদ্ধের অনুমোদন দিবে না। এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও নিউক্লিয়ার ওয়েপনস হামলার ভয়-ভীতির কারনে ব্যাপক আন্দোলন করবে যুদ্ধ না করার জন্য। এতে করে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেই ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। তখন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিধা-দন্ধে পড়ে যাবে। এবং অভ্যন্তরীণ ঝামেলা শুরু হওয়ার ভয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোন ধরনের যুদ্ধে জড়ানোর মতো কোন ঝুঁকি নিবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের

প্রপাগান্ডার দ্বারা মুল লাভ এটাই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের হামলা থেকে নিরাপদ থাকবে। এবং অন্য কোন রাষ্ট্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ চালালেও যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত বা দুর্বল করে ফেলার জন্য পিছনে পিছনে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাপোর্ট দিলেও কখনোই সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে না। অর্থাৎ নিজের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কিছুটা মেনে নিবে, অন্তত প্রকাশ্যে!সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারকারীরা সব সময়ই নিজের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে শত্রুর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও প্রপাগান্ডাও কিছুটা মেনে নেয়।

নিউক্লিয়ার ওয়েপনস অনেকটা আগের যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধের জন্য হাতি পালার মতো ব্যাপার। হাতি পালার জন্য ও হাতিকে যুদ্ধে ব্যাবহারের জন্য উপযোগী করে তুলতে খরচ অনেক হলেও শত্রু বাহীনি যদি হাতিকে মোকাবিলার কৌশল জানে তাহলে শত্রুর জন্য হাতিকে মোকাবিলা করা কঠিন কিছু ছিলো না।

নিউক্লিয়ার ওয়েপনস ব্যাবহারের অনেকগুলো সিস্টেম আছে। তার মাঝে সবচেয়ে সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত সিস্টেম হচ্ছে, ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল। বিশেষ করে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বা সংক্ষেপে আইসিবিএম। একেকটা ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরীর খরচ মিলিয়ন মিলিয়ন ইউএস ডলার। এত অর্থ খরচ করে যখন একটি দেশ আরেকটা দেশের উপর হামলা চালায়, তখন মুল লক্ষ্যই থাকে মিসাইলগুলো যেন শত্রুর ভুমিতে বেশ ভালো পরিমাণে ধ্বংস করে। তখন সেই সব মিসাইলে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক ব্যাবহার করা হয়। পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বাকী আট দশটা উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরকের মতোই একটি বিস্ফোরক, মুল কথা

এতটুকুই!পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম অন্যান্য আট দশটা উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরকের চেয়ে বেশি কিছু না!

রাশিয়ার আইসিবিএম Topol-M হচ্ছে সার্ভিসে থাকা সিঙ্গেল ওয়্যারহেড সিস্টেমের সবচেয়ে বৃহত্তম আইসিবিএমগুলোর একটি!এটার মোট ওজন ৪৭, ২০০কেজি। এর মাঝে যদি মোট ওজনের ৫০% (২৩, ৬০০ কেজি) উচ্চ ক্ষমতার ওয়্যারহেড হয়, তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন যে, স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিমাণ উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক হলে কি পরিমাণ বিস্ফোরন ঘটাতে পারে!যেখানে একটা ৫০ কেজি ওজনের এমোনিয়াম নাইট্রেটের মতো স্বস্তা বিস্ফোরকে দিয়েই তৈরী আইইডি

যেকোনো ট্যাংক ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে, সেখানে ২৩, ৬০০ কেজি উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক বিস্ফোরনের দ্বারা যে বেশ ভালো এরিয়া জুড়ে ধ্বংস হবে এবং বড় একটা শক ওয়েভ তৈরী হবে এটাতো স্বাভাবিক ব্যাপার!তাই না?তাহলে বিশেষ করে পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের বিস্ফোরককে ভয় পাওয়ার কি কারন থাকতে পারে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সঙ্গীরা আফগানিস্তানে যত বোমা গোলাবারুদ নিক্ষেপ করছে, সেগুলোর সম্মিলিত বিস্ফোরন ক্ষমতা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ব্যাপারে যেমনটা বলা হয়, সেই কথিত ধ্বংস ক্ষমতার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি ছিলো। অথচ সেই সব নিয়ে কেউ কখনো ভয় পায়না!চোখের সামনে ঘটে যাওয়া আফগানিস্তানের এই ব্যাপক বিস্ফোরনকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া লোকজন অ-দেখা বহু বছর আগে একবার কি হয়েছিলো না-হয়েছিলো সেই বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান এনে এই নিউক্লিয়ারের ভয়ে আতকে উঠতেছে!

অনেকেই হয়তো অবাক হতে পারে এটা শুনে যে, তরবারি দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যত মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার সিকিভাগের এক ভাগও আধুনিক অস্ত্রগুলো দিয়ে করা সম্ভব হয়নি। এমনকি নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের যেই শক্তি ক্ষমতা প্রচার করা হয়, সেটা যদি সত্যিও হয়ে থাকে তাহলে সেই নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের ব্যাপক হামলা করেও তরবারি দিয়ে হত্যাকৃত মানুষের সংখ্যার সমান সংখ্যক মানুষ হত্যা করা যাবে না। তবুও কেউ ছুরি বা তরবারিকে তেমন একটা ভয় পায় না। তাহলে নিউক্লিয়ার ওয়েপনসকে এতটা ভয় পাওয়ার কি কারন থাকতে পারে, মিডিয়ার প্রচারণা ব্যাতিত!

কোন জাতি যদি যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে অথবা মুসলিম হলে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জিহাদ করতে পারে, তাহলে তো নিউক্লিয়ার ওয়েপনসকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। সে রাইফেলে গুলির আঘাতেও মরবে আর নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের আঘাতেও মরবে। ফলাফল উভয়ক্ষেত্রেই মৃত্যু!তাহলে এত হারানোর ভয় কিসের!জীবনের চেয়ে পৃথিবীতে মূল্যবান আর কিছুই নেই। সেই জীবনও যখন কেউ উৎসর্গ করতে পারছে সেখানে আর কি-বা ধ্বংস হয়ে হারানোর

ভয় থাকতে পারে!

আটাশতম অধ্যায়

(যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীদের ধর্ষিত হওয়া সম্পর্কে)

আগের পর্বগুলোতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তুতি শুধু পুরুষদের জন্য নয়। সমানতালে পরিবার নারীদেরকেও এই সব প্রস্তুতি নিতে হবে!যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেই সমস্যাটা হয় তার মাঝে একটি হচ্ছে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের হাতে নারীদের ধর্ষিত হওয়া। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধরনের ধর্ষনের পিছনে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আছে। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিপক্ষের নারীদের ধর্ষন করার দ্বারা পুরুষদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায়। পুরুষরা নারীদেরকে বাড়িতে রেখে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সাহস পায় না। কোন পুরুষের সামনে তার পরিবারের কোন নারীকে ধর্ষণ করার দ্বারা ঐ পুরুষকে রাগান্বিত করে তোলা যায়। এতে করে ঐ পুরুষের মস্তিষ্ক অনেকটাই বিকল হয়ে যায়। কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক পুরুষ-তো পাগলও হয়ে যায় কিংবা হীনমন্যতায় ভোগে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

যুদ্ধের একটা মুল নিয়ম হচ্ছে, "প্রতিপক্ষের পুরুষদেরকে হত্যা করা আর নারীদেরকে ধর্ষণ করা"। এই ধর্ষনের ভীতির কারনে বহু নারী হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এই হতবিহ্বলতার কারনে নারীরা তাদের শরীরে কোন শক্তিই পায় না, প্রতিরোধ-তো অনেক দুরের ব্যাপার!ধর্ষনের ভয়ে বহু নারীরাই দেশ ছেড়ে পালায়। নারীরা দেশ ছেড়ে পালানোর কারনে ঐ রাষ্ট্রে কোন পরিবার থাকে না। বলা হয় যে, পরিবার ছাড়া পুরুষ, রাখাল ছাড়া ভেড়ার ন্যায়। তখন বহু পুরুষই সমকামীতায় জড়িয়ে পড়ে। আবার ধর্ষন কারী সৈন্যরা দীর্ঘ দিন যুদ্ধে থাকায় তাদের যৌন চাহিদা পুরন করার কোন বৈধ সিস্টেম থাকে না। তখন এরা ধর্ষন করে বেড়ায়। প্রতিপক্ষের নারীদের ধর্ষণ করার দ্বারা অনেক নারীই গর্ভবতী হয়ে যায়। তখন ব্যাপারটা এমন হয়ে যায় যে, প্রতিপক্ষের সন্তান একজন ভিকটিম নারী অবৈধ ভাবে গর্ভধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। যা প্রতিপক্ষের নৈতিক শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

অধিক ধর্ষনকারী সেনাবাহিনীর মাঝেও ব্যাপকভাবে নৈতিকতা বোধ কমে যায়। ফলে তারা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে না, যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করে। সমস্ত দেশের সেনাবাহিনীতেই কিছু সদস্য থাকে যারা সর্বদাই ধর্ষণ করার বিরুদ্ধে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিজেদের সেনাবাহিনীর মাঝেই বিভক্তি দেখা দেয়। আবার অনেক সৈন্য ধর্ষণ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের নারীর আত্মচিৎকার দেখে অথবা চেহারা দেখে মায়া লাগার কারনে ধর্ষণ না করেই ফিরে আসে। অনেকে আবার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ার কারনেও প্রতিপক্ষের নারীদেরকে ধর্ষণ না করেই ফিরে আসে। এই সমস্ত সৈন্যরা আস্তে আস্তে একটি নৈতিক প্রশ্নের দিকে যায় এবং যুদ্ধের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। ব্যাপক ধর্ষণকারী সৈন্যরাও অধিক ধর্ষণ করার কারনে শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবেও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরা তখন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচির শুধু উপায় খুঁজতে থাকে। যদি এই সব সৈন্যরা তাদের ভঙ্গুর অবস্থা নিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তাহলে এরা কাছে একেবারে কচুকাটা হতে থাকে। ফলে আগ্রাসী রাষ্ট্রটির বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তেমন কোন লাভই হয় না।

এই ধরনের ব্যাপক ভাবে সিভিলিয়ান হত্যা ও ধর্ষনের দ্বারা কখনোই একটি রাষ্ট্র ঐ ভুমির দখল ধরে রাখতে পারে না। শত্রু কর্তৃক বেসামরিক জনগণ হত্যা ও নির্যাতনের দ্বারা প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীরই সুবিধা হয়। এতে প্রতিপক্ষের বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা বাড়ে। এবং যারা সিভিলিয়ান থেকে আসে তারা খুব প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। তারা নিজেদের জীবন নিয়ে কখনো ভাবে না। প্রতিশোধ নেওয়াই তাদের মুল উদ্দেশ্য থাকে।

প্রতিপক্ষের ধর্ষিত অনেক বুদ্ধিমান নারীরাই ধর্ষণ কারী দুই একজন সৈন্যর মন জয় করে নেয়, তারা ধর্ষণে বাধা দেয় না বরং ব্যাপরটা উপভোগ করে। এরপর ঐ সব নারীরা ঐ সৈন্যদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করে। আস্তে আস্তে ঐ সব সৈন্যদের থেকে বহু ধরনের তথ্য বের করে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পুরুষ যখন মেলামেশায় লিপ্ত হয় তখন তার মস্তিষ্ক ঠিক থাকে না। মেলামেশাকারী ঐ নারী তখন যা জানতে চায় তাই সে বলে দেয় কিংবা কোন কিছুর আবদার করলেও ঐ সময়টাতে সম্ভব হলে পুরন করে অথবা পুরন করার অঙ্গীকার করে। আর এই সময়টাই ঐ সব নারীরা কাজে লাগায়।

অনেক দেশ যুদ্ধের সময় ভাড়া করা পতিতা বা সেনাবাহিনীতে কর্মরত সুন্দরী বুদ্ধিমান নারীদেরকে এমন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেয় যাতে করে শত্রুর সৈন্যরা

তাদেরকে ধর্ষণ করতে আসে। আর এই সুযোগে ঐ সব নারীরা সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ লোকজনকে টার্গেট করে তাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। আস্তে আস্তে তাদের মাঝে নিয়মিত মেলামেশা হয় এবং একটি সু-সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। এরপরই শুরু হয় তথ্য বের করে গোয়েন্দাগিরি করার কাজ।

এই ধরনের কাজটি করেছিলো ইরান ইরাক-ইরানে যুদ্ধের সময়। ইরান এই ধরনের বহু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদেরকে পাঠিয়েছিলো ইরাকের বহু উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের কাছে। এই সব নারীদের কমন একটি চরিত্র হয়, নিজেদেরকে অসহায় হিসেবে তুলে ধরে আশ্রয় চাওয়া। টার্গেটকৃত পুরুষের মন গলাইতে পারলেই কাজ শুরু হয়ে যায়। অসহায় নারী সুন্দরি হওয়ায় ঐ সব কর্মকর্তারাও সুযোগ নিতে চায়। ঐ সেনা কর্মকর্তার এই ধরনের সুযোগ নিতে চাওয়ার অপেক্ষায় থাকে ঐ নারী নিজেও।

কখনো কখনো আবার ঐ সব নারীদের দল ত্যাগের ঘটনাও ঘটে। যদি ঐ সব কর্মকর্তারা সতর্ক হয় এবং বিষয়টা বুঝে ফেলে। তাহলে ঐ সব কর্মকর্তারা উল্টা ঐ নারীকেই ফাঁদে ফেলে দেয়। প্রচুর ভুল তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যদেরকে মার খাওয়ায় এবং বিভিন্ন ধরনের ফাঁদে ফেলে। কখনো কখনো আবার নৈতিকতা ও আদর্শ দিয়েও ঐ সমস্ত নারীর মন জয় করে নিয়ে পক্ষ ত্যাগ করায়। অথবা ডাবল এজেন্ট বানায়।

আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দলত্যাগের মতো এই রকমই একটি ঘটনা ঘটেছিলো সিআইএ কর্তৃক সিআইএর এক নারী কর্মকর্তাকে আইএসের এক ইউরোপিয়ান কমান্ডারের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে। ঐ কমান্ডার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। ঐ লোক নিজের আচরন ও আদর্শ দিয়ে ঐ নারীর মন জয় করে পক্ষ ত্যাগ করিয়েছিলো। ফলে সিআইএর ঐ নারী কর্মকর্তা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলো ও ঐ কমান্ডারকে বিয়ে করে তার প্রকৃত স্ত্রী হয়ে যায় এবং সিআইএর সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এর বহু দিন পরে ঐ কমান্ডার নিহত হলে সিআইএ তুরস্কের গোয়েন্দা সংস্থা এমআইটির সাহায্য চায় ঐ নারীকে খুঁজে পেতে এবং গ্রেফতার করতে। পরে এমআইটির মাধ্যমে ঐ নারীকে খুঁজে পায় এবং গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এইসব মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আধুনিক বহু সেনাবাহিনীতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও কমিশন করা হয়। যাতে করে কোন পুরুষ সৈন্য জন্য প্রতিপক্ষের নারীদেরকে ধর্ষণ না করে এবং অর্থের বিনিময়ে তাদের যৌন চাহিদা মিটানোর একটি সুন্দর উপায় তৈরী করা থাকে।

উনত্রিশতম অধ্যায়

(যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভারি গাইডেড অস্ত্রের ব্যাবহার সম্পর্কে)

আমরা বিগত পর্বগুলোতে ছোট অস্ত্র দিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা, এর ধরন সহ যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতির ব্যাপারে মোটামুটি একটা আলোচনা করেছি।

এখন আমরা সম্মুখে যুদ্ধ করার জন্য বড় যুদ্ধাস্ত্রগুলো ও এর কৌশল এর ব্যাপারে আলোচনা করবো। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অস্ত্রের মুল দুইটা ধরন আছে, লাঞ্চার ও বারুদ। একটি লাঞ্চার দিয়ে যুদ্ধ করতে চাইলে হাজারো বারুদের প্রয়োজন পড়ে। একটি লাঞ্চার হামলায় ধ্বংস না হলে বহু দিন এটা দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে। একবার ফায়ার করার পরে নতুন কোন লাঞ্চারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একটা বারুদ শত্রুর হামলায়ও ধ্বংস হয়ে যায় আবার নিজে যখন শত্রুর উপর হামলা করে তখনও ধ্বংস হয়ে যায়। এটাকে দ্বিতীয় বার ব্যাবহার করার কোন সুযোগ নাই। একটি গোলাবারুদের আল্টিমেট গোল থাকে ধ্বংস হওয়া, হয়তো সেটা শত্রুকে ধ্বংস করা সহকারে অথবা শত্রুকে ধ্বংস করা ছাড়াই!যেকোন অস্ত্রের লাঞ্চার মুলত যুদ্ধে গোলাবারুদ ফায়ার করার সহায়ক হিসেবে থাকে। যুদ্ধে মুল ধ্বংসের কাজটা গোলাবারুদই করে। এই কারনেই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গোলাবারুদ এর প্রয়োজন পড়ে।

এই গোলাবারুদ আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে গাইডেড ও আন গাইডেড হিসেবে। আন-গাইডেড গোলাবারুদের উৎপাদন খরচ কম ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে সহজ হলেও বড় অস্ত্রের আন-গাইডেড গোলাবারুদ নির্দিষ্ট টার্গেটে খুব কমই আঘাত হানতে পারে। দেখা যায় যে, আন-গাইডেড গোলাবারুদ ১০০ টি ফায়ার করার পরেও নির্দিষ্ট টার্গেটটি ধ্বংস হয়নি। বরং আশেপাশের এমন সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস করতে চায়নি হামলাকারীরা!আবার এত গুলো আন-গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীর খরচও একটি গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীর খরচের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ

এত ব্যায়ের পরেও মুল লক্ষ্য বস্তুই ধ্বংস হয়নি। আন-গাইডেড অস্ত্রের লাঞ্চার ও আন গাইডেড গোলাবারুদ তৈরী করা সহজ এবং খরচ কম হলেও নির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত হানার ক্ষেত্রে গাইডেড অস্ত্রের লাঞ্চার ও গাইডেড গোলাবারুদের কোন বিকল্প নেই। নির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত না হানতে পারলে দেখা যায় যে, যুদ্ধের খরচ অনেক বেড়ে যায়। কোন টার্গেট ধ্বংস করতে আন-গাইডেড অস্ত্র ব্যাবহার করলে গাইডেড অস্ত্রের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে একটি গাইডেড গোলাবারুদ হলেই কাজ হয়ে যেত সেখানে দশটি আন-গাইডেড গোলাবারুদের প্রয়োজন পড়ে।

একটি গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীর খরচ যদি ৫০ হাজার ডলার হয়ে থাকে সেখানে একই ধরনের একটি আন-গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীর খরচ হবে ১০ হাজার ডলার। কিন্তু দশটি আন গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীতে খরচ হবে ১ লক্ষ ডলার, এটা একটি গাইডেড গোলাবারুদ তৈরীর খরচের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তখন আন-গাইডেড গোলাবারুদ ব্যাবহারের খরচ গাইডেড গোলাবারুদের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

একটি রাষ্ট্র যখন কোন ভূমি দখল করার জন্য ঐ ভূমির সবকিছু ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দেয় তখন তার জন্য এটা বিশাল লসের ব্যাপার হয়। ভূমির সমস্ত স্থাপনা ধ্বংস করার দ্বারা দখলদারদের জন্য দখলকৃত ভূমিতে কোন সম্পদই আর অবশিষ্ট থাকে না। দখলকৃত ভূমিতে এমন কোন লোকও আর জীবিত থাকে না যারা তাকে ট্যাক্স দিবে। একটি দেশের মুল শক্তি মুল আয় হচ্ছে জনগণ। কোন দেশ যদি শুধু ভূমির জন্য ব্যাপক ধ্বংস করে তাহলেও তারা এই দখলকৃত ভূমিগুলোকে খুব বেশি দিন নিজেদের দখলে রাখতে পারে না। একটি জাতি, ভূমি ও তার সমস্ত সম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য ঐ জাতির নেতাদেরকে হত্যা করাই যথেষ্ট!মাথা ছাড়া দেহের যেমন কোন শক্তি থাকে না তেমনি নেতা ছাড়া জাতির কোন কিছু করারও ক্ষমতা থাকে না।

বলা হয়, নেতা ছাড়া একটি জাতি রাখাল ছাড়া একটি ভেড়ার পালের মতো। রাখাল ছাড়া একটি ভেড়ার পাল দখল করা কোন ব্যাপারই না!একটি দেশের সামরিক বাহিনী হচ্ছে সেই রাখাল যাকে হত্যা করলে ভেড়ার পালের ন্যায় পুরো দেশ দখল করা যায়। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কমান্ডাররা হচ্ছে সেই সিংহের ন্যায় যা একটি গাধার পালকেও নেতৃত্ব দিয়ে বিজয়ী করে। বলা হয় যে, গাধার নেতৃত্বে একটি সিংহের পালও পরাজিত হয় আর সিংহের নেতৃত্বে একটি গাধার পালও বিজয়ী হয়।

এই সব সামরিক বাহিনীর কমান্ডারদেরকে হত্যা করে পুরো সামরিক বাহিনীকে একটি গাধার পালে রূপান্তরিত করা যায়। আবার একটি দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে রাখালের ভূমিকা পালনকারী সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারলে ভেড়ার পালের অনুরূপ সম্পূর্ণ দেশটি দখল করা যায়।

গাইডেড ওয়েপনস দিয়ে একটি দেশের বা কোন সংগঠন অথবা কোন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে থাকা এই সব সিংহ ও রাখালদেরকে ধ্বংস করা হয়। এটা করার দ্বারা যুদ্ধে যেমন খরচ কম হয় তেমনি অল্প সময়েই বিজয় লাভ করা যায়। আবার অক্ষাত গনিমত পাওয়ার ব্যাপারটা-তো আছেই!এই বিষয়টি সবচেয়ে ভালো বুঝেছে তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র। তুরস্ক সিরিয়া, লিবিয়া ও আজারবাইজানের নগরানো কারাবাখ যুদ্ধ, ইরাকে পিকেকে সন্ত্রাসী সংগঠনকে দমন করা সহ সমস্ত জায়গাতেই একদম পিন পয়েন্টে সামরিক টার্গেটে আঘাত হেনেছে। কোন সিভিলিয়ান টার্গেটে হামলা করেনি। নগরানো কারাবাখ যুদ্ধের সময় তুরস্কের তৈরী TB-2 ড্রোন দিয়ে আর্মেনিয়ার ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টারের গাড়িতে হামলার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলো আজারবাইজান। সেখানে দেখা গেছে যে, আজারবাইজান গাড়িতে এমন ভাবে হামলা করেছে যাতে শুধু ঐ ডিফেন্স মিনিস্টারই নিহত হয়েছে। আশেপাশের কোন কিছু-তো ধ্বংস হয়ইনি বরং গাড়িটিও অনেকটাই অক্ষাত অবস্থায় ছিলো। এই ধরনের শুধু নির্দিষ্ট ভাবে সামরিক টার্গেটে আঘাত হানার দ্বারা অল্প সময়েই স্বল্প খরচেই যুদ্ধে যেমন বিজয় নিয়ে আসা যায় তেমনি সিভিলিয়ানদের সমর্থনও পাওয়া যায়। সিভিলিয়ানরা ব্যাপক কোন বিদ্রোহ করে না।

বর্তমান বিশ্বে তুরস্কেরই যুদ্ধে সবচেয়ে কম সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটি রয়েছে। একই ভাবে যুক্তরাষ্ট্র শুধু নেতৃত্বদানকারী ব্যাক্তিদেরকে হত্যা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে হত্যা করার জন্য AGM-114 Helfire মিসাইলের ব্লেড ভার্সন তৈরী করেছে। যেই মিসাইলগুলোতে কোন ধরনের বিস্ফোরক থাকে না। বিস্ফোরকের বদলে মিসাইলের সাথে সংযুক্ত খুব ধারালো ব্লেড থাকে। যার আঘাতে নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে হত্যা করে ফেলা যায়। যুক্তরাষ্ট্র এটি সিরিয়ায় অনেকবার ব্যাবহার করেছে একিউ এর কমান্ডারদের উপর। যেখানে দেখা গেছে যেই সব গাড়িতে ঐ কমান্ডাররা ছিলো সেই সব গাড়িতে ব্লেড হেলফায়ার আঘাত করার পরে শুধু সেই কমান্ডারই নিহত হয়েছে এবং মিসাইলটি গাড়ির কাচ ভেঙে ঢুকে গেছে। গাড়িতে থাকা ড্রাইভার সহ অন্যান্যরা সম্পূর্ণ অক্ষাত রয়েছে। গাড়িটির শুধু কাচ ভেঙে যাওয়া ছাড়া তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি।

এই ধরনের নির্দিষ্ট টার্গেটে পিন পয়েন্টে হামলার কারনেই বর্তমানে সিরিয়ায় একিউ অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর শুধু মাথা কেটে ফেলার কাজটি করছে আর এতেই তারা তাদের লক্ষ্য পূর্ণরুপে হাসিল করতে পারছে। এই কাজগুলো শুধুমাত্র গাইডেড গোলাবারুদ দিয়েই সম্ভব, আন-গাইডেড গোলাবারুদ দিয়ে নয়!আন গাইডেড গোলাবারুদ শুধু মাত্র ব্যাপক ধ্বংস করে, আন গাইডেড গোলাবারুদকে ব্যাপক ধ্বংস করার জন্যই ব্যাবহার করা হয়।

ত্রিশতম অধ্যায়

(যুদ্ধের ভারি অস্ত্রের গোলাবারুদ সম্পর্কে)

গোলাবারুদের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ হচ্ছে, ল্যান্ড ফোর্সের ব্যাবহৃত সার্ফেস টু সার্ফেস ও সার্ফেস টু এয়ার গোলাবারুদ। এরপরে এয়ারফোর্সের ব্যাবহৃত এয়ার টু সার্ফেস ও এয়ার টু এয়ার গোলাবারুদ। তারপরে নেভালফোর্সের সার্ফেস টু সার্ফেস ও সার্ফেস টু এয়ার গোলাবারুদ। গোলাবারুদের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লাঞ্চার টাইপের বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের সেন্সর। একটি যুদ্ধ বিমান ভালো সেন্সর আর ওয়েপনসের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক বডি কোন বিষয় না। একটি যুদ্ধ বিমানকে শক্তিশালী ইঞ্জিন ও ভালো মানের AESA রাডার সহ অন্যান্য সেন্সর দিয়ে এবং ভালো মানের লং রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার বিভিআর মিসাইল ও ক্রুজ মিসাইল দিয়ে সজ্জিত করলেই সেই যুদ্ধ বিমানটি আধুনিক হয়ে যায়। এই কারনেই আমরা দেখতে পাই পাকিস্তান পুরোনো মিরেজ যুদ্ধ বিমানগুলো কিনে নিয়ে নিজেদের চাহিদা মতো সেন্সর ও ওয়েপনস ইনস্টল করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের F-16 যুদ্ধ বিমানের পুরোনো বডিতে বারবার আপগ্রেড করে শক্তিশালী ইঞ্জিন, ভালো মানের সেন্সর ও ওয়েপনস ইনস্টল করার দ্বারা বিশ্ব সেরা যুদ্ধ বিমান হয়ে উঠেছে।

নতুন নতুন মডেলের এয়ার ফ্রেম তৈরী করে কোন লাভ নেই, যদি ভিতরের, ইঞ্জিন, সেন্সর ও ওয়েপনস আধুনিক না হয়। নিজস্ব ও আধুনিক সেন্সর না হলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হওয়া খুবই কঠিন। তার উপরে যদি সেন্সর সাপ্লাইকারী রাষ্ট্রটি শত্রুর ভালো বন্ধু হয় তাহলে তো কথাই নেই!এই ক্ষেত্রে শত্রুর কাছে যুদ্ধ বিমানের ও অন্যান্য অস্ত্রের সমস্ত প্রযুক্তির ব্যাপারে তথ্য চলে যাবে ফলে ব্যাপক মার খেতে হবে। সেন্সরের ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এয়ার ফোর্সের ক্ষেত্রে এরপরে নেভাল ফোর্সের ক্ষেত্রে এরপর ল্যান্ড ফোর্সের ক্ষেত্রে!ল্যান্ড ফোর্সের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এয়ার ডিফেন্সের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধাস্ত্রের সব ধরনের লাঞ্চারের মাঝে বিশেষ করে ল্যান্ড ফোর্সের লাঞ্চার গুলো বেশি প্রয়োজনীয়। ল্যান্ড ফোর্সের এই ধরনের ভারি ওয়েপনসগুলো হচ্ছে,

হুইটজার বা MLRS সিস্টেমের গাইডেড ও আন গাইডেড আর্টিলারি। আর্টিলারি সিস্টেম হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো দুর থেকে ফায়ার করা মতো শক্তিশালী অস্ত্র। সময়ের সাথে এই আর্টিলারির অনেক আধুনিকায়ন হয়েছে। একটা সময়ে পাথরের গোলা ব্যাবহার করা হতো আর্টিলারিতে এখন বিস্ফোরকবাহী গাইডেড বা আন গাইডেড গোলাবারুদ ব্যাবহার করা হয়।

আর্টিলারি সিস্টেমের কারনে স্বল্প দুরত্বে এয়ারক্রাফট দিয়ে গ্রাউন্ডে এয়ারস্ট্রাইক করার প্রয়োজন অনেকটাই ফুরিয়ে গেছে। এয়ারস্ট্রাইক করার জন্য এয়ারক্রাফট ক্রয় করা বা তৈরী করা এবং মেইন্টেন্স করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার ও খরচ সাপেক্ষ বিষয়। এয়ারক্রাফট উড্ডয়নের যথেষ্ট বড় রানওয়ে লাগে এবং শত্রুর এয়ারডিফেন্স দিয়ে এয়ারক্রাফট শুট ডাউন হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা থাকে। একটি এয়ারক্রাফট শুট ডাউন হওয়া মানেই মিলিয়ন মিলিয়ন ইউএস ডলার লস। ম্যানপ্যাড দিয়েও এয়ারক্রাফট শুট ডাউন করা যাবে এবং এয়ারক্রাফট দিয়ে এয়ারস্ট্রাইক করার সময় প্রতিপক্ষ শত্রুর এয়ারক্রাফটকে দেখতে পাবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিতে পারবে। এই সব সমস্যার কোনটাই নেই আর্টিলারি হামলার ক্ষেত্রে। একটি আর্টিলারি প্রতিপক্ষের সাধারন দৃষ্টি সীমার বাহিরে থেকেই হামলা করতে পারে। হামলা চালাতে গিয়ে শত্রুর এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে শুট ডাউন হওয়ার মতো কোন ধরনের ঝুঁকি নেই। কোন ধরনের ঝামেলার কারনে এয়ারক্রাফটের মতো ক্রাশ করারও ঝুঁকি নেই। একটি ভালো মানের এয়ারক্রাফটের দামে গড়ে ১০০টি ট্রাক বা ট্যাংকের মতো চেইন বেসড অথবা হুইল বেসড অত্যাধুনিক পোর্টেবল হুইটজার বা MLRS সিস্টেমের আর্টিলারি পাওয়া যাবে।

গাইডেড আর্টিলারি দিয়ে এয়ার ডিফেন্স সহ যেকোনো কিছু ধ্বংস করাটা বর্তমানে অনেক সহজ ব্যাপার। একটি রিক্যোনাইসেন্স ড্রোন বা কমব্যাট ড্রোনের সাথে কো-অর্ডিনেট করে গাইডেড আর্টিলারি দিয়ে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম সহ যেকোনো কিছু ধ্বংস করা যায়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সময় ইউক্রেন রাশিয়ার এবং রাশিয়া ইউক্রেনের অনেকগুলো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সহ বহু ট্যাংক, আর্টিলারি, আর্মাড ভেহিকল ও সৈন্যদেরকে এইভাবে ড্রোনের সাথে গাইডেড আর্টিলারি কো-অর্ডিনেট করে ধ্বংস করেছে।

লো-অল্টিটিউডে উড়তে থাকা ছোট ছোট ড্রোনগুলোকে যেকোনো এয়ার ডিফেন্স দিয়ে ডিটেক্ট করে ধ্বংস করাটা কঠিন। গাইডেড আর্টিলারির মাঝে MLRS সিস্টেম আর্টিলারি কিছুটা এয়ারডিফেন্স দিয়ে ইন্টারসেপ্ট করা গেলেও হুইটজার সিস্টেমের গাইডেড আর্টিলারি এয়ারডিফেন্স দিয়ে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব!এই কারনেই এয়ারডিফেন্সকে ড্রোন দিয়ে লক করে গাইডেড আর্টিলারি ফায়ার করে ধ্বংস করাটা অনেক সহজ। যেখানে খোদ এয়ারডিফেন্সই এইভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায় সেখানে অন্য যেকোনো টার্গেট এই ভাবে ধ্বংস করাটা-তো কোন ব্যাপারই না। একটি কমব্যাট ড্রোন নির্দিষ্ট পরিমাণের মিসাইল বহন করতে পারে। কমব্যাট ড্রোনের মিসাইল শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি নতুন কোন টার্গেট খুব দ্রুত ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে অথবা রিক্যোনাইসেন্স ড্রোন দিয়ে কোন টার্গেট ডিটেক্ট করার পর তৎক্ষনাত ধ্বংস করার জন্য ড্রোনের সাথে কো-অর্ডিনেট করে গাইডেড আর্টিলারি ফায়ার করার কোন বিকল্প নেই।

যেকোনো ধরনের আর্টিলারির হামলা ঠেকানোর দুইটা উপায় আছে। একটা হচ্ছে ওয়েপনস লোকেটিং রাডার দিয়ে আর্টিলারি ফায়ার করার জায়গাটি খুঁজে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে আর্টিলারির অবস্থান খুঁজে বের করে পাল্টা হামলা করে আর্টিলারি ধ্বংস করে দেওয়া। আরেকটি হচ্ছে মিসাইল বেসড বা গান বেসড C-RAM(কাউন্টার-রকেট মর্টার আর্টিলারি) সিস্টেম দিয়ে ধেয়ে আসা আর্টিলারির গোলগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া। ইসরায়েলের আয়রন ডোম হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সেরা মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম। এই ধরনের C-RAM সিস্টেমগুলোর রেঞ্জ ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং হাই একুরেসির হয়। এগুলো দিয়ে নির্দিষ্ট রেঞ্জের মাঝে যেকোনো ধরনের এয়ারক্রাফট ও ক্রুজ মিসাইল ও ক্ষেত্র বিশেষ শট রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলও ইন্টারসেপ্ট করা যায়। এগুলো দিয়ে ইন্টারসেপ্ট প্রতি খরচ এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের চেয়ে কম এবং গান বেসড C-RAM সিস্টেমের চেয়ে বেশি।

গান বেসড C-RAM সিস্টেমের মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাউন্ড বেসড বা শিপ বেসড Phalanx C-RAM হচ্ছে সেরা C-RAM সিস্টেম। এই ধরনের C-RAM সিস্টেমগুলোর রেঞ্জ সাধারনত ৪ কিলোমিটারের বেশি হয় না। যেকোনো স্বস্তার মর্টার আর্টিলারি বা রকেট ঠেকানোর জন্য এগুলো ভালো সিস্টেম। মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম দিয়ে ঠেকানো হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রতিরক্ষার খরচ কিংবা হামলাকারীর হামলার খরচের চেয়ে ইন্টারসেপ্টের খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়। এই সব ইন্টারসেপ্টের ক্ষেত্রে গান বেসড C-RAM সিস্টেম ভালো। আবার প্রতিপক্ষের স্বস্তার

কোন ড্রোন ধ্বংস করার জন্যও এগুলো উত্তম সিস্টেম। তবে একই সময়ে ফায়ার করা একাধিক মর্টার আর্টিলারির বা রকেট হামলার সবগুলো ঠেকানো যায় না এই ধরনের গান বেসড C-RAM সিস্টেম দিয়ে। এই ক্ষেত্রে মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেমের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেমের একুরেসি ও রেঞ্জ, অল্টিটিউড গান বেসড C-RAM সিস্টেমের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

একত্রিশতম অধ্যায়

(এয়ারডিফেন্সের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে)

একটা রাষ্ট্র শত্রুর হাত থেকে কতটুকু নিরাপদ থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার এয়ারডিফেন্স সিস্টেম কতটা শক্তিশালী সেটার উপরে। প্রাচীন কালে মানুষ নিজেদের ডিফেন্সের জন্য বিশাল দেয়ালের দুর্গ নির্মান করতো। বর্তমানে যুগের সেই দেয়াল হচ্ছে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম। একটি রাষ্ট্রের জন্য এন্টি এয়ারক্রাফট এয়ার টু এয়ার এবং সার্ফেস টু এয়ার মিসাইলের মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এয়ারডিফেন্স মিসাইল(সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল) তৈরী করা। কেননা একটি এয়ার টু এয়ার মিসাইলের রেঞ্জ ও একুরেসি এয়ারডিফেন্স মিসাইলের চেয়ে অনেক কম হয়। আবার এয়ার টু এয়ার মিসাইল লাঞ্চ করার জন্য এয়ারক্রাফট এর প্রয়োজন পড়বে।

একটা পঞ্চম প্রজন্মের এয়ারক্রাফট ও ভালো মানের একটি লং রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের দাম প্রায় সমান হয়। একটা এয়ারক্রাফট আকাশে উড়ানোর জন্য বিশাল রানওয়ের প্রয়োজন পড়ে। একটি এয়ারক্রাফট সর্বোচ্চ হলে ১২ ঘন্টার মাঝে একবার ১ ঘন্টা আকাশে উড়তে পারে এরপর বিশাল মেইন্টেন্স কস্ট ও মেইন্টেন্সের বিশাল ঝামেলাও আছে। একটা এয়ারক্রাফট দিয়ে শত্রুর আপকামিং কোন মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করা যায় না। এয়ারক্রাফট মেইন্টেন্সে সামান্য ত্রুটি হলেই ক্রাশ করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বা মাঝ আকাশে তেল শেষ হয়ে গেলেই ক্রাশ করবে। একটা এয়ারক্রাফট সার্ভিসে রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। সেই যন্ত্রাংশের সাপ্লাই না থাকলে এয়ারক্রাফট গ্রাউন্ডেড হয়ে থাকবে। যুদ্ধের সময় বেশিরভাগ আক্রমণকারী দেশই মিসাইল হামলা করে এয়ারপোর্টের রানওয়ে ধ্বংস করে দেয়, ফলে ভার্টিক্যাল টেক অফ এন্ড ল্যান্ডিং সিস্টেমের এয়ারক্রাফট ছাড়া কোন এয়ারক্রাফটই আকাশে উড়তে পারে না। এবং এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারে থাকা অবস্থায়ই বেশিরভাগ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়ে যায়।

বিপরীতে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম অপারেটের জন্য কোন রানওয়ের প্রয়োজন পড়ে না। শত্রুর আপকামিং মিসাইল, যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে নিজেও নিরাপদ থাকে অন্যদেরকেও নিরাপদ রাখে। এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের তেমন কোন মেইন্টেন্স কস্ট নেই, পাওয়ার সাপ্লাই জেনারেটর এর জন্য তেল ব্যাতিত। এয়ারক্রাফটের মতো তেমন কোন খুচরা যন্ত্রাংশেরও প্রয়োজন পড়ে না। মেইন্টেন্সে ত্রুটির কারনে বা তেল শেষ হয়ে যাওয়ার কারনে এয়ারক্রাফটের মতো ক্রাশ করে ধ্বংস হওয়ার কোন ঝামেলা নেই। যদি এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের মিসাইলের সংকট থাকে তাহলে শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে যেকোনো বনে জঙ্গলে বা সাধারণ বড় কোন আন্ডার গ্রাউন্ড বাংকারে লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু এয়ারক্রাফট খুচরা যন্ত্রাংশ বা মিসাইলের অভাবে গ্রাউন্ডেড হয়ে পড়লে এয়ারপোর্ট ছাড়া বনে জঙ্গলে বা বড় কোন সাধারণ আন্ডার গ্রাউন্ড বাংকারে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না। তবে এয়ারপোর্টের সাথে সংযুক্ত এয়ারক্রাফট রাখার উপযোগী করে তৈরী করা বাংকারে রাখা যায়।

এখন পর্যন্ত বিশ্বে এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে সর্বোচ্চ ২৭ কিলোমিটার দুর থেকে এয়ার টু এয়ার মিসাইল দিয়ে শত্রুর এয়ারক্রাফট ধ্বংস করার রেকর্ড আছে। এই একমাত্র রেকর্ডটি গড়েছিলো ২০২০ সালে তুরস্ক F-16 যুদ্ধবিমানের AIM-120 এয়ার টু এয়ার মিসাইল দিয়ে সিরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার একটি SU-24 যুদ্ধবিমান ধ্বংস করার মাধ্যমে। বিপরীতে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে ৫০+ কিলোমিটার রেঞ্জে শত্রুর আপকামিং মিসাইল বা যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করার অনেক রেকর্ড আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের F-15 যুদ্ধবিমান এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে শত্রুর ১০০+ এয়ারক্রাফট ধ্বংস করলেও এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে একটিও শুটডাউন হয়নি। কিন্তু এই এয়ার সুপিরিয়র যুদ্ধ বিমানটি এয়ারডিফেন্স দ্বারা কয়েকটাই ধ্বংস হয়েছে। একটি এয়ারডিফেন্স একই সাথে একাধিক টার্গেট ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু যুদ্ধবিমানের ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক ব্যাটারি S-400 এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের দাম সর্বোচ্চ হলে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। একই দাম হচ্ছে চারটি রাফাল যুদ্ধ বিমানের। এক ব্যাটারি S-400 এয়ারডিফেন্স সিস্টেমে মোট ৬৪ টা মিসাইল লাঞ্চার টিউব বা ৪টি পুর্নাঙ্গ এয়ারডিফেন্স ইউনিট থাকে। সেই হিসেবে প্রতিটা রাফাল যুদ্ধ বিমানে কমপক্ষে ১৬ টা এয়ার টু এয়ার মিসাইল থাকতে হবে। সাধারণত এই পরিমাণে এয়ার টু এয়ার মিসাইল লোড করা হয় না কোন যুদ্ধ বিমানেই। আবার যদি একটি রাফাল দিয়ে এক ইউনিট S-400 এয়ারডিফেন্স

সিস্টেম ধ্বংস করা হয় এবং এক ইউনিট S-400 এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে একটি রাফাল যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা হয় তাহলেও ব্যাপারটা সমানই হয়ে যাবে।

একটা যুদ্ধবিমান হামলা চালানোর পর পুনরায় মিসাইল লোড করার জন্য গ্রাউন্ডে আসতে হবে। এটা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। কিন্তু এয়ারডিফেন্স সিস্টেমে মিসাইল লোড করতে তেমন কোন ঝামেলাই হয় না। এমনকি নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধ জাহাজ শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা পেতে চাইলে এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের কোন বিকল্প নেই। মুল কথা হচ্ছে, যুদ্ধ বিমান অফেন্সের জন্য ভালো হলেও ডিফেন্সের জন্য এয়ারডিফেন্সের কোন বিকল্প নেই, এবং এয়ারডিফেন্স ও যুদ্ধ বিমানের মাঝে সব দিক তুলনা করলে এয়ারডিফেন্স সিস্টেমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একটা যুদ্ধ বিমান এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে দুই কারনে জড়ায়। একটা হচ্ছে একটি দেশের ভূখণ্ডে শত্রু দেশের কোন যুদ্ধ বিমান প্রবেশ করলে আরেকটি হচ্ছে নিজে শত্রু দেশে হামলা করতে গিয়ে শত্রুর যুদ্ধ বিমানের মুখোমুখি হলে। প্রথমটার ক্ষেত্রে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়েই শত্রুর যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে যুদ্ধ বিমানের এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে না জড়ালেও চলবে। দ্বিতীয়টার(নিজে শত্রু দেশে হামলা করতে গিয়ে শত্রুর যুদ্ধ বিমানের মুখোমুখি হলে) ক্ষেত্রেই এয়ার টু এয়ার মিসাইল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে।

আধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলোর মাঝে পঞ্চম প্রজন্মের F-35 যুদ্ধ বিমানকে সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধ বিমান হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই যুদ্ধ বিমানও সিরিয়া মান্ধাতার আমলের এয়ারডিফেন্স দ্বারা শুট ডাউন হয়েছে। ২০১৭ সালে ১৬ই অক্টোবর ইসরাইলি এয়ারফোর্সের একটি F-35 যুদ্ধ বিমান সিরিয়ায় অপারেশন চালিয়ে ফেরার পথে লেবানন সীমান্তে সোভিয়েত আমলের তৈরি S-200 এয়ারডিফেন্স দ্বারা শুট করে সিরিয়ান এয়ারডিফেন্স ফোর্স!এই সম্পর্কে IDF তার টুইটার একাউন্টে দাবি করে, "ইসরাইলি এয়ারফোর্সের একটি এয়ারক্রাফট লেবাননে রুটিন মাফিক উড়ার সময় সিরিয়া ইসরাইলের এয়ারক্রাফটিকে লক্ষ্য করে এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল নিক্ষেপ করে এবং সেটি আঘাত হানতে ব্যার্থ হয়!"ঐ দিন এই ঘটনার কয়েক ঘন্টা পরই কিছু ইসরাইলের লোকাল মিডিয়া দাবি করে যে, ইসরাইলি এয়ারফোর্সের একটি F-35 ক্রাশ করেছে।

এই ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর IDF তাদের টুইটার একাউন্টে দাবি করে, তাদের একটি F-35 যুদ্ধ বিমানে বার্ড হিট করেছে!এই ঘটনার একদিন পরে ১৭ই অক্টোবর

২০১৭ সালে টাইমস অফ ইসরাইলের এক রিপোর্টে বলা হয়, দুইটি সারস পাখির সাথে ইসরাইলের একটি F 35 এর সংঘর্ষ হয়েছে। এবং তারা IDF এর বরাতে এটাও বলে যে, পাখির আঘাত সত্বেও F35 টি সেন্ট্রাল নেগেভ মরুভূমিতে অবস্থিত Nevatim air base এ নিরাপদে ল্যান্ডিং করেছে। F -35 যুদ্ধ বিমানের নির্মাতা কম্পানি লকহিড মার্টিনের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছে ইসরাইল। এবং এটি খুব দ্রুতই রিপেয়ার করে সার্ভিসে আসবে।

ঐ দিন সিরিয়ায় এয়ারস্ট্রাইক চালানোর ব্যাপারে ইসরাইল অফিসিয়াল কিছু বলেনি। তবে সিরিয়া স্বীকার করেছে, ইসরাইলের পক্ষ থেকে ফায়ারকৃত কয়েকটি মিসাইল দামেস্কের উপকূলে সিরিয়ান আর্মির পজিশনে হিট করেছে। সিরিয়া এটাও বলেছে যে, লেবাননের সীমান্তে Baalbek এরিয়ায় সিরিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করার কারনেই ইসরাইলি এয়ারক্রাফটকে লক্ষ করে সিরিয়া এই এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল ফায়ার করেছে। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, এই বিষয়টি এত বিতর্কিত হওয়া সত্বেও ইসরাইল তাদের F 35 যুদ্ধ বিমানে বার্ড হিট করার পরের কোন ছবি প্রকাশ করেনি।

IDF তার টুইটার একাউন্টে দাবি করে যে, "এই ঘটনার জবাবে ইসরাইল চারটি বোম দিয়ে সিরিয়ার এয়ার ডিফেন্স ধ্বংস করেছে"। ইসরাইলের দাবি অনুযায়ী, ধ্বংসকৃত এয়ার ডিফেন্সটি ছিলো, সেই এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল নিক্ষেপকরী S-200টি। আরো ইন্টারেস্টিং বিষয়, হচ্ছে এই ঘটনার দিন ইসরাইল এর রাজধানী তেল আবিবে উপস্থিত ছিলো রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু। এবং এই ঘটনার পরপরই ইসরাইল রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে এই বিষয়ে যোগাযোগ করে। তারপরে ইসরাইলে অবস্থানকারী রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু এই বিষয়ে ইসরাইলকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেন এই মর্মে যে, পরবর্তীতে কখনোই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না!

এই ঘটনার পর তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, "এটি অগ্রহনযোগ্য!যদি কেউ আমাদেরকে আঘাত করে তাহলে আমরাও তাকে পাল্টা আঘাত করবো!"F-35 যুদ্ধ বিমান সর্ব প্রথম সার্ভিসে আসে ২০১৫ সালে। বিপরীত S-200 সর্ব প্রথম সার্ভিসে আসে ১৯৬৭ সালে। অর্থাৎ S-200 এয়ারডিফেন্স সিস্টেম F-35এর তুলনায় ৪৮ বছর আগে সার্ভিসে এসেছে। ব্যাপারটা এমনও না যে, সিরিয়ার ব্যাবহৃত S-200 এয়ারডিফেন্স সিস্টেম খুব একটা সময়ের সাথে সাথে আপগ্রেড করা হয়েছে!

অনেকেই হয়তো বলতে চাইবেন যে, F-35 হচ্ছে বর্তমানে বিশ্বে সেরা আধুনিক বিমানগুলোর একটি। এর RCS(রাডার ক্রস সেকশন) 0.0015 বর্গ মিটার। আসলেই কি RCS যুদ্ধ বিমান শত্রুর হাতে ডিটেক্ট হওয়ার প্রকৃত মাপকাঠি কিনা!সেটাই এখন অনেক বড় প্রশ্ন!

যুক্তরাষ্ট্রের F-15 যুদ্ধ বিমানের RCS হচ্ছে 25 বর্গ মিটার। অথচ এটি একটি ব্যাটেল প্রুফ যুদ্ধ বিমান। এটি এখন পর্যন্ত এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে ১০৪ টিরও বেশি এয়ারক্রাফট শুট করলেও এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে অন্য কোন এয়ারক্রাফট দ্বারা শুট ডাউন হওয়ার কোন রেকর্ড নাই!অবশ্য এয়ার ডিফেন্স দ্বারা অনেকগুলোই শুট ডাউন হয়েছে। এমনকি F-15 এর লেটেস্ট ভার্সন F-15EX এর দাম F-35 এর লেটেস্ট ভার্সনের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। F-15 যুদ্ধ বিমানটি দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে ইতিহাসের সবচেয়ে লং রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার মিসাইলের পরীক্ষা চালায়। এয়ার টু এয়ার মিসাইলটি ছিলো AIM-120D. অবশ্য এই পরীক্ষার রেঞ্জের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কিছুই প্রকাশ করেনি। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এই পরীক্ষা কিন্তু F-35 দিয়ে করেনি। অথচ উচিত ছিলো এত লং রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার মিসাইল পরীক্ষা F-35 করা। সাধারনত এয়ার টু এয়ার মিসাইলের পরীক্ষা সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান দিয়েই করা হয়।

আরো একটি ইন্টারেস্টিং তথ্য হচ্ছে, কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা তাদের এয়ারফোর্সে সার্ভিসে থাক সমস্ত F-16 কে F-35 দ্বারা রিপ্লেস করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, সেটি ক্যানসেল করেছে। তারা F-16 রিপ্লেস করার জন্য আরেকটি নতুন ধরনের লাইট যুদ্ধ বিমান নির্মানের প্রজেক্ট শুরু করেছে। আরো একটি তথ্য জানিয়ে রাখি, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কর্পসেরই ১৫৪০টি এয়ারক্রাফট বার্ড ও এনিমেল স্ট্রাইকের সম্মুখীন হয়েছে।

অল্টিটিউডের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্যারামিটার আছে।

৬ কিলোমিটারের নিচের অল্টিটিউডে হচ্ছে লো অল্টিটিউড। সাধারণত কোন হেলিকপ্টারই ৬ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি অল্টিটিউডে উড়তে পারে না। কোন ম্যানপ্যাড এয়ারডিফেন্সের অল্টিটিউড এই ৬ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি হয় না। এবং বেশিরভাগ ড্রোন ও যুদ্ধ বিমান গ্রাউন্ডে পর্যবক্ষেণ ও হামলার সময় এই লো অল্টিটিউডে নেমে আসে। ১২ কিলোমিটার হচ্ছে মিডিয়াম অল্টিটিউড। যেই অল্টিটিউডে সাধারণ ভাবে একটি যুদ্ধ বিমান বা ড্রোন আকাশে উড়ে বেড়ায়। ১৮

কিলোমিটার হচ্ছে হাই অল্টিটিউড। সাধারণত কোন যুদ্ধ বিমান বা ড্রোনের ম্যাক্সিমাম অল্টিটিউড সাধারনত ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। যদিও ১৮কিলোমিটার এর চেয়ে বেশি অল্টিটিউডে উড়ার রেকর্ড বহু যুদ্ধ বিমানেরই রয়েছে। ১৮ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি অল্টিটিউড হচ্ছে ভেরি হাই অল্টিটিউড। এই অল্টিটিউডে সাধারণত ব্যালিস্টিক মিসাইল উড়ে এসে টার্গেটে আঘাত হানে। সাধারণত প্রতিটা লং রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের অল্টিটিউড ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এই অল্টিটিউড ও রেঞ্জের উপর নির্ভর করেই এয়ারডিফেন্স সিস্টেমকে শর্ট রেঞ্জ, মিডিয়াম রেঞ্জ ও লং রেঞ্জে ভাগ করা হয়। সাধারণত শর্ট রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের অল্টিটিউড ৬ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ ১৫ কিলোমিটারের নিচে হয়। মিডিয়াম রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের অল্টিটিউড ৬-১২ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ ১৫-৫০ কিলোমিটারে পর্যন্ত হয়ে থাকে। লং রেঞ্জর এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের অল্টিটিউড ১২ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি হয় এবং রেঞ্জ ৫০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি হয়। বর্তমানে সমস্ত আধুনিক এয়ারডিফেন্স মোবাইল সিস্টেমের হয়ে থাকে। বর্তমানে লং রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করার জন্য এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরী করা হয়। যা ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংসের জন্যই বিশেষ ভাবে উপযোগী!এই ধরনের এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেমের মাঝে সবচেয়ে সেরা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী THAAD মোবাইল এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম।

বত্রিশতম অধ্যায়

(গাইডেড গোলাবারুদ নিজস্ব ভাবে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে)

ধরুন, 'ক' নামের একটি দেশের কাছে অনেকগুলো অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান আছে। সেই যুদ্ধ বিমানগুলো এতটাই শক্তিশালী যে, ২০০ কিলোমিটার দুর থেকে শত্রুর যুদ্ধবিমান শনাক্ত করতে পারে। এই 'ক' দেশের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলোতে ৫০ কিলোমিটার রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার মিসাইল আছে। ঐ দেশটি চাইলে সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটার দুর থেকে শত্রুর যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করতে পারবে। আর ঐ 'ক' দেশের শত্রু 'খ' দেশের কাছে মোটামুটি ধরনের কিছু যুদ্ধ বিমান আছে। যেগুলো দিয়ে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দুর থেকে শত্রুর যুদ্ধ বিমান শনাক্ত করা যায়। এবং ঐ 'খ' দেশের যুদ্ধবিমানগুলোতে ৭৫ কিলোমিটার রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার মিসাইল আছে।

এখন 'ক' আর 'খ' দেশের মাঝে যদি এয়ার টু এয়ার কমব্যাট হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় 'খ' দেশ জয়ী হবে। কেননা 'ক' দেশের কাছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান থাকলেও শত্রুকে ধ্বংস করার মতো মিসাইল অত্যাধুনিক না। আবার 'ক' দেশ যুদ্ধ বিমান নিজেরা তৈরি করে কিন্তু এয়ার টু এয়ার মিসাইল আমদানি করে। তবে 'খ' দেশে যুদ্ধ বিমান আমদানি করলেও নিজেরাই এয়ার টু এয়ার মিসাইল তৈরী করে। এখন 'ক' দেশ আর 'খ' দেশ এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে জড়িয়ে পড়লে 'ক' দেশ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে লিপ্ত হতে পারবে কিনা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তার এয়ার টু এয়ার মিসাইল সাপ্লাইকারী দেশের উপর।

আবার ধরুন, কোন দেশের কাছে ১০০ টি এটিজিএমের লাঞ্চার আছে। এবং এন্টি ট্যাংক মিসাইল আছে ১০০০টি। ঐ দেশের এটিজিএমের লাঞ্চারগুলো যদি শত্রুর হামলায় ধ্বংস না হয় এবং ঐ দেশ এই মিসাইলগুলো দিয়ে শত্রুর ১০০০টি ট্যাংক ধ্বংস করে। তবুও দেখা যাবে যে, ঐ দেশের এন্টি ট্যাংক মিসাইলের সংকট শুরু হয়েছে। ঐ দেশটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে কিনা সেই বিষয়টিও

নির্ভর করবে এন্টি ট্যাংক মিসাইলের সাপ্লাই দাতা রাষ্ট্রটির উপর। যদি ঐ দেশটি এই এটিজিএম আমদানি করে থাকে এবং প্রতিটি এন্টি ট্যাংক মিসাইলের দাম ১০ হাজার ডলারও হয় তাহলেও তাদের এই এটিজিএম ক্রয় বাবদ ব্যায় হয়ে যাবে ১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। শত্রুকে ধ্বংস করতেও এই বিপুল পরিমাণ ব্যায় হবে। আর শত্রুর দ্বারা ধ্বংস হলে সেই ব্যায়ের তো কোন হিসাবই নাই।

প্রতিটি অস্ত্র বিক্রেতা দেশই প্রচুর লাভ করে থাকে অস্ত্র বিক্রি করে। একটি অস্ত্র তৈরির খরচের চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুন বেশি দামে সেই অস্ত্র অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে বিক্রি করে। যদি ঐ দেশটি নিজেরাই এন্টি ট্যাংক মিসাইল তৈরী করতো তাহলে এই ব্যায় অনেকটাই কমে যেত। কোন দেশ যদি শুধু ভালো মানের গোলাবারুদ তৈরী করে তাহলে সে যেকোনো যুদ্ধেই জয়ী হতে পারে। এবং তার যুদ্ধের ব্যায়ও অনেক কমে আসবে। একটি অস্ত্র বিক্রেতা রাষ্ট্রের কোন দেশের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় এই গোলাবারুদ বিক্রি করে। কেননা লাঞ্চার তো কেবল শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে ফায়ার করতে গিয়ে বা অন্য কোন কারনে ধ্বংস হয়। দৈনন্দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন লাঞ্চারের প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেই ব্যাপক গোলা বারুদের প্রয়োজন। যেই সব রাষ্ট্র গোলাবারুদ নিজেরাই তৈরী করে না তারা যুদ্ধে সবচেয়ে বেকায়দায় থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পাকিস্তান ভারতের কারগিল যুদ্ধের কথা। ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের সময় ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে লেজার গাইডেড বোমা চেয়েছিলো। কিন্তু কোন দেশই দেয়নি। আবার আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের মাঝে ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের দুইটি ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়ে ছিলো ফরাসি এন্টি শিপ মিসাইল Exocet দিয়ে। কিন্তু ব্রিটেন অর্থের বিনিময়ে ফ্রান্সের কাছে থেকে এই মিসাইলের কোড নাম্বার ও খুটিনাটি তথ্য জেনে নিয়েছিলো। এরপর থেকে আর্জেন্টিনার ব্যাবহৃত Exocet এন্টি শিপ মিসাইল আর টার্গেটে আঘাত হানতে পারেনি। কেননা এগুলো ফায়ার করার পর ব্রিটেন এই মিসাইলের কোড নাম্বার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টার্গেট পরিবর্তন করে দিতো। মুল কথা হচ্ছে, যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গোলাবারুদ। যেই দেশ নিজেরাই এটা তৈরী করবে এবং এটার ভালো মান নিশ্চিত করতে পারবে তারাই যুদ্ধে এগিয়ে থাকবে।

তেত্রিশতম অধ্যায়

(ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইলের প্রকারভেদ সম্পর্কে)

বর্তমানে সবচেয়ে স্ট্রাটেজিক ওয়েপনস হচ্ছে, ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল। যা শত্রুর ভুমিতে কোন সেনাবাহিনী, যুদ্ধ বিমান বা যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো ব্যাতিতই নিজ ভূমিতে বসে শত্রুর উপর হামলা করার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যালিস্টিক মিসাইলের চেয়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে হামলা করে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ক্রুজ মিসাইল বেশি কার্যকর অর্থাৎ ক্রুজ মিসাইলের একুরেসি ব্যালিস্টিক মিসাইলের চেয়ে বেশি। তবে ব্যাপক ধ্বংসের জন্য ব্যালিস্টিক মিসাইলের কোন বিকল্প নেই। রেঞ্জ ভেদে ক্রুজ মিসাইল ও ব্যালিস্টিক মিসাইল কয়েক ধরনের হয়ে থাকে।

ক্রুজ মিসাইলের তিনটা প্রকার ভেদ হয় রেঞ্জের ভিত্তিতে। শর্ট রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ১-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। মিডিয়াম রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ৫০০-১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর লং রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ সাধারণত ১০০০ কিলোমিটারের বেশি হয়ে থাকে। এই ক্রুজ মিসাইলগুলো লাঞ্চিং সিস্টেম ভেদে আবার কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে, গ্রাউন্ড লাঞ্চড, এয়ার লাঞ্চাড, শিপ লাঞ্চড ও সাবমেরিন লাঞ্চড ক্রুজ মিসাইল।

রেঞ্জ ও ওয়্যারহেড সিস্টেমের ভিত্তিতে ব্যালিস্টিক মিসাইলও কয়েক ধরনের হয়ে থাকে।

ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় এমন সব ব্যালিস্টিক মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ১-৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলোর একুরেসি খুবই হাই লেভেলের হয়ে। সচরাচর যুদ্ধেও প্রচুর পরিমাণে ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল

ব্যাবহার করা হয় শত্রু দেশের সামরিক ও বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ধ্বংস করে দিতে।

থ্রেট ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় ৩০০-৩৫০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে। যা শর্ট রেঞ্জ ও মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলের ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত।

SRBM বা শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় যেগুলোর রেঞ্জ সাধারণত ৩০০-১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

MRBM বা মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় এমন সব ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে যেগুলোর রেঞ্জ ১০০০-৩৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

MIRV বা মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেটলি টার্গেট্যাবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল সিস্টেমের ব্যালিস্টিক মিসাইল হচ্ছে ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রযুক্তির মধ্যে সবচেয়ে জটিল প্রযুক্তি। MIRV এর সিস্টেম হচ্ছে একটি ব্যালিস্টিক মিসাইলের মাঝে একাধিক ছোট ছোট ব্যালিস্টিক মিসাইল থাকে। এই মুল ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপন করার পরে টার্গেটে আঘাত হানার পূর্বে নির্দিষ্ট রেঞ্জে গিয়ে আকাশে থাকা অবস্থায় মুল মিসাইলটি থেকে একাধিক ছোট ছোট ব্যালিস্টিক মিসাইল বের হয়ে আসে। এই ধরনের প্রত্যেকটি ছোট ছোট ব্যালিস্টিক মিসাইলের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেট উৎক্ষেপনের আগে সেটিং দেওয়া থাকে। বের হয়ে আসার পর প্রত্যেকটি ছোট ছোট ব্যালিস্টিক মিসাইল তার জন্য নির্ধারিত টার্গেটে আঘাত হানে। এই ধরনের মুল ব্যালিস্টিক মিসাইলক থেকে ছোট ছোট ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো বেরিয়ে আসার পরে পৃথিবীর কোন এয়ারডিফেন্স দিয়ে এগুলোকে ১০০% ইন্টারসেপ্ট করা সম্ভব না। তবে বের হয়ে আসার আগে মুল মিসাইলটি এয়ারডিফেন্স দ্বারা ইন্টারসেপ্ট করলে সবগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

IRBM বা ইন্টার-মিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় এমন সব ব্যালিস্টিক মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ৩৫০০- ৫৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইলের দুইটা স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ আছে। সেগুলো হচ্ছে ৪০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ৫৫০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল!

ICBM বা ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় এমন সব ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে যেগুলোর রেঞ্জ ৫৫০০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি হয়। ICBM এর তিনটা স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ আছে। সেগুলো হচ্ছে, ৭০০০ কিলোমিটার, ১৪০০০ কিলোমিটার এবং ২১০০০ কিলোমিটার। যদিও এখন পর্যন্ত কোন দেশই ২১০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ICBM তৈরী করতে পারেনি। তবে এটা এই কারনে ধরা হয় যে, এই রেঞ্জের ICBM পৃথিবীর যেকোনো পয়েন্ট থেকে যেকোনো পয়েন্টে আঘাত হানতে পারবে। কেননা এটার রেঞ্জ পৃথিবীর অর্ধ পরিধির চেয়ে কিছুটা বেশি। ১৪০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ICBM পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ড থেকে পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ ভূখণ্ডের যেকোনো জায়গায় আঘাত হানতে পারে। আর ৭০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ICBM পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ড থেকে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ ভূখণ্ডে আঘাত হানতে পারে। তবে রাষ্ট্রের অবস্থান কৌশলগত কোন ভালো জায়গায় হলে এই রেঞ্জের ICBM পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডেও আঘাত হানতে পারে।

এই ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো লাঞ্চিং সিস্টেম ভেদে আবার কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে, গ্রাউন্ড লাঞ্চড, এয়ার লাঞ্চড, সাবমেরিন লাঞ্চড ও শিপ লাঞ্চড। তবে শিপ লাঞ্চড সিস্টেমের ব্যালিস্টিক মিসাইলটা বিরল!তেমন একটা প্রচলিত নয়।

চৌত্রিশতম অধ্যায়

(এয়ারফোর্সের অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে)

যুদ্ধ বিমান প্রধানত দুইটা রোলে ব্যাবহার করা হয়। এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে এবং এয়ার টু সার্ফেস রোলে। এর মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করা হয় এয়ার টু সার্ফেস এ্যাটাক রোলে। বিশ্বের এমন বহু দেশ আছে যাদের উল্লেখ করার মতো কোন যুদ্ধবিমান নেই। আবার যাদের ভালো মানের এয়ারফোর্স আছে তাদেরও এয়ারফোর্সের তুলনায় গ্রাউন্ড ফোর্স ও নেভাল ফোর্স অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই এয়ারফোর্সের যুদ্ধ বিমান সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার হয় এয়ার টু সার্ফেস এ্যাটাক রোলে। এয়ার টু সার্ফেস এ্যাটাক রোলেই অনেক যুদ্ধ বিমান এয়ারডিফেন্স দ্বারা ধ্বংস হয়। একটা যুদ্ধ বিমানের দাম অনেক হওয়া সত্বেও একটা যুদ্ধবিমান পার্বত্য ও ঘন বন-অঞ্চলে তেমন একটা ভালো পারফর্মেন্স করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এ্যাটাক হেলিকপ্টার এর প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গ্রাউন্ড এ্যাটাকের জন্য এবং ট্যাংক বহর ধ্বংসে হেলিকপ্টার এর কোন বিকল্প নেই।

হেলিকপ্টার স্থিতিশীল থেকে যেকোনো টার্গেটকে ধ্বংস করতে পারে এবং উড্ডয়নের জন্য কোন রানওয়ের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যুদ্ধ বিমান হেলিকপ্টার এর মতো স্থিতিশীলও থাকতে পারে না, আবার উড্ডয়নের জন্য বিশাল রানওয়েরও প্রয়োজন পড়ে। হেলিকপ্টার লো-অল্টিটিউডে উড়া ও কম গতি সম্পন্ন হওয়ার কারনে শত্রুর হাতে সহজেই ধ্বংস হয়। একটি যুদ্ধ বিমান বা হেলিকপ্টার ক্রাশ করে ধ্বংস হলে বা শত্রুর হামলায় শুটডাউন হলে বিশাল অর্থের লস হয়। আবার নিজের ভুমিতে যুদ্ধ বিমান ক্রাশ করলে পাইলট হয়তো নিহত হয় কিংবা ইজেক্ট করে বেঁচে যায়। শত্রুর ভুমিতে যুদ্ধ বিমান ক্রাশ করলে বা শুটডাউন হলে পাইলট হয়তো মারা যাবে অথবা শত্রুর কাছে বন্দি হয়ে যাবে।

শত্রুর হাত থেকে একজন বন্দি পাইলটকে মুক্ত করতে হলে একটি দেশকে বহু অর্থ খরচ করতে হবে কিংবা শত্রুর দেওয়া বিভিন্ন শর্তে রাজি হতে হবে। আবার যদি পাইলট মারা যায় তবে ঐ রাষ্ট্রের বিশাল লস হয়। একজন ব্যাক্তিকে দক্ষ পাইলট হিসেবে গড়ে তুলতে একটি রাষ্ট্রকে বিশাল অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যায় করতে হয়। ঠিক একই ভাবে ট্যাংক, আর্মাড ভেহিকল এর অপারেটররাও এবং যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিনের ক্রুরাও শত্রুর হামলায় নিহত হলে বা শত্রুর কাছে বন্দি হলে রাষ্ট্রের এই ধরনের বিশাল লস হয়। এয়ার ফোর্সের এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, আনম্যান্ড এরিয়েল ভেহিকল UAV সিস্টেম। আর গ্রাউন্ড ফোর্সের ক্ষেত্রে আনম্যান্ড গ্রাউন্ড কমব্যাট ভেহিকল ও নেভির ক্ষেত্রে আনম্যান্ড আর্মাড বোট।

যুদ্ধ ছাড়াই যুদ্ধ বিমান ক্রাশ করার ঘটনার দিক থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। সেই ইন্ডিয়ার কিছু ঐতিহাসিক সময়ে যুদ্ধ বিমান ক্রাশের কিছু ঘটনা নিচে উল্লেখ করছি,

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭সালে ইন্ডিয়া যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটি Hawker tempest-II লাহরে ক্রাশ করে। যার প্যাটেন্ট নাম্বার ছিলো, PR565। অনেক খোজাখুজি করেও ঐ ক্রাশকৃত বিমানে থাকা পাইলটের নাম জানা যায়নি। ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১২দিনের মাথায় ২৭শে আগস্ট ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ইন্ডিয়ার ইতিহাসে, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স সর্ব প্রথম যুদ্ধ বিমান ক্রাশ করার মত সৌভাগ্য অর্জন করে!বিমানটি ছিলো Hawker Tempest-II, এর পাইলট ছিলেন ক্রিত ভূষন শর্মা। এবং পরের দিন ২৮শে আগস্ট ১৯৪৭সালে আরো একটি Hawker Tempest-II ক্রাশ করে। এর পাইলট ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার মোহন দেব শুরি।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটি Folland Gnat ফাইটার পাকিস্তানে ঢুকে পড়ে। কাউন্টারে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের দুইটি Lockheed F-104 Starfighter পাঠালে ভয়ের চোটে উক্ত বিমানটিতে থাকা ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের পাইলট Brij pal singh পাকিস্তান এয়ারফোর্সের Pasrur এয়ারস্ট্রিপে জরুরি অবতরণ করে।

২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের তারিখে ইন্ডিয়ার একটি MIG-21 শুটডাউন করে পাকিস্তান এয়ারফোর্স। পাকিস্তানের ভিতরেই শুটডাউন হওয়ার কারনে পাইলট ইজেক্ট করে বেঁচে গেলেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। সেই পাইলটের

নাম ছিলো অভিন্দন বর্ধমান। সেই পাইলটকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দী করার পরে বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে দিয়েছিলো তার মাঝে চা ও ছিলো। সেই চায়ের প্রশংসা করেছিলো অভিন্দন বর্ধমান। সে থেকেই ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের সীমান্ত কোন ঝামেলা হলেই টি ইজ ফ্যান্টাস্টিক এবং "অভিন্দন বর্ধমান ওয়ান্টস টু ইউর লোকেশন" বলে ইন্ডিয়াকে ট্রল করার রীতিটি চালু হয়!

একটি আর্মাড আনম্যান্ড এরিয়েল ভেহিকল বা UAV উড্ডয়নের জন্য বিশাল কোন রানওয়ের প্রয়োজন পড়ে না। যা অনেকটা হেলিকপ্টার এর মতো সুবিধা দেয় এবং যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের জন্য বিশাল রানওয়ের প্রয়োজনীয়তার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। হেলিকপ্টার এর মতো টার্গেটের প্রতি স্থিতিশীল থাকতে পারে আবার যুদ্ধ বিমানের গতিশীল হতে পারে। বডির স্ট্রাকচারও যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টারের ডিজাইনের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। হেলিকপ্টার এর মতো পার্বত্য ও ঘন বন-অঞ্চলে যেমন হামলা করতে পারে আবার যুদ্ধ বিমানের মতো ব্যাপক বোম্বিংও করতে পারে। এ্যাটাক হেলিকপ্টার এর মতো এন্টি ট্যাংক ওয়ারফেয়ার চালাতে পারে আবার যুদ্ধবিমানের মতো পাওয়ার ফুল যেকোনো কন্সট্রাকশনও ধ্বংস করে দিতে পারে। আধুনিক আনম্যান্ড এয়ারক্রাফট গুলো যুদ্ধ বিমানের মতোই এয়ার টু এয়ার কমব্যাটেও লিপ্ত হতে পারে।

একটি কমব্যাট ড্রোন যুদ্ধবিমান বা হেলিকপ্টার এর চেয়ে দামে অনেক কম হয়ে থাকে এবং এটা অপারেট করার খরচও যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টারের চেয়ে তুলনামুলক অনেক কম হয়ে থাকে। ড্রোন ক্রাশ করলে বা শুটডাউন হলে যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টারের মতো পাইলট নিহত হওয়া বা বন্দি হওয়ার মতো কোন ঝুঁকি নেই। ফলে দক্ষ অপারেটর এর সংকট তৈরি হবে না এবং রাষ্ট্রের বিশাল অর্থ, শ্রম ও সময় লস হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে। একটি যুদ্ধবিমান বা হেলিকপ্টার এর ক্ষেত্রে এটা ধ্বংস হলে পুরোটাই লস হয়। কিন্তু আনম্যান্ড সিস্টেমের ক্ষেত্রে শুধু UAV টাই ধ্বংস হয়। বাকি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম অক্ষাত থাকে। এতে লস হয় খুবই অল্প।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটা TB-2 ড্রোনের দাম ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার আর বাকি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ও গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট, ড্রোন থেকে ফায়ার করার জন্য ওয়েপনস ও অপারেটরদের ট্রেনিং বাবদ খরচ পড়ে আরো ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সব মিলিয়ে ৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ৬টি TB-2 UAV দুইটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন তিনটি গ্রাউন্ড ডাটা টার্মিনাল দুইটি রিমোট ভিডিও টার্মিনাল

ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সহ TB-2 ড্রোনের এক ইউনিট সিস্টেম গঠিত হয়। এই এক ইউনিট TB-2 এর দাম হয়ে থাকে সাধারনত ৩০-৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এক্ষেত্রে একটি TB-2 UAV ধ্বংস হলে লস হবে মাত্র ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। আর বাকী ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে যাবে। নতুন আরেকটা TB-2 ড্রোন ক্রয় করে আগের গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ও গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট এর সাথে সংযুক্ত করে অপারেশন পরিচালনা করা যাবে।

আবার যেকোনো আর্মাড আনম্যান্ড গ্রাউন্ড ভেহিকল, আর্মাড আনম্যান্ড সার্ফেস বোট ধ্বংস হলেও UAV এর মতো একই ব্যাপার ঘটবে। একটি যুদ্ধ বিমান দিয়ে যেকোনো এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করতে হলে বা একটি ট্যাংক অথবা যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে শত্রুর কোন কিছুতে হামলা করতে হলে বহুবার ভাবতে হবে। কেননা সেখানে শত্রুর পাল্টা হামলায় নিজের এয়ারক্রাফট, ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি আছে। সেক্ষেত্রে এর পাইলট, অপারেটর বা ক্রুদের নিজেদের জীবন মরনের প্রশ্ন থাকে!সেই প্রশ্নের কারনেই তারা শত্রুর উপর যথেষ্ট পরিমাণে হামলা করতে পারেনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় হামলা করেনা। কিন্তু আনম্যান্ড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন ঝুঁকি না থাকায় এর অপারেটররা যেকোনো জায়গায় হামলা করার সাহস করে। সর্বোচ্চ হলে আনম্যান্ড আর্মাড ভেহিকলটি ধ্বংস হবে কিন্তু অপারেটরদের কিছুই হবে না। তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। কমব্যাট ড্রোন দিয়ে এই ধরনের ঝুঁকি নিতে পারার কারণেই দেখা যায় যে, যুদ্ধ বিমানের তুলনায় কমব্যাট ড্রোন দিয়ে এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করা যায় অনেক বেশি পরিমাণে। বর্তমান বিশ্বে অতীতের তুলনায় যুদ্ধে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধ জাহাজের চেয়ে কমব্যাট ড্রোন বেশি ব্যাবহার করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আনম্যান্ড আর্মাড গ্রাউন্ড ভেহিকল ও আনম্যান্ড আর্মাড সার্ফেস বোট এর প্রতিও বহু দেশ আরো বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়বে।

এয়ারফোর্সের যুদ্ধ করার জন্য মুল অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার ও ড্রোন এবং এয়ারফোর্সের এয়ারডিফেন্স ইউনিটের জন্য C-RAM সিস্টেম সহ সব ধরনের এয়ারডিফেন্স সিস্টেম। ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটকে প্রধানত কয়েকটা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। সেগুলো হচ্ছে, বোম্বার, ইন্টারসেপ্টর, ফাইটার, গ্রাউন্ড এটাকার, এন্টি শিপ ও এন্টি সাবমেরিন এয়ারক্রাফট, এয়ার সুপিরিয়রিটি ও মাল্টিরোল এয়ারক্রাফট ইত্যাদি। আবার ফিক্সড উইং ম্যানুয়াল এয়ারক্রাফটের মতো একই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় আনম্যান্ড ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটকেও।

ম্যানুয়াল ও আনম্যান্ড হেলিকপ্টারকেও কয়েকটা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয় থাকে। সেগুলো হচ্ছে, এটাক হেলিকপ্টার, ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার, এন্টি শিপ ও এন্টি সাবমেরিন হেলিকপ্টার এবং মাল্টিরোল হেলিকপ্টার ইত্যাদি।

একটা এয়ারক্রাফটের সাধারনত প্রাথমিক মেয়াদ হয় ৮০০০ ঘন্টা ফ্লাইং আওয়ার বা ২৫ বছর পর্যন্ত। মিড-লাইফ আপডেটের মাধ্যমে ফ্লাইং টাইম আরো ৪০০০ ঘন্টা বা ১৫ বছর বৃদ্ধি করা যায়। রি-বিল্ড টেকনোলজির মাধ্যমে ফ্লাইং টাইম আরো ৪০০০ ঘন্টা বা ২০ বছর বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ একটি যুদ্ধবিমানের সর্বোচ্চ মেয়াদ থাকতে পারে ৬০ বছর পর্যন্ত। এটা শুধু এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রে না, ট্যাংক সহ বিভিন্ন ধরনের আর্মাড ভেহিকল, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন থেকে নিয়ে সব ধরনের গোলাবারুদ ও যুদ্ধাস্ত্রের সর্বোচ্চ মেয়াদ হয় ৬০ বছর। তবে এই ৬০ বছর পর্যন্ত যেকোনো যুদ্ধাস্ত্র সার্ভিসে রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সাধারনত কোন দেশ ৪০ বছরের বেশি কোন যুদ্ধাস্ত্র সার্ভিসে রাখে না।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে ১৬ টি যুদ্ধ বিমানে একটি স্কোয়াড্রন ধরা হয় আবার কোন কোন দেশে ১৮ টি যুদ্ধ বিমানে এক স্কোয়াড্রন ধরা হয়। বিশেষ করে চীন, রাশিয়ার মতো দেশগুলোতে ১৬ টি যুদ্ধ বিমানে এক স্কোয়াড্রন ধরা হয়। আর ন্যাটোর সদস্য দেশগুলো ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোতে ১৮ টি যুদ্ধ বিমানে এক স্কোয়াড্রন ধরা হয়।

যুদ্ধ বিমান বা মিসাইলের গতি সাধারনত ম্যাক হিসেবে গন্য করা হয়। এক ম্যাক হচ্ছে ঘন্টায় শব্দের গতির সমান। এই শব্দের গতি তাপমাত্রা ও উচ্চতা ভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারনত শব্দের গতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩৩ মিটার বা ঘন্টায় প্রায় ১২০০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। সুতরাং এক ম্যাক = ঘন্টায় প্রায় ১২০০ কিলোমিটার গতি হয়ে থাকে। যেসব এয়ারক্রাফট বা মিসাইলের গতি ঘন্টায় এক ম্যাকের নিচে হয় সেগুলোকে সাবসনিক গতির অধিকারী বলা হয়। এবং ঘন্টায় এক ম্যাক থেকে নিয়ে পাঁচ ম্যাক গতির যেকোনো এয়ারক্রাফট বা মিসাইলকে সুপারসনিক গতির অধিকারী বলা হয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ এয়ারক্রাফট বা মিসাইল এই সুপারসনিক গতির অধিকারী হয়ে থাকে। ঘন্টায় পাঁচ ম্যাকের চেয়ে বেশি গতির যেকোনো এয়ারক্রাফট বা মিসাইলকে হাইপারসনিক গতির অধিকারী বলা হয়। সাধারনত এয়ারক্রাফট এই হাইপারসনিক গতির হয় না।

মিসাইল ছাড়াও বর্তমানে রেইলগান নামের একটি গান সিস্টেমের যুদ্ধাস্ত্র হাইপারসনিক গতির হয়ে থাকে। হাইপারসনিক মিসাইলের একুরেসি সাবসনিক গতির মিসাইলের চেয়ে কম হয়ে থাকে। হাইপারসনিক গতির মিসাইল তৈরী করা যেমন ঝামেলার ব্যাপার তেমনি খরচ সাপেক্ষ বিষয়ও। এই কারনেই পশ্চিমা দেশগুলোরর বেশিরভাগ ক্রুজ মিসাইলই সাবসনিক গতির হয়ে থাকে, এগুলোকে শত্রুর এয়ারডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে টার্গেটে আঘাত হানার জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী করে তৈরী করা হয়। এবং ব্যালিস্টিক মিসাইল সুপারসনিক গতির হয়ে থাকে।

চীন রাশিয়া সহ কিছু দেশের ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল হাইপারসনিক গতির হলেও টার্গেটে আঘাত হানার ক্ষেত্রে এগুলোর একুরেসি একেবারেই কম। তাছাড়া একটি মিসাইল হামলা করার ক্ষেত্রে মুল লক্ষ্য থাকে শত্রুর এয়ারডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে টার্গেটে আঘাত হেনে টার্গেটকৃত বস্তু ধ্বংস করা। হাইপারসনিক গতির মিসাইল এয়ারডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে ইন্টারসেপ্ট করা যায়না ঠিকই কিন্তু টার্গেটে যদি ঠিকমতো আঘাত করতে না পারে তাহলে তো কোন লাভ নেই, লস ছাড়া।

একই ভাবে যদি একটি সাবসনিক বা সুপারসনিক গতির মিসাইল এয়ারডিফেন্সকে ফাঁকি দিতে পারে তাহলে-তো হাইপারসনিক গতির মিসাইল ও সুপারসনিক বা সাবসনিক মিসাইলের ব্যাপারটা সমানই হয়ে যাচ্ছে!কেননা হাইপারসনিক গতির মুল লাভটাই হচ্ছে, এয়ারডিফেন্সকে ফাঁকি দিতে পারা। সেটা সুপারসনিক বা সাবসনিক গতির মিসাইলও দিতে পারেছে। তার উপরে আবার সাবসনিক বা সুপারসনিক গতির মিসাইল টার্গেটে আঘাত হানার ক্ষেত্রে একুরেসি অনেক বেশি হয়ে থাকে হাইপারসনিক গতির মিসাইলের চেয়ে। সাবসনিক বা সুপারসনিক গতির মিসাইল তৈরী করা তুলনামূলক সহজ ও খরচও কম হয়ে থাকে হাইপারসনিক গতির মিসাইলের তুলনায়। সেই সব দিক বিবেচনায় সাবসনিক বা সুপারসনিক গতির মিসাইল হাইপারসনিক গতির মিসাইলের চেয়ে এগিয়েই থাকছে।

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

(গ্রাউন্ড ফোর্সের ভারি যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে)

বর্তমানেও যুদ্ধে গ্রাউন্ড ফোর্সের মুল অস্ত্র হচ্ছে মেইন ব্যাটেল ট্যাংক। যুদ্ধের সময় এখনো ট্যাংক যুদ্ধের প্রধান অস্ত্রের ভূমিকা রাখে। শত্রুর কোন ট্যাংক একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়ে ড্যামেজ করে দেওয়া বা ট্যাংকের তেল, গোলাবারুদ ও অপারেটর সৈন্যদের খাদ্যের সংকট তৈরি করতে পারাটা বেশি লাভজনক। এতে করে সৈন্যরা ঐ ট্যাংক ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে শত্রুর ঐ ট্যাংককে নিয়ে গিয়ে ড্যামেজ হলে রিপেয়ার করে ব্যাবহার করা যায়। আর ড্যামেজ না হলে-তো রিপেয়ার করা ছাড়াই ব্যাবহার করা যায়। অথবা অন্য সিস্টেমেও সংকট তৈরি করা যায় ট্যাংক বা এই জাতীয় আর্মাড ভেহিকলের জন্য। যেমনটা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে হয়েছে। শীতকালে ইউক্রেনে তুষারপাতের কারনে তৈরী হওয়া কাদামাটিতে বহু ট্যাংক মাটিতে ডেবে আটকে গেছে। এগুলো খুব দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ার কারনে রুশ সৈন্যরা ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। বাংলাদেশের বর্ষাকালে এই ধরনের কাদামাটির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই ধরনের যত ট্যাকটিক্স আছে সেগুলোকেও কাজে লাগিয়ে শত্রুর ট্যাংককে দখল করা বা ড্যামেজ করে দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১২ টি ট্যাংকে একটি ট্যাংক স্কোয়াড্রন তৈরী করা হয়। এবং কিছু দেশে ৪৪টিতে আবার কিছু দেশে ৪৫টি ট্যাংকে একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট তৈরী করা হয়। একটি ট্যাংকে সাধারনত তিন জন অথবা চারজন ক্রু থাকে, ড্রাইভার, গানার, কমান্ডার ও লোডার। যেই সব ট্যাংকে অটো লোডার সিস্টেম থাকে সেগুলোতে ম্যানুয়াল লোডারের প্রয়োজন পড়ে না এবং সেই সব ট্যাংকে ক্রু থাকে তিন জন। অটো লোডার সিস্টেমের কারনে একজন ক্রু কম লাগার কারনে কোন ট্যাংক ধ্বংস হলে একজন সৈন্য কম নিহত হয়। তবে অটোলোডার সিস্টেমের সবচেয়ে বড় সমস্যার দিকটি হচ্ছে, খুব দ্রুত পরপর ফায়ার করা যায় না।

অটো লোডার সিস্টেম দিয়ে রি-লোড হতে নির্দিষ্ট একটি সময় লাগে, এই সময়ের মাঝে আর ফায়ার করা যায় না। ধরুন, একটি ট্যাংকের অটোলোডার দিয়ে রি-লোড হতে ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। এই ক্ষেত্রে একটি গোলা ফায়ার করার পর পুনরায় ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মাঝে শত্রু একদম কাছে চলে এসে নিজেদের ট্যাংকটিকে ধ্বংস করে দিলে অথবা শত্রু ট্যাংকের ফায়ার রেঞ্জের বাহিরে চলে গেলেও কিছুই করার থাকে না। কিন্তু ম্যানুয়াল লোডার হলে ৩০ সেকেন্ডের মাঝে কয়েকটি গোলা লোড করে ফেলতে পারবে এবং ফায়ারও করা যাবে। এই কারনেই চীন ও রাশিয়ার ট্যাংকগুলোতে অটো লোডার সিস্টেম ইনস্টল করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান দেশগুলোর ট্যাংক ম্যানুয়াল লোডার সিস্টেমের হয়ে থাকে। ট্যাংকের মতো অন্যান্য যত সামরিক আর্মাড ও নন আর্মাড ভেহিকল আছে সেগুলোও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী যুদ্ধে ট্যাংকের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আনম্যান্ড গ্রাউন্ড কমব্যাট ভেহিকল ড্রোনের মতোই বেশ ভালো কার্যকর। এবং এতে কোন সৈন্য আহত বা নিহত হওয়ার কোন ঝুঁকিও থাকে না। উন্নত দেশগুলোর প্রায় সব দেশই নিজেরা আনম্যান্ড গ্রাউন্ড কমব্যাট ভেহিকল তৈরী করে থাকে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়া ও তুরস্ক উভয় দেশই বেশ ভালো পরিমাণে এই ধরনের আনম্যান্ড আর্মাড ভেহিকল ব্যাবহার করেছে। এগুলোর অনেকটা লাইট ট্যাংকের মতো ফায়ার ক্ষমতা থাকে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে লাইট ট্যাংক ব্যাবহার করার মতোই সুবিধা দেয়। গ্রাউন্ড ফোর্সের ব্যাবহৃত অন্যান্য যতগুলো অস্ত্র আছে, লাইট ট্যাংক, হুইল বেসড ট্যাংক ডেস্ট্রয়ার, ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকল বা আইএফভি, আর্মাড পার্সোনাল ক্যারিয়ার বা এপিসি, সরানোর ভেহিকল, বিভিন্ন ধরনের আনম্যান্ড আর্মাড ভেহিকল, রিমোট কন্ট্রোল মাইন অপসারণের ভেহিকল সহ বিভিন্ন ধরনের আর্মাড ও নন আর্মাড ভেহিকল, মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট ট্রাক, পোর্টেবল ব্রিজ, ভেকু, বুলডোজার সহ বিভিন্ন ধরনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকল ইত্যাদি। এগুলোকেও ট্যাংকের মতোই কৌশল কাজে লাগিয়ে ধ্বংস করা হয় অথবা দখল করা হয়।

ছত্রিশতম অধ্যায়-

(যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর বিপরীত কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কে)

একজন পুলিশ যদি চোরের পিছনে দৌড়ায় তাহলে ঐ পুলিশ কখনোই চোরকে ধরতে পারবেনা। বরং পুলিশ যদি চোরকে ধরতে চায়, তাহলে তাকে এমন একটি রাস্তা ব্যাবহার করতে হবে যাতে করে সে ঐ চোরকে আটকতে পারে। পুলিশ যদি চোরের পিছনে পিছনে দৌড়ায় এবং গতি বাড়ায় তাহলেও কোন লাভ হবে না। কেননা চোরও পুলিশের গতির সাথে সমানতালে তার গতিও বাড়াবে। ফলাফল!পুলিশ কখনোই চোরকে ধরতে পারবেনা।

কোন রাষ্ট্র যদি তার শত্রুর উপর বিজয়ী হতে চায়, তাহলে শত্রু যেই দিকটিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, সেও যদি সেই দিকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে তাহলে সে সফল হবে না। ফলাফল ঐ চোর পুলিশের মতোই হবে। বরং শত্রুর শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ধ্বংস করার দিকে এবং শত্রুর দুর্বল দিকটি খুজে বের করে সেই দিকটিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করলে সেই রাষ্ট্রটির সফল হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি!

এই ধরনের একটি নীতিই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে ছিলো। যুক্তরাষ্ট্র এয়ারফোর্সের দিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বিপরিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দিকে না হেটে, এয়ারফোর্স ধ্বংস করার জন্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার দিকে হেটেছে। যাতে করে যুক্তরাষ্ট্র তার ভুখন্ড থেকে যুদ্ধ বিমান নিয়ে উড়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভুখন্ডে বোম্বিং করতে না পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল দিকটি ছিলো ট্যাংক ও সাবমেরিন। এই দিকটিতেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল বিশাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বানিয়ে ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ্যাটাকে মোকাবিলা করার জন্য এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার না

বানিয়ে বিশাল বিশাল নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন তৈরি করেছিলো। এবং সেগুলোতে সাধারন ওয়্যারহেডবাহী ও নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডবাহী এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল ও এন্টি শিপ ব্যালিস্টিক মিসাইল ইনস্টল করেছিলো। যাতে করে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে প্রথম ধাক্কাতেই যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

একই ধরনের একটি নীতিও আমরা ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মাঝেও দেখতে পাই। ইন্ডিয়ার নৌবাহিনী ওয়্যার শিপ ক্যাপাবিলিটির দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। তাই পাকিস্তান এই দিকে না হেটে, এন্টি শিপ ক্যাপাবিলিটির দিকে হেটেছে। ইন্ডিয়ার দুর্বল দিকটি হচ্ছে, এয়ারফোর্স ক্যাপাবিলিটি। তাই পাকিস্তান এই এয়ারফোর্স ক্যাপাবিলিটিই বাড়িয়েছে। একই ভাবে ইন্ডিয়ার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের এরকম কিছুই নেই। এরকম কিছু করাও পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভবও না। ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলা করার যতগুলো সিস্টেম আছে তার মাঝে একটি হচ্ছে, সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করা। যতগুলো এন্টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সিস্টেম আছে তার মাঝে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে লক্ষ্যে করে সাবমেরিন থেকে হেভিওয়েট টর্পেডো বা নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডবাহী টর্পেডো নিক্ষেপ করার কৌশলটি হচ্ছে সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মোকাবিলার যতগুলো পদ্ধতি আছে তার মাঝে। এই কারনে পাকিস্তান ঠিক এই কাজটিই করছে। মানে পাকিস্তান অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাবমেরিন সংগ্রহ করছে এবং পুরোনোগুলোকেও আপগ্রেড করছে, ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মোকাবিলা করার জন্য।

টর্পেডো মোকাবিলার জন্য সাবমেরিন বা যুদ্ধ জাহাজে মোটা দাগে হার্ড কিল ও সফট কিলে নামে দুই ধরনের এন্টি টর্পেডো সিস্টেম থাকে। বিশ্বের আধুনিক সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিনে সফট কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম থাকলেও খুবই কম দেশের যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিনে হার্ড কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম থাকে। সফট কিল এন্টি টর্পেডোর কিছু সিস্টেম আছে, যেমন, কোন টর্পেডো জ্যামিং করে বিভ্রান্ত করে দেওয়া, উচ্চ ক্ষমতার বাইব্রেশন উৎপন্ন করে এমন ডেকয় নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। সাধারনত এই বাইব্রেশন উৎপন্ন করে এমন ডেকয় সাবমেরিনে ব্যাবহার করা হয়। বাইব্রেশন উৎপন্ন না করেও অন্য সিস্টেমে টর্পেডোকে ধোঁকা দেয় এমন অনেক ডেকয় সিস্টেম আছে। যেগুলো সাধারনত যুদ্ধ জাহাজে ব্যাবহার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ জাহাজের হুলের দুই পাশে পানি ভর্তি এক্সট্রা কম্পার্টমেন্ট যুক্ত

করা হতো। ফলে শত্রুর ছোড়া টর্পেডো ঐ কম্পার্টমেন্টে আঘাত হানতো। এতে করে মুল জাহাজ ঠিক থাকতো। জাহাজের তলা ফেটে যেত না। এটি সফট কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেমেগুলোর একটি। তবে বর্তমানে আধুনিক টর্পেডোর ক্ষেত্রে এই সব সিস্টেম কার্যকরি নয়। আরেকটি সফট কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম হচ্ছে, ট্যাংকের মতো যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিনে হেভি আর্মার ব্যাবহার করা। এটিও বর্তমান উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরকবাহী টর্পেডোর যুগে অকার্যকর।

সফট কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেমের মাঝে সবচেয়ে কার্যকরী সিস্টেম হচ্ছে, নেট। এটা মাছ ধরা বা কোন বৃহৎ আকারের প্রানী শিকার করার মতোই নেট দিয়ে টর্পেডো শিকার করা হয়। যুদ্ধ জাহাজের চতুর দিকেই এই নেট সিস্টেম দিয়ে আগত টর্পেডোকে জালে আটকে ফেলা হয়। এতে টর্পেডো লক্ষ্য বস্তুতে আঘাতও করতে পারে না আর বিস্ফোরিতও হতে পারে না। এই ধরনের নেট সিস্টেম বর্তমানে ছোট ছোট সুইসাইড ড্রোন আটকানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী সফট কিল সিস্টেম।

হার্ড কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম হচ্ছে, মিসাইল বেসড এয়ার ডিফেন্সের সিস্টেমে মতো টার্গেটের দিকে ধেয়ে আসা একটি টর্পেডোকে পাল্টা আরেকটি টর্পেডো দিয়ে ধ্বংস করার প্রযুক্তি।

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়

(নৌবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে)

সাধারণত কোন দেশের নৌবাহিনীই তেমন একটা যুদ্ধে জড়ায় না। ভুমি দখলে থাকলে নৌ-সীমানা এমনিতেই দখলে থাকে। তবে উন্মুক্ত নৌ-সীমানা ছাড়া একটি দেশ সব সময়ই পঙ্গু হয়ে থাকে। সেই রাষ্ট্রটি তার সমস্ত বানিজ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে থাকে। আগে যখন এয়ারফোর্স ছিলো না তখন দুরের কোন রাষ্ট্রে হামলা করার জন্য নৌবাহিনীর কোন বিকল্প ছিলো না। পৃথিবীতে আকাশপথ দিয়ে কিছুটা বানিজ্যের কাজ বর্তমানে সারা গেলেও নৌ-পথই বানিজ্যের প্রানশক্তি। সমুদ্রকে পৃথিবীর প্রান বলা হয় আর একটি দেশের হার্ট বলা হয় ঐ দেশের উন্মুক্ত সমুদ্র সীমানাকে। সমুদ্রে শাসন যার সারা বিশ্বে শাসন তার!আগে যখন বানিজ্যিক জাহাজগুলো জল দস্যুদের দ্বারা লুটপাট করা হতো তখন এগুলোর নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনীর কোন বিকল্প ছিলো না। বর্তমান সময়েও নিজের সমুদ্র সীমানা নিরাপদ রাখা, সর্বক্ষণ পাহাড়া দেওয়া, বানিজ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য নৌবাহিনীর কোন বিকল্প নেই।

নৌ-বাহিনীর মুল যুদ্ধাস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন। সেই সব যুদ্ধ যান হতে পারে একটি ছোট গানবোট বা কুইকলি রেসপন্স বোট থেকে নিয়ে হেভি ডেস্ট্রয়ার ও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যুদ্ধ জাহাজ পর্যন্ত। এবং মিজেট সাবমেরিন থেকে নিয়ে বৃহৎ আকৃতির নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন পর্যন্ত। মিজেট সাবমেরিন বলা হয়, যেগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট ১৫০ টনের নিচে।

নৌবাহিনীর স্পেশাল দুইটি অস্ত্র হচ্ছে, নেভাল মাইন আর টর্পেডো। নেভাল মাইন বেশিরভাগ আন-গাইডেড হওয়ায় নৌবাহিনীর মুল বিশেষ অস্ত্র হচ্ছে টর্পেডো। তবে বর্তমানে কিছু পোর্টেবল রিমোট কন্ট্রোল বা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নেভাল মাইনও আছে। টর্পেডো ও নেভাল মাইন নৌবাহিনীর জন্য বিশেষ অস্ত্র হওয়ার কারন হচ্ছে, এগুলো

অন্য কোন বাহিনী ব্যাবহার করে না। এগুলোকে শুধুমাত্র নৌবাহিনীর জন্যই তৈরি করা হয়। নৌবাহিনীর অন্যান্য অস্ত্র সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল, এন্টি শিপ মিসাইল, গ্রাউন্ড এটাক ক্রুজ মিসাইল, C-RAM সিস্টেম, এন্টি এয়ারক্রাফট ও মেইন গান ইত্যাদি যেগুলো গ্রাউন্ড ফোর্সও ব্যাবহার করে।

টর্পেডো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে সাবমেরিন ধ্বংস করতে। আন-গাইডেড নেভাল মাইন বাদে একমাত্র এন্টি সাবমেরিন ওয়েপনস হচ্ছে টর্পেডো এবং গাইডেড পোর্টেবল নেভাল মাইন বাদে একমাত্র গাইডেড এন্টি সাবমেরিন ওয়েপনস হচ্ছে টর্পেডো। সাবমেরিন থেকে কোন সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজ থেকে কোন সাবমেরিন ধ্বংস করতে চাইলে টর্পেডোর কোন বিকল্প নেই। সাবমেরিন থেকে কোন যুদ্ধ জাহাজ বা যুদ্ধ জাহাজ থেকে কোন যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করতে চাইলে টর্পেডো বাদেও এন্টি শিপ মিসাইল আছে। এবং যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করার জন্য গ্রাউন্ড থেকে ফায়ার করার মতো এন্টি শিপ মিসাইল সহ অনেক ধরনের অস্ত্র আছে।

মিজেট সাবমেরিন সহকারে সারা বিশ্বে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট আর্মাড সাবমেরিন ছিলো ৫১৪ টি গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের রিপোর্ট অনুসারে। এগুলোকে ধ্বংস করতে যদি একটি লাইট ওয়েট টর্পেডো এবং একটি হেভিওয়েট টর্পেডো ব্যাবহার করতে হয় তাহলে গড়পড়তায় সারা বিশ্বের সমস্ত সাবমেরিন ধ্বংস করতে ১০০০টা টর্পেডো প্রয়োজন পড়বে। একটি লাইট ওয়েট টর্পেডো ও একটি হেভিওয়েট টর্পেডো মিলিয়ে প্যাকেজ আকারে ক্রয় করলে খরচ ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি পড়বেনা কোন ভাবেই। আর নিজেরাই তৈরী করলে-তো খরচ দশ ভাগের এক ভাগ হবে। তাহলে সারা বিশ্বের সমস্ত সাবমেরিন ধ্বংস করতে চাইলে ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে ৫০০ প্যাকেজে এক হাজারটা টর্পেডো ক্রয় করলেই হবে। এই ব্যায়টা খুব বেশি না অন্যান্য দিক বিবেচনায়।

একটি যুদ্ধ জাহাজ সব সময় সমুদ্র সীমানা পাহাড়া দেওয়ার জন্য একটিভ রাখা যায় বিপরীতে একটি যুদ্ধবিমান দিনে সর্বোচ্চ হলে ৩-৪ ঘন্টা আকাশে রাখা যায়। যুদ্ধজাহাজের ক্ষেত্রে তেল খরচ ছাড়া তেমন কোন মেইন্টেন্স খরচ এবং মেইন্টেন্সের ঝামেলাও নেই। বিপরীতে একটি যুদ্ধ বিমান কয়েক ঘন্টা আকাশে উড়লেই তেল খরচ সহ প্রচুর পরিমাণে মেইন্টেন্স করতে হয় এবং মেইন্টেন্স খরচও প্রচুর। যুদ্ধবিমানে মেইন্টেন্সের সামান্য ঝামেলা হলেই ক্রাশ করে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে মিলিয়ন মিলিয়ন ইউএস ডলার লস তো হয়ই এবং পাইলটও নিহত হওয়ার ঝুঁকি

থাকে।

যুদ্ধ জাহাজের মেইন্টেন্সে বা ইঞ্জিনে কোন সমস্যা হওয়ার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয়ার তেমন কোন ঝুঁকি নেই। যুদ্ধ জাহাজ যদি শত্রুর হামলায় বা স্যাবোটাজে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও ক্রুদের বড় একটা অংশ সাতার কেটে বা বয়া নিয়ে ভেসে থাকতে পারে এবং উদ্ধারকারী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। অথবা যুদ্ধ জাহাজের ভেতরে থাকা বিভিন্ন ধরনের ছোট বোট বা লাইফ বোট নিয়ে যুদ্ধজাহাজ থেকে বেরিয়ে বেঁচে যেতে পারে।

যুদ্ধবিমানের ক্ষেত্রে প্যারাসুট নিয়ে ইজেক্ট করে পাইলটের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যুদ্ধ জাহাজের ক্রুদের চেয়ে কম হয়। একটি যুদ্ধ জাহাজ নিজের তেল খরচ কমাতে ইঞ্জিন বন্ধ করে সমুদ্রে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় অবস্থান করেও সমুদ্র সীমানা পাহাড়া দিতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধ জাহাজের রাডার সহ অন্যান্য সেন্সর গুলো একটিভ রাখার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম চালু রাখতে হয়। এতে খুব অল্প পরিমাণ তেল খরচ হয়। যুদ্ধ বিমানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন কিছু করে তেল খরচ ও মেইন্টেন্স খরচ কমানোর সুযোগ নেই।

একটি হেভি ডেস্ট্রয়ার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ যেই পরিমাণ অস্ত্র বহন করে সেই পরিমাণ অস্ত্র বহন করতে কয়েক স্কোয়াড্রন মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমানের প্রয়োজন পড়ে। একটি হেভি ডেস্ট্রয়ারের বহন করা অস্ত্র কোন এয়ারক্রাফটে বহন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের B-52 স্ট্রাটোফর্ট্রেস হেভি বোম্বারের মতো দুইটি এয়ারক্রাফট লাগবে। একটি মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমান খুব বেশি দুরে নন-স্টপ ফ্লাই করতে পারেনা। মাঝপথে এয়ার টু এয়ার রিফুয়েলিং করার পরেও খুব বেশি দুর যেতে পারে না। একটি বোম্বার এয়ারক্রাফট নন-স্টপ অনেক দুর ফ্লাই করতে পারলেও মাঝপথে এয়ার টু এয়ার রিফুয়েলিং এর পরেও যুদ্ধ জাহাজের মতো এতদূর যেতে পারে না। একটি হেভি ডেস্ট্রয়ার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে নন-স্টপ ভাবে চালিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে আসা যাবে।

যুদ্ধবিমান নন-স্টপ খুব বেশি দুর ফ্লাই করতে না পারার এই সমস্যার সমাধান করার জন্যই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নামের বিশাল যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করা হয়েছে। দূরবর্তী যেকোনো দেশে স্বল্প খরচে ব্যাপক হামলা চালানো এবং ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ জাহাজের কোন বিকল্প নেই।

একটি সাবমেরিনও যুদ্ধ জাহাজের মতোই বহু দুরে যেতে পারে এবং যেকোনো দেশে

ব্যাপক ধ্বংস চালাতে পারে। সাবমেরিন একটি দেশের নৌবাহিনীর স্ট্রাটেজিক ওয়েপনস। সাবমার্জড অবস্থায় সাবমেরিন যেকোনো সোনার সিস্টেম দিয়ে ডিটেক্ট করাটা খুবই কঠিন ব্যাপার। সাবমেরিন মুলত বিভিন্ন ধরনের নেভাল মাইন, টর্পেডো, সাবমেরিন লাঞ্চড ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল বহন করে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত আর্মাড সাবমেরিনের মুল অস্ত্রই হচ্ছে নেভাল মাইন ও টর্পেডো। সমস্ত আর্মাড সাবমেরিনেই এই নেভাল মাইন ও টর্পেডো থাকে। তবে ক্রুজ মিসাইল ও ব্যালিস্টিক মিসাইল বহন করার জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী করে বৃহৎ আকৃতির সাবমেরিন তৈরী করতে হয়। শুধু নেভাল মাইন টর্পেডো বহনকারী সাবমেরিনগুলো সাধারনত ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারডই হয়ে থাকে।

ক্রুজ মিসাইল ও ব্যালিস্টিক মিসাইল বহনকারী সাবমেরিনগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে। নিউক্লিয়ার পাওয়ারড ও ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড। যেই সব ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড সাবমেরিন ক্রুজ মিসাইল ও ব্যালিস্টিক মিসাইল বহন করতে পারে সেগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট সাধারনত ৩০০০ টন থেকে নিয়ে ৫০০০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। ৫০০০ টনের চেয়ে বেশি ডিসপ্লেসমেন্টের কোন সাবমেরিন সাধারনত ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড হয় না। এর চেয়ে বেশি বেশি ডিসপ্লেসমেন্টের সাবমেরিনগুলো নিউক্লিয়ার পাওয়ারড হয়ে থাকে। বর্তমানে আধুনিক ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড সাবমেরিনগুলোতে AIP(এয়ার ইন্ডিপেন্ডেট প্রপালশন) থাকে। যার কারনে এগুলো নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনের মতোই একাধারে দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকতে পারে।

বর্তমানে ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো রাষ্ট্রগুলো নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডবাহী মিসাইলগুলো সম্পূর্ণ সাবমেরিন বেসড করে ফেলছে। এই দেশগুলোর সমস্ত নিউক্লিয়ার ওয়েপনসই বর্তমানে সাবমেরিন বেসড। এতে করে নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের মেইন্টেন্সের খরচ অনেক কমে গেছে এবং ঝুঁকিও কমে গেছে। গ্রাউন্ড বেসড নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের মেইন্টেন্স কস্ট অনেক বেশি হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ। মেইন্টেন্সের সামান্য ঝামেলা হলেই এগুলোর বিস্ফোরন ঘটতে পারে। অথবা কোন স্যাবোটাজ বা শত্রুর হামলায় এগুলো ধ্বংস হলেও নিজের অস্ত্রে নিজেরই বিশাল ক্ষতি হবে। কিন্তু নিউক্লিয়ার ওয়েপনস সাবমেরিন বেসড হলে মেইন্টেন্সের ত্রুটি, স্যাবোটাজ বা শত্রু হামলায় ধ্বংস হলেও সাবমেরিনটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া তেমন বড় কোন ক্ষতি হবে। শত্রুর অজান্তেই লুকিয়ে হামলা করার জন্য সাবমেরিনের জুড়ি মেলা ভার হলেও সাবমেরিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, সাবমার্জড অবস্থায় এর ভেতরে কোন সমস্যা হলেই

এটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং সমুদ্র তলিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের ধ্বংস হয়ে গেলে বা তলিয়ে গেলে ক্রুদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে ১%। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ ও ক্রুদের লাশও খুঁজে পাওয়া যায় না। শত্রু হামলায় ধ্বংস হলে তো কোন কথাই নাই!

তবে সাবমেরিন সার্ফেসড অবস্থায় থাকলে সাবমেরিনের ভিতরে কোন ধরনের কারিগরি সমস্যা দেখা দিলে সাবমেরিন ও এর ক্রুদেরকে উদ্ধার করা যায়। কিংবা সার্ফেসড অবস্থায় থেকে কোন ভাবে সাবমেরিন ধ্বংস হলেও কিছু ক্রুদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে যুদ্ধেকালীন সময়ে সাবমেরিন সার্ফেসড অবস্থায় অনেকটা অনিরাপদ হয়ে থাকে। শত্রুর দ্বারা সহজেই ডিটেক্ট হওয়া ও শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর!সাবমেরিন সার্ফেসড অবস্থায় থাকলে এন্টি এয়ারক্রাফট ওয়েপনস হিসেবে ম্যানপ্যাড ব্যাবহার করা যায়, এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট ও এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার হেলিকপ্টারকে ধ্বংস করার জন্য। অন্যান্য মানপোর্টবল অস্ত্রগুলো সাবমেরিন সার্ফেসড অবস্থায় থাকলে সাবমেরিনের উপরে স্থাপন করেও ফায়ার করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির ইউবোট সাবমেরিনগুলোতে নেভালগান ইনস্টল করা হয়েছিলো। এগুলো বেশ ভালো কার্যকরও ছিলো। এই ইউবোটগুলো পানির নিচে হালকা ডুবে চলাচল করতো। এগুলোকে দুর থেকে দেখা যেতো না। এগুলো সার্ফেসড অবস্থায় ও সাবমার্জড অবস্থায় উভয় ক্ষেত্রেই টর্পেডো ফায়ার করতে পারতো। এই ইউবোটগুলো নেভাল মাইন বহন করে বিভিন্ন জায়গায় সেট করেও দিতে পারতো। আবার কখনো শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের কাছাকাছি এসে হুট করেই পুরোপুরি সার্ফেসে উঠে এসে শত্রুর যুদ্ধ জাহাজ লক্ষ্য করে ফায়ার করতো। শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের ক্রুরা কিছু বুঝে উঠার আগেই অনেক ক্ষতি হয়ে যেত বা একেবারেই যুদ্ধ জাহাজের সলিল সমাধি হয়ে যেত। শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের পাল্টা হামলার আগে বা পাল্টা হামলা শুরু হলেই এই ইউবোটগুলো সাবমার্জড হয়ে যেত। এতে করে এগুলো নিজের কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই কেটে পড়তে পারতো!

নৌ বাহিনীর আরো কিছু অস্ত্র হচ্ছে, আনম্যান্ড আর্মাড বোট, ম্যানুয়াল সুইসাইড সাবমেরিন ও সুইসাইড বোট। আনম্যান্ড আর্মাড বোট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঝাঁক হামলা করা যায়। এই ধরনের আনম্যান্ড আর্মাড বোটের ঝাঁক হামলার কাছে নৌবাহিনীর যেকোনো ধরনের ব্যাটেল গ্রুপই অসহায়। আনম্যান্ড আর্মাড বোট

কমব্যাট ড্রোনের সমস্ত সুবিধাগুলোর মতোই নৌবাহিনীর সমুদ্র সীমানায় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সেই সব সুবিধাগুলো দিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্র শক্তির নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে বহু ম্যানুয়াল সুইসাইড সাবমেরিন ব্যাবহার করেছে। ম্যানুয়াল সুইসাইড বোট দিয়ে ২০০০ সালে ইয়ামেনের এডেনে নোঙর করা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ার USS Cole এ আঘাত হেনে বেশ ভালোই ক্ষতি করা হয়েছিলো। যদিও ডুবে যায়নি বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে রিপেয়ার করে আবার সার্ভিসে নিয়ে আসা হয়েছিলো। সুইসাইড বোটেরও আনম্যান্ড সিস্টেম আছে। ২০১৬ সালে ইয়েমেনের হুথি সন্ত্রাসীরা ইয়েমেনের হুদাইদা পোর্টে নোঙর করা অবস্থায় সৌদি আরবের একটি ফ্রিগেটে আনম্যান্ড সুইসাইড বোট দিয়ে আঘাত হেনেছিলো। বেশ ক্ষতি হলেও ফ্রিগেটটি ধ্বংস হয়ে বা ডুবে যায়নি। পরবর্তীতে রিপেয়ার করে ফ্রিগেটটিকে আবার সার্ভিসে নিয়ে আসা হয়েছে।

আটত্রিশতম অধ্যায়

(নিউক্লিয়ার পাওয়ারড যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কে)

নৌবাহিনীর ব্যাবহৃত যুদ্ধ জাহাজগুলোর মাঝে কিছু এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন নিউক্লিয়ার পাওয়ারড হয়ে থাকে। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মতো বিশাল যুদ্ধ জাহাজগুলো পরিচালনা করতে এবং বিশাল আকৃতির সাবমেরিনগুলো পরিচালনা করতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়। সেই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি পরিবহনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু কিছু এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিনে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে। তবে এই নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিনগুলোর অনেক সমস্যা আছে। সেই সব সমস্যার কিছু অংশ নিচে তুলে ধরছি,

একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তৈরি করতে কনভেনশনাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের চেয়ে তিনগুণ বেশি খরচ পড়ে। এবং ৩০ বছরে কনভেনশনাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের যত অর্থ খরচ হয় মেইন্টেন্স বাবাদ, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি খরচ হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মেইন্টেন্সর ক্ষেত্রে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রক্ষনাবেক্ষন করা সাধারন কোন ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা সম্ভব না। এতে বিশেষ নিউক্লিয়ার বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। যেই ধরনের ইঞ্জিনিয়ার খুব কম দেশেই আছে। যেই সব দেশে আছে সেই সব দেশেও খুব বেশি পরিমাণে নেই। যা আছে তা দিয়ে খুব কম দেশই নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনগুলো পরিচালনা করতে পারবে। এটা পরিচালনা করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারি নিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের সামরিক ক্ষেত্রে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দেওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশ তাদের সমুদ্রাসীমা দিয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড কোন কিছু অতিক্রম করার অনুমোদন দেয় না। কারন তাদের সমুদ্রসীমা দিয়ে অতিক্রম করার সময় কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

কনভেনশনাল সাবমেরিন বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের চেয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরগুলোর দৈনন্দিন কিছুটা প্রসার ঘটে উচ্চ তাপের কারনে। প্রসার ঘটতে ঘটতে যেকোন সময় ফেটে বিস্ফোরন ঘটতে পারে। আবার উত্তপ্ত রিয়েক্টরগুলোকে ঠান্ডা করার মেশিনে সামান্য ত্রুটি দেখা দিলেই ঘটে যেতে পারে বিশাল দুর্ঘটনা।

নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে হাফ লাইফে রিয়েক্টরগুলো পরিবর্তন করতে হয়। যা ঝুঁকিপুর্ণ এবং খরচ সাপেক্ষ বিষয়। পরিবর্তন করতে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। পরিবর্তনকৃত রিয়েক্টরগুলোকে নির্দিষ্ট জনমানবশুন্য একটি জায়গায় ফেলে রাখতে হয়। যাতে করে এর থেকে ছড়ানো রেডিয়েশনে কোন মানুষের ক্ষতি না হয়।

পরিত্যাক্ত কনভেনশনাল ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড সাবমেরিন বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বিক্রি করে মোট খরচকৃত অর্থের কিয়দংশ হলেও উদ্ধার করা যায়। কিন্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ারড হলে এগুলো বিক্রি করা যায় না। রেডিয়েশন ছড়ানোর ভয় থাকে। যুক্তরাষ্ট্র তার নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলো এবং সাবমেরিনগুলো স্ক্রাপ্ট করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে রেখে দেয়। এই জায়গাগুলো বিশাল এরিয়া নিয়ে বানাতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে বিশাল রাষ্ট্র হওয়ায় তার পক্ষে এই ধরনের জায়গা তৈরি করা কোন ব্যাপার না। কিন্তু যেকোনো ছোট দেশগুলোর জন্য এই ধরনের জায়গা তৈরি করা কঠিন ব্যাপার।

নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিনগুলোর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে শত্রু দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি গুপ্ত হত্যা করে থাকে। তাহলে যুদ্ধের সময় এগুলোকে ফেলে রাখা ছাড়া অন্য কোন কিছুই করার থাকবে না। কিংবা শত্রু দেশ যদি ঐ সব ইঞ্জিনিয়ারদের কাউকে পয়সা দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তার ইচ্ছাকৃত রেখে দেওয়া ত্রুটিতেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কয়েক বিলিয়ন ইউএস ডলারের যুদ্ধাস্ত্র নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ যদি নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরগুলোকে লক্ষ্য করে সামান্যও আঘাত হানতে পারে তাহলে শুধু ঐ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা সাবমেরিনটিই ধ্বংস হবে না বরং এর বিস্ফোরনের ধাক্কায় আশেপাশে থাকা পুরো ব্যাটেল গ্রুপই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরো একটি বিষয় হচ্ছে, একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনে যত অস্ত্র সেটিং করা যায় বর্তমানে কনভেনশনাল সাবমেরিনও সেটা করা যায়। একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনে সাধারণত অস্ত্র হিসেবে নেভাল মাইন, টর্পেডো, সাবমেরিন লাঞ্চড ক্রুজ মিসাইল আর সাবমেরিন লাঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল থাকে। এবং এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল হিসেবে ম্যানপ্যাডও থাকে। এই সব অস্ত্রগুলোই ডিজেল ইলেকট্রিক পাওয়ারড সাবমেরিনেও থাকে। নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনের মুল সুবিধা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বহন করতে হয়না এবং সার্ফেসে না উঠে এসেই একাধারে পানির নিচে সাবমার্জড অবস্থায় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। আর নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে মুল সুবিধা একটাই, সেটা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বহন করতে হয় না।

উল্ল্যেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বের দুইটি মাত্র রাষ্ট্র নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পরিচালনা করে। একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি হচ্ছে ফ্রান্স। এবং চায়নার নির্মানাধীন Type 004 এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি হবে চায়নার একমাত্র নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এর দ্বারা চায়না বিশ্বের তৃতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। যারা নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পরিচালনা করে তাদের মধ্যে ফ্রান্সের আফ্রিকা শোষন বন্ধ করতে পারলে কিছু দিনের মধ্যেই ফ্রান্সের একমাত্র এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার চার্লস ডি গলকে অবসরে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় থাকবে না পরিচালনা বাবদ অত্যাধিক ব্যায়ের কারনে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে এক ডজনের মতো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সার্ভিসে থাকলেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ব্যাবস্থার পতন হলে এক তৃতীয়াংশ ক্যারিয়ার সার্ভিসে রাখাও কষ্টকর হয়ে যাবে। চায়নার মতো জায়ান্ট ইকোনমিক পাওয়ার কেবলমাত্র একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মান করছে তাও আবার মাত্র একটি।

বর্তমানে বিশ্বের মাত্র ৬টি দেশ নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন ব্যাবহার করে। সেই দেশগুলোর মাঝে ৫টি দেশই হচ্ছে জাতিসংঘের স্থায়ী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চায়না, ফ্রান্স, ব্রিটেন। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বাহিরে একমাত্র ইন্ডিয়াই নিউক্লিয়ার

পাওয়ারড সাবমেরিন পরিচালনা করে। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিনগুলোর অপারেটর কান্ট্রিগুলো নিজেরাই এগুলো তৈরি করে নিয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক আইনে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া এই বৃহৎ শক্তিশালী দেশগুলো নিউক্লিয়ার পাওয়ারড কোন কিছু বিক্রি করে নিজেদের দাদাগিরির অবস্থানকে অবমূল্যায়ন করতে চায়না কোন ভাবেই। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন পরিচালনাকারী রাষ্ট্রগুলোর পৃথিবীর শীর্ষ বৃহৎ অর্থনীতির ও সামরিক শক্তির দেশ হওয়ায় তাদের পক্ষে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা সাবমেরিন পরিচালনা করা সম্ভব হলেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে আপাতত এটা সম্ভব হবে না, তবে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেটাতো আর বলা যায় না!

এই দেশগুলোর মাঝে ব্রিটেন নিজেদের অর্থনৈতিক সংকট ও নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের সংকটের কারনে এলিজাবেথ ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড করেনি। ২০১৭ সালে ইন্ডিয়ার নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন আইএনএস অরিহন্তের হ্যাচ খোলা রাখে চলে যাওয়ার কারনে নোঙর করা অবস্থায় ডুবে যায়। যা পরিচালনার অযোগ্যতার একটি উদাহরণ মাত্র। আর ফ্রান্স আফ্রিকার শোষন থেকে পাততাড়ি গুটালে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন সবই ভাঙ্গারিতে রূপান্তরিত হতে পারে। রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ব্যাবসায় আঘাত হানলেই এগুলোর ইঞ্জিন অকেজো হয়ে পড়তে পারে, অলরেডি রাশিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছেও। রাশিয়া নামকাওয়াস্তেই কিছু নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন সার্ভিসে রেখেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও চায়নার মত দুইটি রাষ্ট্রেরই প্রকৃতপক্ষে এগুলো একেবারেই সীমিত আকারে পরিচালনা করার মত আসল সক্ষমতা রয়েছে।

ঊনচল্লিশতম অধ্যায়

(যুদ্ধে একটি দেশের ব্যায় ও মুল ক্ষতি সম্পর্কে)

এটা সঠিক বলা সম্ভব না। অঞ্চল, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়, যুদ্ধ ব্যাবহৃত অস্ত্রের কোয়ালিটি, মোট ব্যাবহৃত অস্ত্রের পরিমাণ, অস্ত্র তৈরির খরচ, যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সৈন্য সংখ্যা ও সৈন্যদের বেতন ভাতা, আহত নিহত সৈন্যদের পরিমাণ, আহত সৈন্যদের চিকিৎসা বাবদ খরচ-ক্ষতিপূরণ ও আহত হওয়ার দ্বারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারনে সারা জীবন পাওয়া বেতন ভাতা, নিহত সৈন্যদের ক্ষতিপূরণ ও তার পরিবার পরিচালনা বাবদ প্রতিমাসে প্রধানকৃত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে যুদ্ধের ব্যায়ের হিসাব!তবে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়ার ব্যায় কেমন সেই বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। যাতে যুদ্ধের ব্যায় সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে সহজ হয়। যদিও সিরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া মুল পক্ষ না এবং রাশিয়া তেমন একটা গ্রাউন্ড ফোর্সও পাঠায়নি। কেননা পুতিনের নেতৃত্বে থাকা বর্তমান রাশিয়া আরব ও মুসলিমদের সাথে গ্রাউন্ডে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ভয় পায়।

বলা হয় যে, রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দুই জায়গায় দুর্বলতা আছে। একটি হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লম্বা কোন ব্যাক্তি সামনে বা পাশে দাড়ানো ক্ষেত্রে আরেকটি হচ্ছে আরব ও মুসলিমদের সাথে গ্রাউন্ড ফোর্স দিয়ে লড়াই করার ক্ষেত্রে অনীহা। তাই রাশিয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সরাসরি কোন গ্রাউন্ড ফোর্স পাঠায়নি। সেই কারনে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়ার ব্যায় কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাশিয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সিরিয়ার অবৈধ শাসক বাশার আল আসাদের সন্ত্রাসী বাহিনী, ইরান ও লেবানন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে এলায়েন্স হিসেবে ছিলো। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়া মুলত এয়ারফোর্স দিয়েই সাপোর্ট দিয়েছিলো। গ্রাউন্ডের লড়াইয়ে রাশিয়া তেমন একটা জড়ায়নি। রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্য ওয়াগনাররা যুদ্ধে জড়ালেও তাদের ব্যায় বহন করতে হয়েছে সিরিয়ার অবৈধ শিয়া নুসাইরি শাসক বাশার আল আসাদ গোষ্ঠীকেই।

২১ শে অক্টোবর ২০১৫ সালে প্রকাশিত CNBC এর একটি রিপোর্ট মস্কো টাইমস নিউজের প্রতিরক্ষা থিঙ্ক ট্যাংক IHS jane's এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, সিরিয়ায় রাশিয়ার এয়ারস্ট্রাইক চালানো বাবদ দৈনিক খরচ হয় ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। রাশিয়া অফিসিয়ালি সিরিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ে ২০ শে অক্টোবর পর্যন্ত ২১ দিনে রাশিয়ার মোট ব্যায় হয়েছে ৮০-১১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ঐ সময়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মুখপাত্র, Igor konashenkov টাস নিউজ এজেন্সিকে বলেন, সিরিয়াতে বর্তমানে রাশিয়ার ৫০টি ওয়্যারপ্লেন ও হেলিকপ্টার অপারেশনাল আছে।

IHS Jane's এর বক্তব্য মতে,

সিরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার ব্যাবহৃত প্রতিটি ওয়্যারপ্লেনের গড়ে এক ঘন্টার ফ্লাইং কস্ট ১২০০০ ইউএস ডলার এবং প্রতিটি হেলিকপ্টারের গড়ে এক ঘন্টার ফ্লাইং কস্ট ৩০০০ ইউএস ডলার। প্রতিটি ওয়্যারপ্লেন বোম্বিং করার জন্য গড়ে দৈনিক ১.৫ ঘন্টা ফ্লাই করে এবং প্রতিটি হেলিকপ্টার গ্রাউন্ড অপারেশনের জন্য দৈনিক গড়ে ১ ঘন্টা ফ্লাই করে। এই এয়ারক্রাফট ফ্লাই করানো বাবদ দৈনিক রাশিয়ার গড় ব্যায়, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ইউএস ডলার এবং এয়ারক্রাফট থেকে দৈনিক নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বাবদ গড় ব্যায়, ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ইউএস ডলার।

দৈনিক আর্মাড ফোর্সের সদস্যদের পিছনে দৈনিক গড় ব্যায়, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ইউএস ডলার। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ জাহাজ ও সাপোর্ট জাহাজ রাখা বাবদ দৈনিক গড় ব্যায় ২ লক্ষ ইউএস ডলার। অন্যান্য সাপোর্টিং কস্ট, লজিস্টিকস, ইন্টালিজেন্স গ্যাদারিং, কমিউনিকেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বাবদ ব্যায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ইউএস ডলার। তাহলে রাশিয়ার সিরিয়ার যুদ্ধে মোট দৈনিক নূন্যতম ব্যায় হচ্ছে , ২.৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। দৈনিক গড়ে নূন্যতম ২.৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যায়ের হিসেবে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৬ বছরে সিরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার ব্যায় প্রায় ৫.১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার হবে। চক্রবৃদ্ধি হারে সমস্ত কিছুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মুল্য সহকারে ধরলে এই নূন্যতম ব্যায়ের অঙ্কটা ৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারের কম হবে না। তাহলে এটা বলা যায় যে, সিরিয়ার যুদ্ধে ৬ বছরে রাশিয়ার ব্যায় মোটামুটি ৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এই হিসাবটা মিডিয়াগুলো থেকে পাওয়া বিভিন্ন রিপোর্ট অনুসারে লেখা। যদিও একেবারে সঠিক হিসাব পাওয়া খুবই কঠিন!প্রকৃত ব্যায় এর চেয়ে অনেকগুন বেশিও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। আল্লাহু আ'লাম!

রাশিয়ার যদি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বছরে মাত্র ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যায় হয় তাহলে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সহ যেই ৫৫টি দেশে সরাসরি আগ্রাসন চালিয়েছে তাদের সম্মিলিত ব্যায় আফগান যুদ্ধে রাশিয়ার ১০০ গুন বেশি হলেও ২০ বছরে ২ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি হবে না। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে পরিপূর্ণ রুপে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায় আগ্রাসী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোর সন্ত্রাসী সৈন্যরা। সেই ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স বাজেট অনুযায়ী এই ব্যায়টা সর্বোচ্চ হলে যুক্তরাষ্ট্রের তিন বছরের ডিফেন্স বাজেটের সমান এবং আগ্রাসী ৫৫টি রাষ্ট্রের ২ বছরের সম্মিলিত ডিফেন্স বাজেটের সমান!এই ২ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যায়ের মাঝে থেকে যুক্তরাষ্ট্র আফগান গোলাম সেনাবাহিনীর জন্য ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছরে মোট ২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অস্ত্র ক্রয় করেছে। এই ২৪বিলিয়ন ইউএস ডলারে মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া ২০টি সংস্করনকৃত C-27A পরিবহন বিমান ৪৮৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারে ক্রয় করে আফগানের গোলাম বিমান বাহিনীকে দিয়েছিলো। সেইগুলো এতটাই বাজে সার্ভিস দিয়েছিলো যে, ২০টির মধ্য থেকে ১৬টিই নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এবং একটি ভাঙ্গারিওয়ালার কাছে ৩২হাজার ইউএস ডলারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিলো। অবশেষে মাত্র ৩টি সার্ভিসে ছিলো।

এই ২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্য থেকে ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আফগান গোলাম বাহিনীর জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ৪০ বছর আগের তৈরি মেয়াদ উত্তীর্ণ গোলাবারুদ ক্রয় করে চীন ও রাশিয়া থেকে। যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ১৯৬৬ সালের দিকে তৈরি করেছিলো!২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অস্ত্রের মধ্য থেকে যুদ্ধে এবং এই ভাবে অটো ধ্বংস হতে হতে শেষ পর্যন্ত ৮+বিলিয়ন ইউএস ডলার মুল্যের অস্ত্র তালি-বানের হাতে গিয়ে পৌছেছে। কুফফাররা তাদের গোলামদেরকে কখনোই ভালো কিছু দেয়না, সেটা হোক অস্ত্র কিংবা তাদের দেশে রিফুজি হিসেবে নিয়ে গিয়ে দেওয়া খাদ্য। উভয়টার অবস্থাই একই রকম হয়!

২০২১ সালে আফগানিস্তানে বর্তমান IEA এর সরকার সমস্ত ক্রুসেডার শক্তি ও তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের তৈরি করা আফগান গোলাম সেনাবাহিনী থেকে প্রাপ্ত গনিমতের অস্ত্রের মুল্য ছিলো ৮+বিলিয়ন ইউএস ডলার। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার এলায়েন্সের ফেলে রেখে যাওয়া যুদ্ধাস্ত্রের মুল্য ছিলো ৭.১২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এবং IEA এর সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের মুল্য ও

বিগত ২০ বছর যুদ্ধ করার সময় প্রতিপক্ষ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের অস্ত্র বা দলত্যাগী আফগান সৈন্যদের মাধ্যমে পাওয়া অস্ত্রের মুল্য হবে প্রায় ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে IEA এর সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও তার এলায়েন্স এবং আফগান গোলাম সেনাবাহিনী থেকে প্রাপ্ত গনিমতের অস্ত্রের মুল্য হবে প্রায় ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার। যা আফগানিস্তানের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও তার এলায়েন্সের ব্যায়কৃত অর্থের ১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের সহ অন্যান্য ৫৫টি রাষ্ট্রের জন্য এই ২ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যায় করাটা তেমন কিছুই না। তাছাড়া এই সব রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ। তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতাও বিশাল। এই জোটের মুল রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ারের জন্য এই ব্যায়টা খুব বেশি না। যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যাবহৃত হওয়ায় তারা ডলার ছাপিয়েই এই ব্যায়টা উঠিয়ে নিতে পারবে। খুব একটা মুদ্রাস্ফিতিও ঘটবেনা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে। ইউএস ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা হওয়ার কারনে আফগানিস্তান সহ সারা বিশ্বই এই মুদ্রাস্ফিতির ভার বহন করতে বাধ্য হবে।

যদি সামরিক অস্ত্র-শস্ত্রকে একটি শিল্প খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে এটা বলা যায়, যে শিল্প খাতের কোন ক্রেতা থাকে না সেই শিল্প খাত কখনো বিকশিত হয় না। একটি দেশের অর্থনীতির জন্য একেকটা শিল্পখাত একেটা স্তম্ভ। কোন দেশে যদি কাপড়ের তেমন কোন ক্রেতাই না থাকে তাহলে সে দেশে কখনোই বস্ত্র শিল্পখাত শক্তিশালী হবে না। একজন ক্রেতা কাপড় ক্রয় করে কিছুদিন পরে এরপর ফেলে দেয়। যদি একজন ক্রেতা কাপড় ফেলে না দেয় পড়তেই থাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত, তাহলেও সেই দেশে বস্ত্র শিল্পখাত শক্তিশালী হবে না এবং মানুষের জীবন ধারণের মানেরও তেমন উন্নতি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাবে দেশটি শক্তিশালী হবে না। একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হতে হলে তার জনগণকে বিলাসি করে তুলতে হবে। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন পন্যের ভোক্তা বানাতে হবে।

ঠিক তেমনি ভাবে একটি দেশের সামরিক বাহিনী যদি কিছুদিন পরপর অস্ত্র ক্রয় না করে অথবা একই অস্ত্র দীর্ঘদিন সার্ভিসে রাখে তাহলে ঐ দেশেও সামরিক শিল্পখাত শক্তিশালী হবে না। আবার একটি অস্ত্রের নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ আছে এই মেয়াদের পর সেগুলো আর ব্যাবহার করা হয় না। যদি যুদ্ধ করে কোন দেশে হামলা করে এই অস্ত্রগুলো ব্যাবহার না করা হয় তাহলেও একটা সময় গিয়ে এগুলো বাতিল করে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কথা সমানই হয়ে যাচ্ছে। এই অস্ত্রগুলো যুদ্ধে ক্ষেত্রে

ব্যাবহারের কারনে অতিরিক্ত কোন ব্যায় হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাত একটি বিশাল শিল্পখাত হিসেবে দাড়িয়ে আছে। এই খাতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি-রুজি জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র যদি ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্র ক্রয় না করে তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষের আয় বন্ধ হয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক খাত একটি বিশাল শিল্প খাতে পরিনত হওয়ার এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর অধিকারী হওয়ার পিছনে এটাই কারন যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীগুলো কোন যুদ্ধাস্ত্রই খুব বেশি দিন ব্যাবহার করে না এবং প্রচুর পরিমাণে নতুন নতুন অস্ত্র ক্রয় করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটা সুবিধার দিক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নিজের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক ইকুইপমেন্টের চাহিদার ৯০% নিজেরাই মিটায়। ১০% চাহিদা অন্যান্য দেশ থেকে মিটালেও এই চাহিদা মিটানো বাবদ যত অর্থ ব্যায় হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মুল্যের অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক ইকুইপমেন্ট বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে আয় করে। সেই রপ্তানিকৃত রাষ্ট্রগুলোর মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক ইকুইপমেন্ট আমদানিকৃত রাষ্ট্রগুলোও থাকে। তাদের থেকে যত অর্থের ইকুইপমেন্ট আমদানি করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সেই দেশগুলোতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও ইকুইপমেন্ট রপ্তানি করে অর্থ আয় করে।

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যত অস্ত্র ব্যাবহার করার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে তার ৯৫% অর্থই ঘুরেফিরে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোর পকেটে গেছে। এবং অন্যান্য দেশগুলোও আফগানিস্তানে ব্যাবহার করার জন্য যত অস্ত্র ক্রয় করেছে সেগুলোর বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোর পকেটে গেছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের কোন লস নেই। বরং লাভ হয়েছে।

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যেই অর্থ ব্যয় হয়েছে তার ৯০% অর্থই ঘুরেফিরে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের পকেটে গেছে। একটি যুদ্ধে মুল ব্যায় হচ্ছে, সেনা সদস্যদের বেতন ভাতা ও লজিস্টিক সাপোর্ট এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর ব্যায়। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যেই সব সৈন্যরা যুদ্ধে করেছে তারা যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক। তাদেরকে বেতন ভাতা দেওয়ার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের লোকজনই উপকৃত হয়েছে। ঘুরেফিরে সেই অর্থ যুক্তরাষ্ট্রেই গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যেই সব সৈন্যদেরকে মোতায়েন করেছে তারা নতুন কোন সৈন্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত বাহিনীরই অংশ। তারা যদি আফগানিস্তানে

নাও আসতো তাহলেও তারা যুক্তরাষ্ট্রে বসেই বেতন-ভাতা পেতো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কোন ব্যায় সৃষ্টি হয়নি। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আফগানিস্তানে আক্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে সৈন্য নিযুক্ত করতে হয়েছে। যদি এমনটা হতো তাহলে হয়তো কিছুটা বলা যেত যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে ব্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বরং আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার দ্বারা সৈন্যরা যেমন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তেমনিভাবে আফগানিস্তান থেকে কিছু খনিজ সম্পদও চুরি করে নিতে পেরেছে। এটাই যুক্তরাষ্ট্রের মুল লাভ। এই চুরি করে নেওয়া খনিজ সম্পদের অর্থমূল্য কয়েক বিলিয়ন ইউএস ডলার।

যুদ্ধে শত্রুর হামলায় একটি দেশে বাড়িঘর, শিল্প কল-কারখানা সহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা শত্রুর হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি দেশের সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার কলাপ্স করে। যুদ্ধে সৈন্য ও সাধারণ জনগণ আহত ও নিহত হয়। আহতদের চিকিৎসা ব্যায় ও বাকী জীবন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যায় মিটাতে গিয়ে রাষ্ট্র হিমশিম খায় এবং সৈন্য ও জনগণ নিহত হওয়ার মাধ্যমে তার মুল শক্তিই শেষ হয়ে যায়। একটি রাষ্ট্রের মুল উপাদানই হচ্ছে জনগণ। একটি রাষ্ট্রের মুল লক্ষ্যই থাকে তার জনগণকে নিরাপদ রাখা ওজনগণের জন্য সমস্ত আইন, অনুশাসন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মানুষই যদি বেঁচে না থাকে তাহলে আর সেই রাষ্ট্রেরই-বা কি মুল্য রইলো!মানুষ ছাড়া একটি বিশাল ভূখণ্ডকে কেউ কখনো তাকে রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে না এবং মানুষ ছাড়া কখনোই বিশাল ভূখণ্ড দিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না।

যুক্তরাষ্ট্রের বহু দুর থেকে এসে আক্রমণ করার কারনে এবং আফগানিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রের ভুমিতে গিয়ে পাল্টা হামলা চালানোর মতো সক্ষমতা না থাকার কারনে যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্ট্রাকচারই ধ্বংস হয়নি। সব কিছু বহল তবিয়তেই ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের মুল ক্ষতিটা হয়েছে তার আহত ও নিহত সৈন্যদের দ্বারা। তাছাড়া একটি রাষ্ট্রের যতই স্ট্রাকচার ধ্বংস হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষতি হোক সেটা একটা না একটা সময় পুশিয়ে নেওয়াই যায়। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিনিময়েও একজন মানুষের জীবন ফিরিয়ে পাওয়া যাবেনা। আহত হয়ে একজন মানুষ পঙ্গুত্বের মতো অভিশাপ বরণ করা কেউই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনোই আর ফিরে পাবে না। যদিও কৃত্রিমভাবে বহু অর্থ খরচ করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে কিছু কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাগানো যায়। তবুও সেগুলো কখনো প্রাকৃতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো নয়। সেগুলো দিয়ে প্রাকৃতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো সব কাজও করা যায় না। উন্নত চিকিৎসা ব্যাবস্থা ছাড়া এই ধরনের

কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থাপন করাও সম্ভব না।

মুল কথা হচ্ছে, কোন রাষ্ট্র যদি তার শত্রু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষতি করতে চায় তাহলে যতটুকু পারা যায় ততটুকু পরিমাণে শত্রু রাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে হত্যা বা পঙ্গু করতে হবে। এতে করে শত্রু দীর্ঘমেয়াদে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে যাবে এবং মানসিক ভাবেও শত্রু দেশের জনগণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা আর কখনোই সেই রাষ্ট্র অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ চাইবে না। ফলে সেই রাষ্ট্রটি কোন রাষ্ট্রের উপরই কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। ঐ রাষ্ট্রের জনগণকে হত্যাকারী রাষ্ট্রটির উপর কোন ভাবেই ঐ রাষ্ট্রটি কোন ধরনের চাপও প্রয়োগ করতে পারবে না এবং কোন ধরনের হামলাও করে প্রতিশোধও নিতে পারবে না। সর্বদাই ঐ রাষ্ট্রটি তার দেশের জনগণকে হত্যাকারী রাষ্ট্রটির সামনে মিউ মিউ করবো। মেরুদণ্ড সোজা করে দাড়াতে পারবে না।

চল্লিশতম অধ্যায়

(ঐতিহাসিক সময়ে যুদ্ধে হাতির ব্যাবহার ও বর্তমানের আধুনিক যুদ্ধ হাতি সম্পর্কে)

একটা সময় ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধে হাতী ব্যাবহার করা হতো। যুদ্ধে হাতী ব্যাবহারের বিষয়টি ভারতীয় উপমহাদেশের সাথেই বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলো। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধে তেমন একটা হাতি ব্যাবহার করা হতো না। এর সম্ভব্য কারন ছিলো ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে হাতীর অপ্রতুলতা এবং হাতী পালনের ব্যায়। আফ্রিকা থেকে কিছু হাতি ইউরোপে নেওয়া হলেও তেমন একটা যুদ্ধে ব্যাবহার করা হয়নি। এর কারন ছিলো আফ্রিকান হাতি আকৃতিতে ছোট ছিলো ভারতীয় হাতির চেয়ে। যা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয়। আফ্রিকাতেও হাতির আকার ও ব্যায়ের কারনে যুদ্ধে হাতী ব্যাবহার করা হতো না। ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধে হাতী ছিলো একটি গেম চেঞ্জার হাতিয়ার। এই হাতীর কারনেই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজপুতরা বিদেশীদের সাথে যুদ্ধে অনেক সুবিধা পেতো প্রতিপক্ষের তুলনায়।

বহু বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার সত্বেও শুধু যুদ্ধহাতীর কারনে পরাজিত হতো। কিন্তু মানুষের যে চিরন্তন স্বভাব যেখানে ঠেকে যায় সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই আবার শুরু করে। ঠিক সেভাবেই সময়ের সাথে সাথে যুদ্ধে হাতীকে মোকাবিলার কৌশল তৈরি হতে থাকে। বর্তমান সময়ে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে সেই যুদ্ধহাতির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে, যুদ্ধের অন্যান্য হাতিয়ারের তুলনায় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের আকৃতি ও ব্যায়ের দিক বিবেচনায়। ভারতে হাতিকে যুদ্ধের সময় বিশেষ ধরনের লোহার বর্ম ও লাল মোটা কম্বল জাতীয় পোশাক দারা আবৃত করা হতো সেন্স ডিফেন্সের জন্য। হাতির মাথার দিকটাতে লোহার বর্ম পরানো হতো। আর দেহের বাকি অংশে মোটা পোশাক দিয়ে দেওয়া হতো। পোশাকগুলো এতটাই মোটা হতো যে, কোন তীর, বল্লম বা বর্শা ছুড়ে মারলে ঐ পোশাক ভেদে করে হাতির দেহে আঘাত হানতো না। ছুরি ও বর্শা দিয়ে খুব জোরে একই জায়গায় কয়েকবার আঘাত করলে

হাতির দেহে আঘাত হানতো। কিন্তু সেই সুযোগ সাধারনত পাওয়া যেত না।

হাতির পিঠে এক ধরনের দুর্গের মতো ছোট আকৃতির মোটা কাঠের বা স্টিল, লোহার একটি ঘর বসানো হতো। সেই ঘরে একজন বর্শা ধারনকারি শুটার আরেকজন তীরান্দাজ থাকতো। কখনো ঐ ঘরগুলোতে পাঁচ থেকে ছয়জন সৈন্য বা এর চেয়ে বেশিও থাকতো। প্রয়োজন অনুপাতে ঐ ঘরগুলোতে সৈন্য রাখা হতো। ঘরগুলো এমন সিস্টেমের হতো যে প্রতি পক্ষের তীর থেকে ভেতরে অবস্থানকারীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতো। ঐ ঘরে বসেই তীরান্দাজ প্রতি পক্ষের উপর তীর নিক্ষেপ করতো এবং শুটার যুদ্ধ চালিয়ে যেত। আর ঐ ঘরের সামনে হাতির ঘাড়ের উপর একজন ড্রাইভার থাকতো। এক্ষেত্রে ড্রাইভার কিছুটা অনিরাপদ থাকতো। তবে প্রতিপক্ষের তীর থেকে বাচার জন্য ঢাল ও আক্রমণ করার জন্য তলোয়ার থাকতো। হাতির শুড়ে বিশেষ ধরনের ছুরি বা ধারালো কোন ছোট অস্ত্র আটকে দেওয়া হতো। যাতে হাতি নিজেও প্রতিপক্ষের উপর হামলা করতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের যুদ্ধের হাতিকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এগুলোর মাঝে বিশেষ ভাবে উল্ল্যেখ যোগ্য প্রশিক্ষণ হচ্ছে, হাতির উপরে থাকা ড্রাইভারের আদেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করা। শত্রু মিত্র পার্থক্য করতে পারা। প্রতিপক্ষের হাতির সাথে দাত দিয়ে লড়াই করা। হাতির শুঁড়ে আটকে দেওয়া অস্ত্র ব্যাবহার করে শত্রু পক্ষের হাতি ও সৈন্যকে হত্যা করা। প্রতিপক্ষের হাতি ও সৈন্যর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। শত্রু পক্ষের পাতা ফাঁদ থেকে রক্ষা নিজেকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

ত্বরাইনের প্রথম যুদ্ধে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি রাজপুতদের বিরুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারন ছিলো রাজপুতদের যুদ্ধে ব্যাবহৃত হাতি। ত্বরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে এই হাতিদের মোকাবিলার উপায় বের করেন। এই উপায়টি ছিলো দক্ষ তীরান্দাজদের দ্বারা হাতির চোখকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা। হাতির বিশাল আকৃতির চোখকে লক্ষ্য করা কোন দক্ষ তীরান্দাজের জন্য কঠিন কিছু নয়। এই তীর নিক্ষেপের কারনে হাতি অন্ধ হয়ে যেত এবং এর তীব্র বেদনার কারনে হাতি তার উপরে থাকা ব্যাক্তিদেরকে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতো। এক্ষেত্রে হাতি তার নিজের বাহিনীর সৈন্যদেরকেই পায়ের তলায় পিষ্ট করে সেনাবাহিনীর কাতারের পিছনে চলে যেত। এতে বহু সৈন্য আহত নিহত হতো।

ভারতে কুতবুদ্দিন আইবেক রাজপুতদের হাতিকে মোকাবিলার জন্য নতুন একটি সিস্টেম তৈরি করেছিলো। প্রতিটি হাতির জন্য পাঁচ জন সৈন্য বরাদ্দ করা হতো।

তিনজন সৈন্য হাতির উপরে থাকা তিন জন সৈন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। আর বাকি দুইজন হাতির একেবারে সামনে চলে যেত হাতিকে আঘাত করতে। দুইজন সৈন্য হাতির শুঁড়ের দুই পাশে দাড়াতো। হাতি যখন একজন সৈন্যকে শুঁড় দিয়ে আঘাত করতে যেত ঠিক তখনই অপর সৈন্য হাতির শুঁড়ে আঘাত করে শুঁড় কেটে ফেলতো। হাতির শুঁড়ে সেন্ফ ডিফেন্সের জন্য কোন ধরনের বর্ম বা মোটা পোশাক পড়ানো হতো না শুঁড় দিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করা সুবিধার্থে।

ইউরোপের হাতি যুদ্ধের ময়দানে জায়গা করে নিতে না পারার অন্যতম একটি কারন ছিলো গ্রীকরা চোখের বাহিরে হাতির সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটি খুজে পেয়েছিলো। হাতির চোখের পরে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হচ্ছে, পা। বিশেষ করে হাতির পায়ের প্যাড। হাতির পায়ের প্যাড এতটাই নরম যে, হাতি কখনো কোন কাটা জাতীয় বৃক্ষের নিচ দিয়ে যাতায়াত করে না তার পায়ে কাটা ঢুকে যাওয়ার ভয়ে। খেয়াল করলেই দেখবেন, হাতির বিশাল দেহ অনুযায়ী হাতি হাটলে অন্যান্য প্রানীর তুলনায় শব্দ অনেক কম হয়। হাতির পায়ের প্যাড বিড়ালের পায়ের প্যাডের মতোই নরম। বিড়ালের পায়ের প্যাড অনেক নরম হওয়ার কারনে বিড়াল হাটলে কোন শব্দ হয় না। গ্রীকরা যুদ্ধে হাতীর এই পায়ের প্যাডেই বেশিরভাগ সময় আঘাত করতো। আবার কখনো পায়ের অন্যান্য অংশেও আঘাত করতো। এতে হাতি বসে যেত আর দাড়াতো না। হাতির পায়ের উরু থেকে নিয়ে প্যাড পর্যন্ত যেকোন জায়গায় আঘাত করলেই হাতি দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ে।

হাতিকে যুদ্ধ মোকাবিলার আরেকটি সিস্টেম ছিলো, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর। একটি হাতিকে কাবু করতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তিন-চারটা কুকুর যথেষ্ট ছিলো। হাতি কুকুরের আক্রমণ বিরক্তি হয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কুকুরকে ধাওয়া করতে চলে যেত।

প্রতি পক্ষের হাতিকে মোকাবিলার জন্য কখনো হাতি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসার পথে বা ময়দানে বিশাল বিশাল গর্ত খনন করে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। এতে করে ঐ সব হাতি গর্তে পড়ে যেত সহজে আর উঠতে পারতো না। প্রতিপক্ষের আক্রমণের কারনে যুদ্ধ না করে হাতিকে গর্ত থেকে উত্তলোন করাও সম্ভব হতো না।

আবার কখনো বিশাল আকারে যুদ্ধের ময়দানে পরিখা খনন করা হতো। পরীক্ষা গুলো একটি নির্দিষ্ট মাপের হতো যাতে ঘোড়া লাফ দিয়ে পাড় হয়ে যেতে পারে কিন্তু হাতি যেন পরিখা পাড় হয়ে আসতে না পারে।

কখনো কখনো হাতির জন্য দড়ি দিয়ে ফাঁদ পাতা হতো। দুই পাশে কোন গাছ বা কোন কিছু মাটিতে গেথে দিয়ে মাটি থেকে নির্দিষ্ট একটি উচ্চতায়(এক ফিট বা দুই ফিট উচ্চতায়)দড়ি টানটান করে বেঁধে দেওয়া হতো। ঐ উচ্চতায় থাকা দড়ি ঘোড়া সহজেই লাফ দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারলেও হাতি পারতো না। যেতে চাইলেই দড়িতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যেত।

বড় হাতি কখনো প্রতিপক্ষের কোন বাচ্চা হাতির সাথে লড়াই করতে চাইতো না। প্রতিপক্ষের যদি কোন বড় হাতি বা বাচ্চা হাতি না থাকতো তাহলে ঘোড়াকে এমনভাবে হাতির মতো যুদ্ধে পোশাক পরানো হতো যাতে প্রতিপক্ষের হাতিগুলো মনে করে এটি একটি বাচ্চা হাতি যাকে যুদ্ধে ময়দানে নিয়ে আসা হয়েছে। বড় হাতিগুলো কোনভাবেই প্রতিপক্ষের বাচ্চা হাতির সাথে লড়াই করতে চাইতো না। হাতির উপর থাকা ড্রাইভার বেশি কোন প্রেশার দিলে হাতিগুলো যুদ্ধের ময়দানেই বসে যেত বা যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে চলে যেত। এখানে খেয়াল করার মতো একটি বিষয় হচ্ছে, বড় হাতিরা তাদের প্রতিপক্ষ হলেও বাচ্চা হাতিদেরকে হত্যা করতে চাইতো না কোন ভাবেই। হয়তো হাতিরা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে কিংবা বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা থেকেই এমনটা করতো। অথচ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ তার প্রতিপক্ষের বাচ্চাদেরকেই আগে হত্যা করে। মানুষের মাঝে যদি হাতির মতো বাচ্চাদের প্রতি সামান্য ভালবাসা বা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি সামান্য চিন্তাটুকুও থাকতো!

যুদ্ধের ময়দান থেকে হাতিকে তাড়ানোর জন্য কখনো কখনো প্রচন্ড জোরে শব্দের সৃষ্টি করতো প্রতি পক্ষ। এতে হাতি ভয় পেয়ে যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেত।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় দাহিরের যুদ্ধ হাতিকে ময়দান থেকে তাড়ানোর জন্য তীরের পিছনে আগুন লাগিয়ে হাতির উপর ঐ তীর নিক্ষেপ করে। এতে হাতি ভয় পেয়ে দাহিরের সৈন্যদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়।

তৈমুর লংয়ের ভারতের দিল্লি আক্রমণের সময় তুঘলকি সৈন্যদের যুদ্ধ হাতিকে ভয় দেখাতে কাঠে আগুন লাগিয়ে ঐ জ্বলন্ত কাঠ উটের পিঠে বেঁধে দিয়ে প্রতিপক্ষের হাতিগুলোর সামনে পাঠায়। এতে হাতিগুলো ভয় পেয়ে তুঘলকি সৈন্যদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে পালিয়ে যায়।

কখনো যুদ্ধের ময়দানে বিশাল আকৃতির আগুন জালনো হতো এবং প্রচন্ড ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হতো। হাতি আগুনের ভয়ে পালিয়ে যেত আর ধোয়ার কারনে হাতি ও সৈন্যদের চোখ অন্ধ হওয়ার পর্যায়ে চলে যেত। হাতির চোখে সমস্যা হওয়ার কারনে হাতি নিজেদের সৈন্যদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করেই পালিয়ে যেত।

বিস্ফোরকের প্রচলন হওয়ার পর কখনো কখনো যুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হতো এতে অনেক সৈন্য ও হাতি হতাহত হতো। কিছু হাতি ভয়ে মাটিতে পড়ে যেত। কিছু কিছু হাতি ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিজের সৈন্যদেরকেই পিষ্ট করে যেত।

আগামী অধ্যায়ে বর্তমান যুগের যুদ্ধ হাতি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলার কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ!

একচল্লিশতম অধ্যায়

(পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধাস্ত্র নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলা করার কৌশল সম্পর্কে)

ইতিহাসে ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার HMS Ben-my-Chree একমাত্র এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যা শত্রুর হামলায় ডুবে গেছে। ১৯১৭ সালের ১১ জানুয়ারি গ্যালিপলির যুদ্ধে দার্দেনেলিস প্রনালিতে মুস্তফা আরক্রগুল আকার নামে একজন উসমানীয় সৈন্য এই ব্রিটিশ ক্যারিয়ারটিকে লক্ষ্য করে একটি মাত্র কামানের গোলা ফায়ার করে। এতেই এটি ডুবে যায়। এটিকে পাঠানো হয়েছিলো ফ্রান্সের অনুরোধে, এয়ারসাপোর্টের জন্য। এটি পাঠানোর মাত্র দুই ঘন্টার মাঝেই ডুবে যায়। এর ডিসপ্লেসমেন্ট ছিলো ৪হাজার টন। তৎকালিন সময়ে এই ডিসপ্লেসমেন্ট মোটেই কম ছিলোনা। যদিও বর্তমানে এটি একটি ফ্রিগেটের ডিসপ্লেসমেন্ট। আবার তৎকালিন সময়ে কামানগুলোও ছিলো অনুন্নত। তার মাঝে উসমানীয় বাহিনী ছিলো ইউরোপের তুলনায় সামরিক শক্তিতে আরো পিছিয়ে। একটি বিষয় খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, ১৮ শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, তখন থেকেই উসমানীয় বাহিনী তেমন কোন নতুন এলাকা জয় করতে পারেনি বরং দখলে থাকা জায়গাগুলোও আস্তে আস্তে হারাতে শুরু করেছে। এটিই প্রমাণ করে যে, ইউরোপের উত্থানের সাথে সমানুপাতিক হারে উসমানীয় সালতানাত পিছিয়ে পড়েছিলো।

সাধারনত একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে সার্পোট শিপ সহকারে মোট ৮-১২ টি যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন থাকে। সাধারণত সেই ব্যাটেল গ্রুপে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, দুইটা ক্রুজার বা হেভি ডেস্ট্রয়ার, দুইটা ডেস্ট্রয়ার, দুইটা ফ্রিগেট, দুইটা সাবমেরিন, একটা সাপোর্ট ভেসেল ও কখনো কখনো একটি বা দুইটি কর্ভেটও থাকে। এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আরেকটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক

ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করা।

যদি পাল্টা আরেকটি এয়ারক্রাফট ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করার সক্ষমতা না থাকে তবে শত্রুর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলার জন্য অন্যতম একটি ট্যাকটিক্স হচ্ছে সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করা। যেই সব রাষ্ট্রগুলোর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ আছে এবং অর্থ দিয়ে ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, কর্ভেট ইত্যাদি শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করার মতো ক্ষমতা আছে তারা কেবল এই ধরনের সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ তৈরি করতে পারে। একটি সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে সাধারনত ৪টি সাবমেরিন এবং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের মতোই ৬-৮ টি বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ থাকে। ব্যাটেল গ্রুপে ব্যাবহৃত সাবমেরিনের নূন্যতম ডিসপ্লেসমেন্ট হতে হবে সার্ফেসড অবস্থায় দুই হাজার টন। এই ধরনের সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ দিয়ে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের মতোই যেকোনো গভীর সমুদ্রেও যুদ্ধ করা যাবে।

যাদের সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের জন্য বিশাল ফ্লিট তৈরী করার সক্ষমতা না থাকে তাদের জন্য এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের মাঝে অবস্থান করা শত্রুর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক মিজেট সাবমেরিন নির্মান করা। অবশ্য এই মিজেট সাবমেরিনগুলো কোন গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না। গভীর সমুদ্র ধরা হয় একটি রাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চল থেকে নিয়ে ২০০ বা ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের পরের সমুদ্র সীমানাকে। এই মিজেট সাবমেরিন গুলো দুইটি ৩২৪ মিঃমিঃ এর লাইট ওয়েট টর্পেডো বা ৫৩৩ মিঃমিঃ এর দুইটি হেভি ওয়েট টর্পেডো বহন করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের নেভাল মাইনও বহন করতে পারে। এই ধরনের সাবমেরিনের ব্যাপক টর্পেডো এ্যাটাকএয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আরেকটি ভালো উপায় হচ্ছে, ছোট ছোট আর্মাড বোটের সোয়ার্ম এ্যাটাক। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে এ্যাটাককারী ছোট বোটগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট ও কর্ভেটের ডেকে থাকা হেলিকপ্টার। ছোট ছোট বোট ডুবাতে এই হেলিকপ্টারগুলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে গাইডেড ওয়েপনস দিয়ে আঘাত করার ক্ষেত্রে আরেকটা ওয়েপনস যুদ্ধ জাহাজে থাকা ইলেকট্রনিক জ্যামার ও আন গাইডেড ওয়েপনসের জন্য C-RAM সিস্টেম সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে উঠতে পারে। ইলেক্ট্রনিক

জ্যামারের জন্য এর জন্য ঐ বোটগুলোতে আন-গাইডেড ওয়েপনস ব্যাবহার করাটা সবচেয়ে ভালো। ঐ বোটগুলোতে ১২.৭ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ৩০ মিঃমিঃ এর বিভিন্ন ধরনের চেইন গান বা এন্টি এয়ারক্রাফট গান ব্যাবহার করা যেতে পারে। যা ম্যাক্সিমাম দুই নটিক্যাল মাইল থেকেই ফায়ার করা যাবে। দুর থেকে নির্দিষ্ট টার্গেটে ফায়ারের সুবিদার্থে এতে স্কোপ বা অন্য কোন ইকুইপমেন্টও সেটা করা যেতে পারে। এই সব গান দ্বারা যেমন হেলিকপ্টারকে ধ্বংস করা যাবে জাহাজের ডেকে থাকা অবস্থায়ই। এবং জাহাজের ইলেক্ট্রনিক জ্যামার সহ অন্যান্য অস্ত্রও শস্ত্র ধ্বংস করে জাহাজকে অকেজো করে দেওয়া যাবে। কোন ইলেকট্রোনিক জ্যামার বা C-RAM সিস্টেম দিয়েই চেইনগান বা এন্টি এয়ারক্রাফট গানের হামলা ঠেকানো সম্ভব না।

গান হামলার মাধ্যমে সর্ব প্রথম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের ডেকে ফ্লাইয়ের জন্য রেডি থাকা যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার ধ্বংস করতে হবে। এরপরে যুদ্ধ জাহাজের ডেকে থাকা হেলিকপ্টার ধ্বংস করতে হবে। যাতে করে কোন যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার আকাশে উড়তে না পারে। ইলেক্ট্রনিক জ্যামার সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেলে এরপর আক্রমণকারীর বোটগুলো থেকে এটিজিএম ফায়ার করে যুদ্ধ জাহাজের C-RAM সিস্টেম রাডার, নেভাল গান এবং যুদ্ধ জাহাজে থাকা অন্যান্য সমস্ত মেশিনগান, চেইনগান বা ক্যানন সহ অন্যান্য যত সেন্সর ও আর্মামেন্ট আছে সেগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। যাতে করে জাহাজগুলো পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যায়। এরপরে ছোট ছোট বোট গুলোতে করে আসা মেরিন সৈন্যদের স্কোয়াডগুলো যুদ্ধ জাহাজগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারবে। জ্যামার সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেলে এটিজিএমের টার্গেটে আঘাত হানার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকবে না। ব্যাপক হারে এটিজিএমের আক্রমণ ব্যাটেল গ্রুপের যুদ্ধ জাহাজগুলোতে থাকা কোন C-RAM সিস্টেম দিয়েই সম্পূর্ণ ঠেকানো সম্ভব না। যেগুলো ঠেকাতে পারবে না সেই এটিজিএমগুলোই C-RAM সিস্টেম সহ অন্যান্য সমস্ত অস্ত্র ও সেন্সরগুলোর উপর আঘাত হেনে ধ্বংস করে দিবে। সার্ফেস টু সার্ফেস রোলে একটি এটিজিএমের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ হয় আট কিলোমিটার পর্যন্ত।

ইলেক্ট্রনিক জ্যামার ধ্বংস করার পরে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও যুদ্ধ জাহাজের ডেকে থাকা উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত করে রাখা অথবা আকাশে উড়ন্ত হেলিকপ্টার ও যুদ্ধ ধ্বংস করার জন্য ম্যানপ্যাড ফায়ার করা যেতে পারে। একটি ম্যানপ্যাডের সর্বোচ্চ অল্টিটিউড হয় ৫ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ হয় ৮ কিলোমিটার। একটি হেলিকপ্টার ম্যাক্সিমাম ৬ কিলোমিটার অল্টিটিউডে উড়তে পারে। তবে এ্যাটাকের সময় অল্টিটিউড ২ কিলোমিটারের নিচে থাকে।

বোটগুলোতে ৪০মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ম্যাক্সিমাম ১২৫মিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রিকওয়েললেস রাইফেল, ৪০ মিঃমিঃ থেকে নিয়ে ১২৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত আরপিজি, ৩০-৪০ মিঃমিঃ এর চেইন গ্রেনেড ও ১২৫ মিঃমিঃপর্যন্ত এন্টি ট্যাংক আন-গাইডেড মিসাইল ইনস্টল করা যেতে পারে এবং কোন বোটে লেজার ওয়েপনসও ইনস্টল করা যেতে পারে।

মাইন সুইপার ভেসেলের সাহায্য ব্যাপক নেভাল মাইন পাতলে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের জন্য এই সব নেভাল মাইনগুলো বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে রিমোট কন্ট্রোল বা তার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোর্টেবল গাইডেড নেভাল মাইন আছে। সেগুলোকে ছোট ছোট বোট থেকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের কাছাকাছিতে বোটগুলো নিয়ে এসে ঐ সব নেভাল মাইনগুলো দিয়ে ব্যাপক হামলা চালানোর মাধ্যমেও ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। এই নেভাল মাইনগুলো রিমোট কন্ট্রোল বা তারে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারনে টর্পেডোর কোন ডেকয় সিস্টেম দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। রিমোট কন্ট্রোল আনম্যান্ড সুইসাইড বোট দিয়ে ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করলেও ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ অকেজো হয়ে যেতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া একটি ট্যাংক বোটের ডিজাইন করেছে। বোটটিতে বর্তমানে মেইন গান হিসেবে ১০৫ মিঃমিঃ এর গান ইনস্টল করা হয়েছে। এটাতে চাইলে ট্যাংকের ১২০ মিঃমিঃ এর ন্যাটো স্ট্যান্ডার্ড মেইন গান বা চীন, রাশিয়ার ব্যাবহৃত ১২৫ মিঃমিঃ এর মেইন গান ইনস্টল করা যাবে। এতে করে ১২০মিঃমিঃ বা ১২৫ মিঃমিঃ এর গান লাঞ্চড এন্টি ট্যাংক মিসাইলও ফায়ার করা যাবে। এটাতে সেকেন্ডারি আর্মামেন্ট হিসেবে আছে দুইটি ১২.৭ মিঃমিঃ এর মেশিন গান। এই গান দুইটার মধ্যে একটা রিমোট কন্ট্রোল আরেকটা ম্যানুয়াল। যুদ্ধ কালিন সময়ে রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গানের জায়গায় প্রয়োজন হলে ৩০ মিঃমিঃ এর অটোক্যানন এবং নতুন করে আরো একটি ২০মিঃমিঃ এর চেইনগান ও ২৩মিঃমিঃ এর এন্টি এয়ারক্রাফট গানও ইনস্টল করা যাবে যুদ্ধ কালীন সময়ের জন্য। এই ট্যাংক বোটটিতে সেল্ফ ডিফেন্সের জন্য চাইলে ট্যাংকে ব্যাবহৃত একটিভ প্রটেকশন সিস্টেম সহ অত্যাধুনিক একটি ট্যাংকের সমস্ত প্রযুক্তি ইনস্টল করা যাবে।

ইন্দোনেশিয়ার এই ট্যাংক বোটগুলো বর্তমানে ৫ জন ক্রু বাদে ২০ জন সৈন্য একসাথে পরিবহন করতে পারে। এটার একটি এপিসি ভার্সন আছে। সেটাতে ৫ জন ক্রু বাদে

৬০ জন্য সৈন্য পরিবহন করা যায়। এপিসি ভার্সনের মেইন আর্মামেন্ট হচ্ছে ৩০ মিঃমিঃ এর একটি অটোক্যানন। যুদ্ধকালীন সময়ে ট্যাংক বোটে আর্মামেন্ট বাড়ালে সৈন্য বহন করার ক্যাপাসিটি কমে যাবে। তখন হয়তো ৫ জন ক্রু বাদে সর্বোচ্চ হলে মোট ৭-১০ জন মেরিন সৈন্যের একটি স্কোয়াড বহন করতে পারবে। এটার ম্যাক্সিমাম গতি ঘন্টায় ৫০ নটিক্যাল মাইল। এই ধরনের ট্যাংক বোটের ব্যাপক আক্রমণে যেকোনো এয়ারক্রাফট ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ ধরাশায়ী হয়ে যেতে পারে।

১২২ মিঃমিঃ এর গাইডেড MLRS বাহী বোট দিয়েও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকেও অকেজো করে দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হতে পারে তুরস্কের তৈরী TRG-122 guided MLRS। এটার প্রতিটি মিসাইলের ওজন ৭২ কেজি। ছোট ছোট হাই স্পিড বোটগুলোর প্রতিটাতে এই ধরনের আটটি লাঞ্চার টিউবের একটি MLRS ইনস্টল করা যাবে। ১২২ মিঃমিঃ এর MLRS গাইডেড না হলে চলমান বোট থেকে চলমান টার্গেটে আঘাত হানাটা কঠিন ব্যাপার। আন-গাইডেড MLRS হলে দেখা যাবে যে, নিজেদের মিসাইল নিজেদের বোটেই হয়তো আঘাত হানছে। MLRS এর ব্যাপক ফায়ার কোন গান বেসড বা মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম দিয়ে একই সাথে সর্বোচ্চ হলে ৫০% এর বেশি ইন্টারসেপ্ট করা সম্ভব না। বাকিগুলো ঠিকই টার্গেটে আঘাত হানবে। এতেই ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ সম্পূর্ণ ড্যামেজ হয়ে যাবে।

৩২৪ মিঃমিঃ লাইট ওয়েট টর্পেডোবাহী বোট হতে পারে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ মোকাবিলায় অন্যতম একটি ট্যাকটিক্স। এই ধরনের একটি বোট এক সাথে দুইটি লাইট ওয়েট টর্পেডো বহন করতে পারে।

ছোট ছোট ভার্টিক্যালি টেকঅফ ও ল্যান্ডিং সিস্টেমের মাল্টিরোল মাল্টিরোটর ড্রোনে গাইডেড মিনিয়েচার মিসাইল, রকেট ও মেশিন গান, গ্রেনেড, ১২০ মিঃমিঃ এর মর্টার বোমা, মলোটভ ককটেল ইত্যাদি ড্রোন ইনস্টল করে ছোট ছোট বোট গুলো থেকে অপারেট করার মাধ্যমে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের যুদ্ধ জাহাজগুলোর উপর হামলা করা যেতে পারে। এতে অন্তত ডেকে থাকা এয়ারক্রাফটগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ড্রোনগুলো দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ থাকা কোন এম্যুনেশন বা বিস্ফোরক জাতীয় কোন কিছুতে হামলা করা যায় তাহলে সেগুলোর বিস্ফোরনেই যুদ্ধ জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিনে সুইসাইড ড্রোন লাঞ্চ করার জন্য মাল্টিপল লাঞ্চার ইনস্টল

করা যেতে পারে। চীন ইতিমধ্যে এই ধরনের মাল্টিপল সুইসাইড ড্রোন লাঞ্চার সিস্টেম তৈরি করেছে। দ্যা গার্ডিয়ানের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ জাহাজে মাল্টিপল লাঞ্চার ভিত্তিক সুইসাইড ড্রোন অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠবে। সাবমেরিনও সার্ফেসে উঠে তারপর মাল্টিপল লাঞ্চার থেকে সুইসাইড ড্রোন লাঞ্চ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে সাবমেরিন সাবমার্জড অবস্থায় রেখেই সাবমেরিন থেকে ড্রোন লাঞ্চের পরীক্ষা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে ড্রোনটি সাবমেরিন লাঞ্চড মিসাইলের মতোই লাঞ্চ করা হয় এবং এন্টেনার মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে। এটা সফল হলে বলা যায়, ভবিষ্যতে সাবমেরিন সাবমার্জড অবস্থায় রেখেই সাবমেরিন থেকে সুইসাইড ড্রোন লাঞ্চ করা যাবে। ভবিষ্যতে লং রেঞ্জের সাবমেরিন লাঞ্চড সুইসাইড ড্রোন এন্টেনার মাধ্যমেই সাবমেরিন ও স্যাটেলাইটের সাথে কানক্টেড থাকবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো পরীক্ষাটি মাল্টিপল লাঞ্চার ভিত্তিক নয় বরং সিঙ্গেল লাঞ্চার ভিত্তিক ছিলো। ভবিষ্যতে মাল্টিপল লাঞ্চার ভিত্তিক হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আধুনিক সুইসাইড ড্রোনগুলোতে ট্যাকটিক্যাল ডাটা লিংক থাকে। ডাটা লিংকের কারনে অনেকগুলো ড্রোন একজন অপারেটর অপারেট করতে পারে। অর্থাৎ এগুলো সোয়ার্ম এ্যাটাক চালাতে পারে। সবগুলো ড্রোন ডাটা লিংকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট একটি দিকে যায়। এরপর প্রত্যেকটি সুইসাইড ড্রোন অপারেটর কর্তৃক তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন টার্গেটে আঘাত হানে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তুরস্ক, ইসরাইল সহ অনেক রাষ্ট্রই এই ধরনের সুইসাইড ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক বিস্ফোরকবাহী সুইসাড ড্রোন আটকানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী হার্ড কিল সিস্টেম হচ্ছে C-RAM(কাউন্টার-রকেট আর্টিলারি মর্টার) সিস্টেম। তার মাঝে মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম বেশ ভালো কার্যকর হলেও বেশ খরচ সাপেক্ষ বিষয়। সাধারনত বড় এবং ব্যায়বহুল কোন সুইসাইড ড্রোন মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম দ্বারা ইন্টারসেপ্ট করা হয়। আর ছোট ছোট সুইসাইড ড্রোনের ক্ষেত্রে গান বেসড C-RAM ও এন্টি ড্রোন নেট সিস্টেম দিয়ে ইন্টারসেপ্ট করা হয়।

ইরানের প্রত্যেকটি ছোট বোটে দুইটি করে এন্টি শিপ মিসাইল কিংবা সুইসাইড ড্রোন ইনস্টল করা আছে। কোন দেশ যদি ইরানের মতো এই ধরনের ছোট ছোট হাই স্পিড তৈরী করে আর সেগুলোতে ইরানের মতোই ২টি করে এন্টি শিপ মিসাইল বা ২টি করে সুইসাইড ড্রোন ইনস্টল করে এবং ঐ দেশটির কাছে যদি এই ধরনের

১৮০০টি বোট থাকে, তাহলে ঐ দেশটি ১৮০০টি বোট থেকে এক সাথে ৩৬০০টি এন্টি শিপ মিসাইল কিংবা সুইসাইড ড্রোন হামলা করতে পারবে একটি ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যাটেল গ্রুপে ৮টি করে ডেস্ট্রয়ার থাকে। সাধারনত যুদ্ধ জাহাজের ডিসপ্লেসমেন্ট হিসেবে VLS সিস্টেম বসানো হয়। প্রতিটা যুদ্ধ জাহাজে ৮০০টন ডিসপ্লেসমেন্ট প্রতি ৮ সেলের একটি VLS সিস্টেম বসানো হয়। একটি VLS সিস্টেমও ৮ সেলের হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি সেলে একটি করেই মিসাইল বহন করা হয়ে থাকে। তবে কখনো ২টি আবার কখনো কোয়াড প্যাক ক্যানিসটারের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম হলে প্রতিটি সেলে ৪টি করে এয়ারডিফেন্স মিসাইল বহন করা হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ারে ম্যাক্সিমাম হলে মিসাইলের জন্য ৮ সেলের ১২টি VLS সিস্টেম থাকে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১২টি VLS সিস্টেমে সাধারন ভাবে ৯৬টি মিসাইল বহন করে থাকে এবং কোয়াড প্যাক ক্যানিসটারের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম হলে ৩৮৪টি এয়ারডিফেন্স মিসাইল বহন করে থাকে। অন্যান্য দেশগুলোর ডেস্ট্রয়ারের ক্ষেত্রে এরচেয়ে কম বা বেশি VLS সিস্টেম থাকে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ারের হিসেবে একটি ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের ৮টি ডেস্ট্রয়ারে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৩০৭২টি এয়ার ডিফেন্স মিসাইল থাকে এবং ১টি ক্যারিয়ারে যদি ২টি VLS সিস্টেম থাকে। ২টি VLS সিস্টেমের ১৬টি সেলে সাধারনত ১৬টি মিসাইল থাকে এবং কোয়াড প্যাক ক্যানিস্টারের মাধ্যমে ৬৪টি মিসাইল থাকতে পারে। তাহলে সবমিলিয়ে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে ম্যাক্সিমাম হলে মোট ৩১৩৬টি এয়ারডিফেন্স মিসাইল বহন করতে পারে। সাধারন হিসেবে প্রত্যেকটি এয়ারডিফেন্স মিসাইল যদি এনিমির ফায়ার করা প্রত্যেকটি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হয়, তবুও আরো ৪৬৪টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন ইন্টারসেপ্টের বাহিরে থেকে গিয়ে টার্গেটে আঘাত হানতে পারবে।

৮টি ডেস্ট্রয়ারের প্রত্যেকটিতে সাধারনত ২১ সেলের একটি করে মিসাইল বেসড CIWS সিস্টেম থাকে এবং ১টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে যদি ২১ সেলের দুইটি মিসাইল বেসড C-RAM সিস্টেম থাকে। তাহলে ১টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও ৮টি ডেস্ট্রয়ার মিলিয়ে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে সর্বমোট ২১০ টি CIWS এর ইন্টারসেপ্টর মিসাইল থাকে। তাহলে মিসাইল বেসড CIWS সিস্টেম ২১০টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে। ১টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও ৮টি ডেস্ট্রয়ারে ইনস্টলকৃত মোট ৯টি গান বেসড

CIWS সিস্টেম মিলে যদি আরো ৭২টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হয়, তাহলেও অবশিষ্ট থাকা ৪৬৪টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন থেকে আরো মোট ২৮২টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করার পরেও বাকী থাকা ১৮২ টি এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন টার্গেটে আঘাত হানতে পারবে। এতগুলো এন্টি শিপ মিসাইল বা সুইসাইড ড্রোন একটি ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপে একই সাথে আঘাত হানলে ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপ কোন ভাবেই আর একটিভ থাকবে না!

এই উপরে উল্লেখিত সিস্টেমগুলোর মাঝে ১২.৭ মিঃমিঃ এর রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গান বোট, এটিজিএম ও ম্যানপ্যাড মিসাইলবাহী বোট, ৩২৪ মিঃমিঃ এর দুইটি লাইট ওয়েট টর্পেডোবাহী বোট, দুইটা লাইট ওয়েট এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইলবাহী বোট, সুইসাইড ড্রোন বাহী বোট, মাল্টিরোটর ড্রোনবাহী বোট, মাইন সুইপার ভেসেল ও সুইসাইড বোট সবগুলোই আবার ম্যানুয়ালের পাশাপাশি আনম্যান্ড সিস্টেমের হতে পারে। তুরস্ক এই উপরে উল্লেখিত সবগুলো বোটের আনম্যান্ড সিস্টেম তৈরী করছে। আনম্যান্ড আর্মাড বোট দিয়ে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলা করাটা সবচেয়ে সেরা সিস্টেম। এগুলোর সোয়ার্ম এ্যাটাক কোন ভাবেই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব না। আনম্যান্ড সিস্টেম হওয়ায় কোন সৈন্য হতাহত হওয়ার কোন ধরনের ঝুঁকি নেই। এই আনম্যান্ড আর্মাড বোটগুলোর অপারেটররা নির্দ্বিধায় ব্যাপক ভাবে হামলা করতে পারবে। যা ম্যানুয়াল সিস্টেমের ছোট ছোট আর্মাড বোটগুলো দিয়েও সম্ভব হতো না।

তুরস্কের তেরিকৃত এই ধরনের আনম্যান্ড বোটগুলোর গতি ঘন্টায় ৫০ নটিক্যাল মাইল হয়ে থাকে। এবং এই বোটগুলোর রেঞ্জ ৪০০ কিলোমিটার। যেই রেঞ্জ দিয়ে সমুদ্রের উপকূলে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন রেখেই নিজ দেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের মাঝে যেকোনো জায়গায় শত্রুর উপর হামলা করা যাবে।

এই সব আক্রমণকারী সমস্ত ম্যানুয়াল বা আনম্যান্ড ছোট ছোট বোটগুলোর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৫০ নটিক্যাল মাইল হতে হবে। যাতে করে পাল্টা হামলা থেকে বাঁচতে দ্রুত সরে পড়তে পারে।

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

(আধুনিক সামরিক বিজ্ঞান কুসংস্কার থেকে মুক্ত কিনা!সেই বিষয়ে)

বিজ্ঞান থেকে সবচেয়ে বেশি যে খাতগুলো উপকৃত হয়েছে বা যেই খাতগুলোতে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন ঘটেছে এবং এখনো পর্যন্ত যেই খাতগুলোতে বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন আবিষ্কারগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, চিকিৎসা খাত ও সামরিক খাত। এই সামরিক খাতে এবং বিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলো নিশ্চয়ই পিছিয়ে নেই। সেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলোর বহু অস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে ধর্মীয় বা গ্রীক কুসংস্কারের কল্প-কাহিনী থেকে নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের AIM-54 Phoenix মিসাইলের কথা। এই ফিনিক্স নামে গ্রীক পৌরানিক কাহিনীতে একটি পাখি আছে। যেটা তার বারবার পুড়ে যাওয়া ছাই হয়ে যাওয়া ভস্ম দেহ থেকে নতুন করে তৈরী বারবার নতুন রুপে পুনরায় ফিরে আসে। এই ফিনিক্স পাখির মতো ভস্ম হয়ে যাওয়া ছাই থেকে বারবার ফিরে আসার উদাহরণ আধুনিক সময়ে এসেও বহু মানুষ ব্যাবহার করে থাকে।

যুক্তরাজ্যের Martlet নামে একটি মাল্টিরোল মিসাইল আছে। Martlet নামে একটি পৌরানিক পাখি আছে। যেটাকে কল্পনা করা হয় কমন সুইফট বার্ডের আকৃতিতে। পৌরানিক কাহিনি অনুসারে এই পাখিটি জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো নিজের পা মাটিতে রাখেনা। এই পাখির কর্মের দিকটি বিবেচনা করেই এর নামের সাথে মিলেয়েই এই মিসাইলের নাম রাখা হয়েছে। এই ধরনের বহু দেশের বহু যুদ্ধাস্ত্র সহ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বহু বস্তুর নাম ধর্মীয় বা গ্রীক পৌরানিক কাহিনী থেকে নিয়ে রাখা হয়েছে।

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

(মুসলিম অধ্যুষিত আরব রাষ্ট্রগুলোর পশ্চিমাদের থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে)

মিশর, কাতার ও আরব আমিরাত মিলে ২০২১ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে মোট প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের ডাসাল্ট রাফাল যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেছে। তার মধ্যে মিশর ১০.৩বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ৫৪ টি। কাতার ৭.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ৩৬টি। আরব আমিরাত ১৮.৮বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ৮০টি।

সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও ওমান মিলে প্রায় ২৯.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয় করেছে। তার মধ্যে সৌদি আরব প্রায় ৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ৭২টি। কুয়েত প্রায় ৯বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ২৮টি। কাতার ৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ২৪টি। ওমান ৩.৬বিলিয়ন ইউএস ডলারে মোট ১২টি।

ইউরোপের শুধু রাফাল আর টাইফুন যুদ্ধ বিমান বিক্রি করে আয় হয়েছে ৬৬+ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এটা শুধু চুক্তির সময়ে পরিশোধিত অর্থের হিসেবে। পরিশোধিত অর্থের মুল্যমান হিসেবে বর্তমানে এটা প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এই ছয়টি দেশ অন্যান্য এয়ারক্রাফট ক্রয় বাবদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যত অর্থ ব্যায় করেছে সেটার বর্তমান মুল্যমান ২৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের চেয়েও বেশি। অথচ এই দেশগুলো চাইলেই এই অর্থ দিয়ে একটি বিশ্ব সেরা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারতো।

১৯৪৭ সাল থেকে নিয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৭৫ বছরে কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কুফফারদের থেকে অস্ত্র ক্রয় বাবদ যত অর্থ ব্যায় করেছে তার বর্তমান মুল্যমান এক ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের চেয়েও বেশি হবে। অথচ এই অর্থে কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো চাইলেই অনেকগুলো বিশ্ব সেরা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারতো। এত এত অস্ত্র ক্রয় করার পরেও কুফফারদের বিরুদ্ধে কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সফলতার হার কিন্তু খুবই কম। এই ক্রয়কৃত অস্ত্রগুলোর বেশিরভাগই সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে কিংবা নিজেরা নিজেদের উপর প্রয়োগ করেছে!

চৌচল্লিশতম অধ্যায়

(মুসলিমরা ঠিকঠাক মতো ইসলাম পালন না করা সত্বেও কেন অমুসলিমদের উপর বিজয়ী হয়!সেই বিষয় সম্পর্কে)

২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আজারবাইজান-আর্মেনিয়ার মধ্যে চলা ৪৪ দিনের যুদ্ধের সময় আর্মেনিয়ার কাছে শুধু S-300 এয়ার ডিফেন্স ছিলো ১২ ব্যাটারি। বিপরীতে আজারবাইজানের কাছে S-300 এয়ারডিফেন্স সিস্টেম ছিলো মাত্র ২ ব্যাটারি। আর্মেনিয়ার ১২ ব্যাটারি S-300 থেকে আজারবাইজান ধ্বংস করেছিলো ৬ ব্যাটারি। শুধু তাই না!আর্মেনিয়ার SU-25 ছিলো ১৪টি। আবার সেগুলো রাশিয়া থেকে যুদ্ধের কিছুদিন আগে আপগ্রেড করিয়ে নিয়েছিলো। তার মধ্য থেকে ৭টি আজারবাইজান ধ্বংস করেছে। বিপরীতে আজারবাইজানের ছিলো ১২টি SU-25 যেগুলো যুদ্ধের বহু আগে থেকেই কোন আপগ্রেড করা হয়নি। আর্মেনিয়া যুদ্ধের আগে ১২টি SU-30 অর্ডার করেছিলো রাশিয়া থেকে। তার মধ্য থেকে চারটি যুদ্ধের আগেই ডেলিভারি পেয়েছিলো। বিপরীতে যুদ্ধের সময় আজারবাইজানের ছিলো ১২টি Mig-29 যুদ্ধ বিমান। অস্ত্রের কোয়ালিটি ও কান্টিটি উভয় দিক বিবেচনায় আর্মেনিয়াই এগিয়ে ছিলো আজারবাইজানের থেকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আর্মেনিয়া আজারবাইজান থেকে সামরিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকার পরেও কেন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলো?

আপনি হয়তো ব্যাটেল অব মারিৎজার কথা শুনে থাকবেন!যে যুদ্ধে মাত্র ৮০০ উসমানীয় সৈন্য বাইজেন্টাইনদের প্রায় ৮০ হাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলো। একজন উসমানীয় সৈন্যের বিপরিতে বাইজেন্টাইনদের প্রায় ১০০ জন সৈন্য ছিলো।

আফগানিস্থানে মার্কিনিরা প্রতিপক্ষের থেকে হাজার গুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ২০ বছর যুদ্ধ করে পরাজয় নিয়ে ফিরেছিলো!সর্বশেষ ২০২০ সালে আফগানিস্তানের

যারা যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহন করেছিলো বছরে তাদের সম্মিলিত ডিফেন্স বাজেট ছিলো ১ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারেরও বেশি। বিপরিতে যারা এই জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বছরে তাদের ডিফেন্স বাজেট ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের চেয়েও কম ছিলো। অর্থাৎ এই বাজেট জোটের বাজেটের তুলনায় ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগও না। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎকালীন সোভিয়েত বিরোধী আফগান যোদ্ধাদের তুলনায় বহু শক্তিশালী হওয়া সত্বেও পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে!

আজারবাইজান স্পেশাল ফোর্সের মাত্র ৪০০জন সদস্য নগরানো কারাবাখের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর শুসা সিটি ৩-৪ ঘন্টায় দখল করেছে, কোন ধরনের এয়ার সাপোর্ট ছাড়াই। এই ৪০০ জনের দলকে কোন ধরনের ভারী ওয়েপন্স দেয়া হয়নি। শুধু মাত্র কিছু ম্যান-পোর্টেবল আনগাইডেড ওয়েপনস দেওয়া হয়েছে। তাও সীমিত আকারে যতটুকু আজারবাইজানের এই ৪০০ জন সৈন্য আজারবাইজানের মুল ভুখন্ড থেকে শুসা সিটি পর্যন্ত কাধে বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছে। অনেকটা ফিদায়ী স্টাইলে, যদি তারা জয়ী হতে পারে তাহলে তো বেচে যাবে অন্যথায় প্রত্যেককেই শহীদ হতে হবে। বিপরীতে শুসা সিটিতে আর্মেনিয়ার ২২৫০ জন সৈন্য মোতায়ন ছিল। তাদের কাছে ট্যাংক সহ সব ধরনের ভারি অস্ত্র-শস্ত্র থাকা সত্বেও আর্মেনিয়ান সৈন্যরা পরাজিত হয়ে কেউ জাহান্নামে, কেউ বন্দী আবার কেউ পালিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন?

যুদ্ধের ময়দানে ইসলাম এক বিজয়ী শক্তির নাম। যেই মুসলিম বছরে ঈদের নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ পড়েনা, সেই লোকও যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহু আকবার স্লোগানে চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে। মুসলিম থেকে সেক্যুলার হয়ে যাওয়া বহু সৈন্যরাই যুদ্ধের ময়দানে পাক্কা মুসলিম হয়ে যায়। কেননা তারা ভালো করেই জানে যে, যুদ্ধের ময়দানে ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরন করার কোন মুল্য নেই। বরং ঈমান ছাড়া দুনিয়াতে যতদিন বেশি বেঁচে থাকা যায় ততদিনই লাভ। এই লাভবান হতে চাইলে অবশ্যই যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। পালিয়ে গেলেই যে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং পালিয়ে যাওয়ার সময় ক্রুসেডার সৈন্যরা তাদেরকে হত্যা করবে। কিংবা তারা পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের রাষ্ট্র দখল করে তাদেরকে হত্যা বা বন্দি করবে।

আজারবাইজানের মতো একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের সৈন্যরাও পাক্কা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে। আজারি সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানেই আজান

দিতো এবং নামাজ পড়তো। আর্মেনিয়া থেকে উদ্ধার করা পরিত্যক্ত বহু মাসজিদে আজারবাইজানের সৈন্যরা আজান দিয়ে নামাজ আদায় করে সেই সব মাসজিদগুলোকে আবার পুনরায় আবাদ করেছে। সেই সব মাসজিদগুলোর বড় একটা অংশই আর্মেনিয়ার অধীনে থাকা অবস্থায় গরু ছাগলের খোয়াড় হিসেবে ব্যাবহার করা হতো।

যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের যেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সেটা ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ের উপর বিজয় নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে বিজয় কখনোই পরিপূর্ণ রুপে অস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। বরং যুদ্ধে বিজয়ের বড় একটি অংশই নির্ভর করে সৈন্যদের মেধা, দক্ষতা, শক্তি, সাহস, কৌশল, ইত্যাদির উপরে। এই বিষয়গুলো অমুসলিমদের জন্য বেশি প্রযোজ্য। । উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক দুর্বল অমুসলিম ভিয়েতনামীদের পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় হয়েছিলো এই সব বিষয়গুলোর কারনেই।

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

(সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অতীতে ইরাকের তৈরি কিছু অস্ত্র সম্পর্কে)

Jobaria defense systems multiple cradle launcher

এটি আরব আমিরাতের গ্রাউন্ড ফোর্সের ব্যাবহৃত একটি রকেট লাঞ্চার। এটিকে jah-annam launcher হিসেবেও ডাকা হয়। এটি বিশ্বের সর্ব বৃহৎ রকেট লাঞ্চার(লাঞ্চার টিউবের সংখ্যার দিক থেকে)। এটিতে ২৪০টি লাঞ্চার টিউব আছে। এর রকেটের ইফেক্টিভ ফায়ারিং রেঞ্জ ১৬কিঃমিঃ এবং ম্যাক্সিমাম ফায়ারিং রেঞ্জ ৩৭কিঃমিঃ। এটি আরব আমিরাতের আল জাবের ল্যান্ড সিস্টেম এবং তুরস্কের রকেটসান যৌথভাবে নির্মান করেছে।

Jobaria TCL

এটি আরব আমিরাতের তৈরি বিশ্বের সর্ব বৃহত্তম ল্যান্ড বেসড MLRS Jobaria MCRL(২৪০টি লাঞ্চার টিউব) এর লংরেঞ্জ ভার্সন। এটি একটি 6×6 মিলিটারি ট্র্যাক্টর ট্রাকে সেট করা হয়েছে। যাতে দুইটি ব্লকে ৪টি করে মোট ৮টি লাঞ্চার রয়েছে। এটি চায়নার তৈরি A-300 রকেট ফায়ার করতে পারে, যার রেঞ্জ ১২০-২৯০কিঃমিঃ। এবং তুরস্কের তৈরি TRB-300 রকেট ফায়ার করতে পারে, যার রেঞ্জ ৩০-১২০কিঃমিঃ। এটিতে ব্যাবহৃত মিসাইলের সর্বোচ্চ রেঞ্জ হতে পারে ৪৫০কিঃমিঃ পর্যন্ত।

Yabhon United-40(Smart Eye-2)

এটি আরব আমিরাতের তৈরি একটি MALE(মিডিয়াম অল্টিটিউড লং এন্ডুরেন্স) ড্রোন।

এর ম্যাক্সিমাম টেকঅফ ওয়েট হচ্ছে ১৫০০কেজি এবং ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি ১০০০কেজি(মতান্তরে ১০৫০কেজি)।

এর ম্যাক্সিমাম এন্ডুরেন্স ১২০ঘন্টা (৫দিন)। ম্যাক্সিমাম অল্টিটিউড ৭.৩কিঃমিঃ। এর সাধারন স্পিড প্রতি ঘন্টায় ৫৬কিঃমিঃ এবং ক্রুজ স্পিড প্রতি ঘন্টায় ৬৫কিঃমিঃ, ম্যাক্সিমাম স্পিড প্রতি ঘন্টায়২২২কিঃমিঃ। এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আরব আমিরাতের ADCOM System। এর আপডেট ভার্সন হচ্ছে United Block-5। এর HALE(হাই অল্টিটিউড লং এন্ডুরেন্স) ভার্সন তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে ADCOM। এটি তিনটি রাষ্ট্র ব্যাবহার করে,

আলজেরিয়া ১০টি ক্রয় এর জন্য চুক্তি করেছে ২০১৯সাল পর্যন্ত দুইটি ডেলিভারি পেয়েছে। রাশিয়া দুইটি এই ড্রোন ব্যাবহার করে। এবং আরব আমিরাত উল্ল্যেখযোগ্য সংখ্যাক ব্যাবহার করে। এতে রয়েছে SAR রাডার সহ বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক সেন্সর এবং এতে সোনার বহন করার সিস্টেমও রয়েছে। এই ড্রোনটি বিশ্বের দশটি বৃহৎ ও আধুনিক ড্রোনগুলোর একটি।

উল্লেখ্য যে, ওয়ার্ল্ডে কমব্যাট ড্রোন তৈরির দিক থেকে আরব আমিরাতের র্যাংকিং ৭ম। এই র্যাংকিং এর তালিকাটি হচ্ছে যথাক্রমে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, চায়না, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক, আরব আমিরাত। (এই তালিকায় আগে তৈরির দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে)।

Halcon skyknigh

এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের তৈরি একটি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম(মুলত C-RAM)। এটি আরব আমিরাতের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি Halcon গ্রুপ তৈরি করেছে। এটি আরব বিশ্বের তৈরি করা প্রথম কোন এয়ারডিফেন্স সিস্টেম। রাষ্ট্র হিসেবে আরব আমিরাতই আরব বিশ্বে প্রথম এয়ারডিফেন্স তৈরিকারী এবং কথিত মুসলিম বিশ্বে প্রথম C-RAM(কাউন্টার-রকেট আর্টিলারি মর্টার) সিস্টেম তৈরিকারী। এটি প্রযুক্তি গত দিক থেকে ইসরাইলের আয়রন ডোম সিস্টেমের মত। সাধারনত আয়রন ডোম এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের একটি বক্সে ২০টি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল থাকে এবং ১টি ইউনিটে ৪টি বক্স থাকে। অর্থাৎ ১টি ইউনিটে ৮০টি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল রেডি থাকে। বিপরিতে Halcon skyknight এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের একটি বক্সে ৬০টি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল থাকে এবং ১টি ইউনিটে ৪টি বক্স থাকে। অর্থাৎ ১টি ইউনিটে ২৪০টি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল রেডি থাকে। আয়রন ডোমের C-RAM সিস্টেমের রেঞ্জ ৪কিঃমিঃ এবং Halcon Skyknight C-RAM সিস্টেমের রেঞ্জও ৪কিঃমিঃ। যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার , ড্রোন ও ক্রুজ মিসাইলের বিরুদ্ধে Halcon Skyknigt এয়ারডিফেন্সের

ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ১০কিঃমিঃ। বিপরিতে আয়রন ডোমের এয়ারডিফেন্সের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ৭০কিঃমিঃ। আরব আমিরাতের Halcon এটি জার্মানির Rheinmetall এর সহযোগিতায় তৈরি করেছে।

কথিত মুসলিম বিশ্বে ইরাকই সর্ব প্রথম দেশ যারা এয়ার টু এয়ার মিসাইল তৈরি করেছিলো। ইরাক ইরান যুদ্ধে সোভিয়েত এয়ার টু এয়ার মিসাইলের বাজে পারফরম্যান্সের কারনে ইরাক নিজেই এয়ার টু এয়ার মিসাইল তৈরির প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলো!এবং Al Humurrabi নামের একটি লং রেঞ্জের রাডার গাইডেড এয়ার টু এয়ার মিসাইল তৈরি করেছিলো।

ইরাক ১৯৯৯ সালে Al Ubur নামে একটি এয়ারডিফেন্স তৈরির প্রজেক্ট শুরু করে। এবং ২০০২ সালে কয়েকবার এটার সফল পরীক্ষা চালায়। এটার রেঞ্জ ছিলো ১৫০ কিঃমিঃ এবং ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ছিলো ২২০ কিঃমিঃ। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর এই প্রজেক্ট ধ্বংস হয়ে যায়। ইরাক ১৯৮৯ সালে Al Abid নামে একটি স্পেস ভেহিকল তৈরি করেছিলো। এই প্রজেক্ট সফলও হয়ছিলো।

২০০২ সাল পর্যন্ত ইরাক শর্ট ও লং রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল, ল্যান্ড এটাক ক্রুজ মিসাইল ও এন্টি শিপ মিসাইল সহ বিভিন্ন ধরনের ৮০টি মিসাইল তৈরি করেছিলো। তার মাঝে ৪৬-৪৭টি সার্ভিসে এসেছিলো আর বাকি ৩৩-৩৪টি সার্ভিসে আসার পর্যায়ে ছিলো। ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোর মাঝে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, আর হুসেন, আল সামুদ সিরিজ ও আল ফাতাহ।

মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ যখন তেমন কোন ড্রোন তৈরি করতে পারেনি তখন ইরাক অনেকগুলো ড্রোন তৈরি করেছিলো। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, আল কুদুস ও ইবনে ফিরনাস ইউএভি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের MQ-9 Reaper ড্রোনের চিফ ইঞ্জিনিয়ারও একজন ইরাকি বংশোদ্ভূত।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়(১৯৮০-১৯৮৮ সালে) ইরাক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাপ্লাই করা স্কাড মিসাইলের বিকল্প হিসেবে তৈরি করেছিলো সুপার গান নামে বিশেষ এক ধরনের লং রেঞ্জের আর্টিলারি সিস্টেম। যেটা থেকে 350mm ব্যাস এবং 1000mm বা এক মিটার দৈর্ঘ্যের গোলা বারুদ ফায়ার করা যেত!এটার ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ছিলো ৯৬০ কিঃমিঃ। এটা পুরোপুরি সার্ভিসে আসেনি। ইতিহাসে এটা সর্ব প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র এত লং রেঞ্জের আর্টিলারি তৈরির প্রজেক্ট ছিলো।

ছিচল্লিশতম অধ্যায়

(পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির কিছু অংশ সম্পর্কে)

পাকিস্তান অর্থনৈতিক ভাবে জিডিপির দিক থেকে বিশ্বের ৪৩তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। পিপিপির দিক থেকে ২৩তম। জনসংখ্যার দিক থেকে ৬ম। সামরিক ব্যায়ের দিক থেকে ২০তম। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের রিপোর্ট অনুসারে পাকিস্তান বিশ্বের ১০ম সামরিক শক্তিশালি রাষ্ট্র এবং একটিভ সেনা সদস্যর দিক থেকে ৬তম বৃহত্তম সামরিক বাহিনী রয়েছে দেশটির। বিশ্বে শীর্ষ দশ জন সামরিক জেনারেলের প্রতিটি লিস্টেই পাকিস্তানের সেনা প্রধান থাকেন। মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। এবং সারা বিশ্বের অফিসিয়াল নয়টি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের একটি। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বিশ্বে টপ টেনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি। এমনকি দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদ বিশ্বের ২য় সুন্দর, বৃহত্তম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত একটি রাজধানী!দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের ২য় উচ্চতম কে-২ পর্বত এবং নবম উচ্চতম নাঙ্গা পর্বত। পৃথিবীর শীর্ষ উচ্চতম ১২০টি পর্বতের মাঝে ৪২টি-ই রয়েছে পাকিস্তানে। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট শীর্ষ উচ্চতম পর্বতের ৩৫% পর্বতই পাকিস্তানে অবস্থিত!শীর্ষ ১০টি পর্বতের মাঝে ২টি(কে২-২য়তম, নাঙ্গা-৯ম) এবং শীর্ষ ২০টি পর্বতের মাঝে ৮টি পাকিস্তানে অবস্থিত। বিশ্বের সেরা সুন্দর ও বৃহত্তম লেকগুলোর কয়েকটিই রয়েছে পাকিস্তানে। পৃথিবীর শীর্ষ উচ্চতম লেকগুলোর মাঝে পাকিস্তানের Ansoo Lake ২৫তম। পৃথিবীর শীর্ষ ১০টি সুন্দর লেকগুলোর মাঝে পাকিস্তানের Attabad Lake ৭ম। পৃথিবীর বৃহত্তম ড্যামগুলোর পাকিস্তানের Tarbela Dam ১ম স্থানে রয়েছে। এবং পৃথিবীর শীর্ষ ক্রিটিক্যাল কন্সট্রাকশনগুলোর মাঝে এটি ৫ম স্থানে রয়েছে!দেশটিতে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল কাপ্তানা মরুভূমি এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডেসাই মালভূমি। বিশ্বের শীর্ষ দশটি পর্যটন রাষ্ট্রের একটি পাকিস্তান। দেশটির পুরোনো শহর লাহোরে দুবাই এর মতো একটি অত্যাধুনিক সিটি গড়ে তোলার কাজ চলছে। এটি লাহোরের রাভি নদীকে বেজ করে গড়ে উঠবে। এই

নদীটি ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মাঝে প্রবাহিত। এই সিটি গড়ে তুলতে ২০২০ সালে পাকিস্তানের ব্যায় ধরা হয়েছিলো ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এছাড়াও দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক প্রকল্প সিপিইসি(চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর)।

কথিত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর মাঝে তুরস্কই একমাত্র রাষ্ট্র যারা এ টু জেড সব ধরনের অস্ত্রের লাঞ্চার ও গোলাবারুদ তৈরী করছে। এবং কিছু কিছু অস্ত্র তৈরীর প্রজেক্ট বর্তমানে চলমান রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলো সফল হলে সামরিক খাতে পুরোপুরি স্ব নির্ভর হয়ে উঠবে তুরস্ক। তুরস্কের পরে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে পাকিস্তান। পাকিস্তান তার চাহিদার মোট ৫০% অস্ত্রের লাঞ্চার নিজেরাই তৈরী করে থাকে। তবে ওয়েপনসের লাঞ্চারের ক্যাটাগরির দিক বিবেচনায় নিলে মোট ক্যাটাগরির ৭৫% ক্যাটাগরির ওয়েপনসের লাঞ্চারই নিজেরা অথবা যৌথভাবে কিংবা টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিজ দেশেই তৈরী করে থাকে। এবং গোলাবারুদের ৯০% নিজেরাই তৈরি করে থাকে। বর্তমানে পাকিস্তানের কিছু কিছু অস্ত্র তৈরীর প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলো সফল হলে পাকিস্তানের আরো অনেকটা স্ব নির্ভর হয়ে উঠবে সামরিক খাতে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে তুরস্কের যুদ্ধস্ত্রের ব্যাপারে লিখেছি। আজকে পাকিস্তানের তৈরী গোলাবারুদের ব্যাপরে আলোচনা করা যেতে পারে। পাকিস্তান রাইফেল, মেশিন গান থেকে নিয়ে মর্টার শেল পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের স্মল আর্মসের লাঞ্চার ও বারুদ নিজেরা বা টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে তৈরী করে থাকে। এবং ট্যাংক, হুইটজার ও ২০ কিলোমিটার ও ৪০ কিলোমিটার রেঞ্জের আন গাইডেড Yarmuk MLRS, ৪০ কিলোমিটার রেঞ্জের আন গাইডেড KRL Ghazab MLRS সহ এই ধরনের যত হেভি আর্মস রয়েছে সেগুলোর গোলাবারুদ সহ সব ধরনের আনগাইডেড গোলাবারুদ, বোম নিজেরাই তৈরী করে থাকে এবং নিজেদের চাহিদা নিজেরাই মিটায়। পাকিস্তান গাইডেড গোলাবারুদ ও বোমগুলোর মাঝে বড় একটি অংশই নিজেরা তৈরী করে থাকে। পাকিস্তানের তৈরী গাইডেড গোলাবারুদগুলোর কিছু অংশই নিচে উল্লেখ করছি,

Baktar shikan,

এটা একটা মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যাটেল প্রুভড এন্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল। এটা বসনিয়ার যুদ্ধে ব্যাবহার করা হয়েছিলো। এই মিসাইলটির ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের BGM 71 TOW এর মতোই একটি

ওয়্যার গাইডেড এটিজিএম। এই এটিজিএমটির একটা এয়ার লাঞ্চড ভ্যারিয়েন্ট আছে এট্যাক হেলিকপ্টারের জন্য। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানের এই এটিজিএমটি ব্যাবহার করে থাকে।

Anza MANPAD,

এটি একটি মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যাটেল প্রুভড ম্যানপ্যাড সিস্টেম। Anza সিরিজের ম্যানপ্যাডের তিনটি ভার্সন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে Anza Mk-I, Anza Mk-II ও Anza Mk-III। এর মাঝে Anza Mk-II দ্বারা কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতের একটি হেলিকপ্টার(MI-17) ও দুইটি যুদ্ধ বিমান(MiIG-21, MIG 27) শুটডাউন করা হয়েছিলো। Anza সিরিজের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে, Anza MK-III, এটার ম্যাক্সিমাম অল্টিটিউড ৪ কিলোমিটার এবং রেঞ্জ ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটা ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট, ড্রোন বা হেলিকপ্টার থেকেও লাঞ্চ করা যায় ড্রোন বা হেলিকপ্টার এই জাতীয় কিছু শুট ডাউন করতে। সেক্ষেত্রে এটার ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ হয়ে থাকে ১০ কিলোমিটার।

Barq,

এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এয়ার টু সার্ফেস ও সার্ফেস টু সার্ফেস মিসাইল AGM 114 Helfire এর মতোই পাকিস্তানের নিজস্ব একটি মিসাইল। এটা পাকিস্তান আর্মাড ড্রোনে ব্যাবহার করে থাকে। এটার ম্যাক্সিমাম রেঞ্জও হেলফায়ারের মতোই ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গাইডেড রকেট আর্টিলারি সিস্টেম,

SUPARCO-A100E(রেঞ্জ ১২০কিঃমিঃ)

FATAH-1(রেঞ্জ ১৫০ কিঃমিঃ)

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে অনেক ধরনের নিজস্ব তৈরী ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইল রয়েছে। তার মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো,

পাকিস্তানের ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো হচ্ছে,

Hatf-l(রেঞ্জ-৭০ কিঃমিঃ)

Nasr(রেঞ্জ-৯০ কিঃমিঃ)

Hatf-lA(রেঞ্জ-১০০ কিঃমিঃ)

Hatf-lB(রেঞ্জ-১০০ কিঃমিঃ)

Ghaznavi(রেঞ্জ-৩০০ কিঃমিঃ)

পাকিস্তানের থ্রেট ব্যালিস্টিক মিসাইল ও SRBM বা শর্ট রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো হচ্ছে,

Abdali(রেঞ্জ-৪৫০ কিঃমিঃ)

Shaheen(রেঞ্জ-৭৫০ কিঃমিঃ)

Shaheen-I(রেঞ্জ-৯০০ কিঃমিঃ)

Shaheen-IA(রেঞ্জ-১০০০ কিঃমিঃ)

পাকিস্তানের MRBM বা মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো হচ্ছে,

KRL Ghauri-I(রেঞ্জ-১৫০০ কিঃমিঃ)

KRL Ghauri-II(রেঞ্জ -১৮০০-২০০০ কিঃমিঃ)

Shaheen-II(রেঞ্জ-২৫০০ কিঃমিঃ)

Shaheen-III(রেঞ্জ-২৭৫০ কিঃমিঃ)

পাকিস্তান অফিসিয়াল তার কাছে মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল পর্যন্ত আছে এমনটাই স্বীকার করে। এর বাহিরের কোন রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলের ব্যাপারেই কিছুই পাকিস্তান অফিসিয়াল ভাবে স্বীকার করে না।

পাকিস্তানের MIRV বা মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেটলি টার্গেট্যাবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল সিস্টেমের ব্যালিস্টিক মিসাইল হচ্ছে,

Ababeel(রেঞ্জ ২২০০ কিঃমিঃ)

IRBM বা ইন্টার-মিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা হয় এমন সব ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে যেগুলোর রেঞ্জ ৩৫০০- ৫৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। নন অফিসিয়াল পাকিস্তানের এই ধরনের ৪০০০কিলোমিটার রেঞ্জের Tipu-1 ও ৫৫০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের Tipu-2 নামে দুইটি ইন্টার মিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইলের কথা জানা যায়। পাকিস্তান অফিসিয়াল এটার কোন পরীক্ষা চালানোর ঘোষণা দেয়নি। এমনটা হতে পারে যে, পাকিস্তান অন্য মিসাইল পরীক্ষা চালানোর কথা বলে হয়তো এটার পরীক্ষা চালিয়েছে। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক না। ইসরাইল তার ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো ও নিউক্লিয়ার ওয়েপনসের পরীক্ষা ফ্রান্সের মাধ্যমে এভাবেই চালিয়ে ছিলো। মানে এগুলো এখন ওপেন সিক্রেট বিষয়।

মিসাইল স্ট্রাটেজিক ফোরামের বক্তব্য মতে, পাকিস্তানের ৭০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের Taimur নামে একটি ICBM রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে পাকিস্তানের অফিসিয়াল কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। কেননা পাকিস্তান কৌশলগত কারনেই তার অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক প্রজেক্টের কথা গোপন রাখে। পাকিস্তানের ভূখণ্ড এমন একটি কৌশলগত জায়গা রয়েছে, যেখান থেকে ৭০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ICBM পুরো আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের যেকোনো জায়গায় আঘাত হানতে পারবে।

পাকিস্তানের SLBM বা সাবমেরিন লাঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরির প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। চীন থেকে ক্রয়কৃত Type 039B ক্লাসের সাবমেরিন গুলো ডেলিভারি পেলেই SLBM এর পরীক্ষা চালাবে। চীন থেকে ক্রয়কৃত পাকিস্তানের এই সাবমেরিনগুলো থেকে সাবমেরিন লাঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল অপারেট করার সিস্টেম থাকবে।

ক্রুজ মিসাইলের তিনটা প্রকার ভেদ হয় রেঞ্জের ভিত্তিতে। শর্ট রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ১-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। মিডিয়াম রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ ৫০০-১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর লং রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল বলা হয় এমন সব ক্রুজ মিসাইলকে যেগুলোর রেঞ্জ সাধারণত ১০০০ কিলোমিটারের বেশি হয়ে থাকে।

Babur-IA হচ্ছে শর্ট রেঞ্জের ল্যান্ড লাঞ্চড ল্যান্ড এটাক ও এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল ও Babur-III হচ্ছে SLCM বা সাবমেরিন লাঞ্চড ল্যান্ড এটাক ও এন্টি শিপ মিসাইল। উভয় মিসাইলের রেঞ্জই ৪৫০ কিলোমিটার।

Ra'ad-I ও Ra'ad-II এয়ার লাঞ্চড ল্যান্ড এটাক ও এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল। Ra'ad-I এর রেঞ্জ ৩৫০ কিলোমিটার এবং Ra'ad-2 এর রেঞ্জ ৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Babur-I এর আপডেট ভার্সন হচ্ছে Babur-II, এটা মিডিয়াম রেঞ্জের একটি ক্রুজ মিসাইল। যার রেঞ্জ ৭৫০ কিলোমিটার। এটা ল্যান্ড লাঞ্চড ল্যান্ড এটাক ও এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল। আর Harbah Babur-II এর শিপ লাঞ্চড ভ্যারিয়েন্ট। এটার রেঞ্জ ৭৫০কিলোমিটার

এটা ল্যান্ড এটাক ও এন্টি শিপ ক্রুজ মিসাইল।

Babur-IB হচ্ছে ল্যান্ড লাঞ্চড ল্যান্ড এটাক লং রেঞ্জের ক্রুজ মিসাইল। এটার রেঞ্জ ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি।

পাকিস্তানের এয়ার ফোর্সের জন্য তৈরী করা হয়েছে কয়েক ধরনের প্রিসিশন গাইডেড বোম। সেগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে, GIDS Takbir, এটার রেঞ্জ ৮০ কিলোমিটার। GIDS REK হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের MK-80 সিরিজের মতো একটি জেনারেল পারপাস সিরিজ বোম। মানে GIDS REK সিরিজের এর অনেকগুলো বিভিন্ন রেঞ্জ ও ওজনের গাইডেড ও আন গাইডেড বোম রয়েছে। ৬০ কিলোমিটার রেঞ্জের H-2 SOW এবং ১২০ কিলোমিটার রেঞ্জের H-4 SOW হচ্ছে প্রিসিশন গাইডেড বোম।

পাকিস্তান নিজেদের তৈরীকৃত যেই সব গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরির ওয়েপনস গুলো নাই, সেগুলো হচ্ছে, সার্ফেস টু এয়ার বা এয়ার টু এয়ার কোন ধরনের মিসাইল নেই। অর্থাৎ ম্যানপ্যাড বাদে পাকিস্তানের তৈরি কোন ধরনের এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল নেই!লাইট ওয়েট এবং হেভি ওয়েট কোন ধরনের নিজস্ব তৈরী টর্পেডো নেই। এবং এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল নেই। এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল না হলেও চলবে। এন্টি রেডিয়েশন মিসাইলের কাজ ক্রুজ মিসাইল দিয়ে করা যাবে। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্র করেছিলো ইরাকে এবং রাশিয়া করেছে ইউক্রেনে। এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল দিয়ে এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করার কাজটা ক্রুজ মিসাইল দিয়ে আরো ভালোভাবে করা যায়। এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল দিয়ে এয়ারডিফেন্স ধ্বংস করতে হল এটা লাঞ্চ করার জন্য এবং টার্গেট খুঁজে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ বিমান প্রয়োজন হবে। সেই যুদ্ধ বিমান থেকে এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল লাঞ্চ করতে হলে যুদ্ধ বিমানটাকে নির্দিষ্ট একটি রেঞ্জের মাঝে আসতে হবে। বেশিরভাগ এন্টি রেডিয়েশন মিসাইলের রেঞ্জই ১০০-১৫০ কিলোমিটার

হয়ে থাকে। এই রেঞ্জের মাঝে এসে কোন যুদ্ধ বিমান থেকে এন্টি রেডিয়েশন মিসাইল লাঞ্চ করাটাও ঝুঁকি পূর্ণ। কেননা বেশিরভাগ লং রেঞ্জের এয়ারডিফেন্স সিস্টেমের রেঞ্জও এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এয়ারডিফেন্স শিকার করতে আসা যুদ্ধ বিমান নিজেই এয়ারডিফেন্সের শিকারে পরিণত হতে পারে। টর্পেডো নৌবাহিনী যুদ্ধে জড়ালে তখনই কেবল প্রয়োজন পড়বে। তাছাড়া টর্পেডো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে সাবমেরিন ধ্বংস করতে। আন গাইডেড নেভাল মাইন বাদে একমাত্র এন্টি সাবমেরিন গাইডেড ওয়েপনস হচ্ছে টর্পেডো। সাবমেরিন থেকে কোন সাবমেরিন বা যুদ্ধ জাহাজ থেকে কোন সাবমেরিন ধ্বংস করতে চাইলে টর্পেডোর কোন বিকল্প নেই। সাবমেরিন থেকে কোন যুদ্ধ জাহাজ বা যুদ্ধ জাহাজ থেকে কোন যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করতে চাইলে টর্পেডো বাদেও এন্টি শিপ মিসাইল সহ অনেক অস্ত্র আছে। সারা বিশ্বে মোট মিজেট সাবমেরিন সহকারে সারা বিশ্বে২০২১ সাল পর্যন্ত মোট আর্মাড সাবমেরিন ছিলো ৫১৪ টি গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের রিপোর্ট অনুসারে। এগুলোকে ধ্বংস করতে যদি একটি লাইট ওয়েট টর্পেডো এবং একটি হেভিওয়েট টর্পেডো ব্যাবহার করতে হয়। তাহলে গড়পড়তায় সারা বিশ্বের সমস্ত সাবমেরিন ধ্বংস করতে ১০০০টা টর্পেডো প্রয়োজন পড়বে। একটি লাইট ওয়েট টর্পেডো ও একটি হেভি ওয়েট টর্পেডোর প্যাকেজ আকারে ক্রয় করলে ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি পড়বেনা কোন ভাবেই। তাহলে সারা বিশ্বের সমস্ত সাবমেরিন ধ্বংস করতে চাইলে ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে ৫০০ প্যাকেজে এক হাজারটা টর্পেডো ক্রয় করলেই হবে। এটা খুব বেশি না অন্যান্য দিক বিবেচনায়। এয়ার টু এয়ার মিসাইল এবং সার্ফেস টু এয়ার মিসাইলের ক্ষেত্রে এমন কোন কিছুই বলা যায় না। সব দিক বিবেচনা করলে এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল তৈরী করা পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তান এয়ারডিফেন্স মিসাইল তৈরী করতে পারলে তুরস্ক, চীন, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এয়ারডিফেন্সের রাডার সহ অন্যান্য সেন্সর ও পার্টস কিনে নিয়ে এসে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম তৈরী করতে পারবে খুব সহজেই। মুল কথা হচ্ছে, যে সমস্ত ওয়েপনসের গোলাবারুদ পাকিস্তান এখনো তৈরী করে না এবং কোন প্রজেক্টও হাতে নেয়নি, সেগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের জন্য এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে, এয়ারডিফেন্স মিসাইল তৈরীর প্রজেক্ট হাতে নেওয়া।

মুসলিম বিশ্বে একমাত্র তুরস্কেরই আনম্যান্ড এয়ার ভেহিকল, আনম্যান্ড গ্রাউন্ড ভেহিকল, আনম্যান্ড সার্ফেস বোট, আনম্যান্ড আন্ডার ওয়াটার ভেহিকল রয়েছে। তুরস্ক শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয় বরং বিশ্বের শীর্ষ তিনটি আনম্যান্ড সিস্টেম প্রডিউসার

কান্ট্রি। এবং তুরস্কের আনম্যান্ড সিস্টেমগুলোই হচ্ছে সারা বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাটেল প্রুভ আনম্যান্ড সিস্টেম। মুসলিম বিশ্বে তুরস্কের পরে পাকিস্তানের অবস্থান এই খাতে। এবং সারা বিশ্বে দশটি আনম্যান্ড সিস্টেম প্রডিউসার কান্ট্রিগুলোর একটি। তুরস্কের আনম্যান্ড সিস্টেম নিয়ে বিগত সময়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। নিচে পাকিস্তানের নিজস্ব তৈরী আনম্যান্ড সিস্টেম ও ক্রয়কৃত আনম্যান্ড সিস্টেমগুলোর নাম উল্লেখ করেছি।

পাকিস্তানের নিজস্ব তৈরি আনম্যান্ড আর্মাড ভেহিকল সিস্টেম,

Selex Falco

পাকিস্তান ইটালি থেকে টট নিয়ে ২৬টি Falco ড্রোন তৈরি করেছে। পাকিস্তান এগুলোতে মিসাইল ইনস্টল করার অনুমতি চাইলে ইটালি রাজি হয়নি। তবে যুদ্ধ কালীন সময়েতো আর এই সব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেনা কেউ!এগুলোতে পাকিস্তানের তৈরি দুইটি Barq মিসাইল ইনস্টল করা যাবে। Barq এর ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ৮কিঃমিঃ।

Nescom Burraq

এই ড্রোনটি একসাথে পাকিস্তানের তৈরি দুইটি Barq মিসাইল ক্যারি করতে পারে। ২০১৫ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সর্ব প্রথম এই আর্মাড ড্রোন ব্যাবহার গ্রাউন্ড এটাক চালিয়েছিলো।

GIDS Shapar-2

এটি পাকিস্তানের তৈরি একটি MALE ড্রোন। এটি একই সাথে দুইটি Barqমিসাইল কিংবা ১০০ কেজি অন্য কোন ওয়েপনস ক্যারি করতে পারে। এটা অনেকটা তুরস্কের TB-2 ড্রোনের মতো।

পাকিস্তানের প্রজেক্ট আজমের নেতৃত্বাধীন Vafadar-1 এবং Vafadar-2 নামে দুইটি MALE(মিডিয়াম অল্টিটিউড লং এন্ডুরেন্স) ড্রোন তৈরি করছে। যার প্রটোটাইপ অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের শেষের দিকে সার্ভিসে আসবে। এটা চীনের CH-4 এবং তুরস্কের Anka-s ড্রোনে টেকনোলজি সমন্বয়ে তৈরি করা হবে। এই বিষয়ে তুরস্ক ও চীনের সাথে ইতিমধ্যেই পাকিস্তান কিছু চুক্তি করেছে।

পাকিস্তান ২০১৯ সালে ডিফেন্স মেলায় ZF-1 Viper নামে ১৬ টন ম্যাক্সিমাম টেকঅফ ওয়েটের একটি লয়েল উইংম্যান স্টেলথ ড্রোনের রেপ্লিকা প্রদর্শন করেছিলো। যেটা তৈরির মুল উদ্দেশ্য ছিলো প্রতিপক্ষের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ডেস্ট্রয় করা এবং শত্রু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিপ স্ট্রাইক চালানো। এই ড্রোনটিতে ইনস্টল করা হবে শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স জ্যামার। গ্রাউন্ড এটাক থেকে নিয়ে এয়ার টু এয়ার কমব্যাটের সিস্টেমও থাকবে এই ড্রোনে। লয়েল উইংম্যান ড্রোন তৈরির বিষয়ে ২০২২ সালের শুরুর দিকে তুরস্ক, চীন, পাকিস্তান মিলে একটি ত্রিদেশীয় চুক্তি করেছে।

পাকিস্তানের ক্রয়কৃত আনম্যান্ড আর্মাড গ্রাউন্ড ভেহিকল সিস্টেম-

CH-4

চায়না থেকে এই ধরনের ৫টি ড্রোন ক্রয় করেছে পাকিস্তান। এই ধরনের প্রতিটি ড্রোন এক সাথে ৪টি গ্রাউন্ড এট্যাক মিসাইল ক্যারি করতে পারে।

পাকিস্তান তুরস্ক থেকে অজানা সংখ্যক Bayraktar TB-2 ও তুরস্কের জায়ান্ট আর্মাড ড্রোন এবং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক আর্মাড ড্রোন Bayraktar Akinci ড্ ক্রয়ের চুক্তি করেছে।

পাকিস্তানের আনম্যান্ড আর্মাড গ্রাউন্ড ভেহিকল সিস্টেম।

INSPECTOR UGV

এটি পাকিস্তানের তৈরি একটি আনম্যান্ড গ্রাউন্ড ভেহিকল। এর রেঞ্জ ১৬কিঃমিঃ। এতে অস্ত্র হিসেবে রয়েছে একটি ৭.৬২মিঃমিঃ মেশিনগান এবং ৪টি RPG-26 লাঞ্চার। এর ম্যাক্সিমাম স্পিড ঘন্টায় ২৫কিঃমিঃ। এটি কিছুদিন আগে পাকিস্তান এলওসিতে মোতায়ন করেছে।

পাকিস্তানের নিজস্ব তৈরী কোন ধরনের আনম্যান্ড সার্ফেস বোট ও আনম্যান্ড আন্ডার ওয়াটার ভেহিকল নেই। এবং এই দুইটি সিস্টেম কোন দেশ থেকে পাকিস্তান ক্রয়ও করেনি। তবে ভবিষ্যতে তুরস্কের থেকে TCG ULAQ সিরিজের আনম্যান্ড আর্মাড সার্ফেস বোট ক্রয় করতে পারে। এবং পাকিস্তান ভবিষ্যতে তুরস্কের MIUS আনম্যান্ড জেট ফাইটার সিস্টেমও ক্রয় করতে পারে।

উল্লেখ্য:আগে ব্যাবহারের দিকটি বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের পর পাকিস্তানই দ্বিতীয় রাষ্ট্র

যারা যুদ্ধে নিজস্ব ড্রোন ও ড্রোন থেকে মিসাইল ব্যাবহার করেছে। এবং আর্মাড ড্রোন আগে তৈরি করার দিক থেকে পাকিস্তান চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে।

বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত হার্ড কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তার মাঝে তুরস্ক একটি। অফিসিয়ালি তুরস্কই সর্ব প্রথম রাষ্ট্র যারা নিজেদের তৈরি হার্ড কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম নিজেদের সাবমেরিনে ইনস্টল করেছে। সেই তুরস্ক থেকে পাকিস্তান তার ব্যাবহৃত তিনটি সাবমেরিন আপগ্রেড করিয়ে তুরস্কের তৈরি Zargana সফট কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম বসিয়ে নিয়েছে। যাতে তুরস্কের তৈরি TORK হার্ড কিল এন্টি টর্পেডো সিস্টেম টর্পেডো সিস্টেমও থাকবে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, পাকিস্তানও সেই সব হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি যারা নিজেদের সাবমেরিনে হার্ড কিল ও সফট কিল উভয় এন্টি টর্পেডো সিস্টেম একই সাথে ব্যাবহার করার মতো ক্ষমতা রাখে।

ইন্ডিয়ার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে মোকাবিলার জন্য পাকিস্তান সাবমেরিন ভিত্তিক ব্যাটেল গ্রুপকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং ইন্ডিয়ার সাবমেরিনকে মোকাবিলার জন্য পাকিস্তান এন্টি সাবমেরিন সিস্টেমকে প্রাধান্য দিয়েছে। পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মতো একই ধরনের সক্ষমতা অর্জনের দিকে না হেটে বরং স্বল্প খরচে এগুলোকে কাউন্টার করার সিস্টেমের দিকে হেটেছে। এটা নিঃসেন্দেহ পাকিস্তানের সামরিক বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার সেই এন্টি সাবমেরিন ও সাবমেরিন ক্যাপাবিলিটি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি।

ইন্ডিয়া ২০৩০ সালের মাঝে মোট ৩০টি সাবমেরিন সার্ভিসে রাখার চেষ্টা করছে। এই কারনে পাকিস্তানও ৩০টি এন্টি সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ার এয়ারক্রাফট সার্ভিসে রাখার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের বর্তমানে ৩টা ডেডিকেটেড এন্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার হেলিকপ্টার এবং ১০ টি ফিক্সড উইং এন্টি সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ার এয়ারক্রাফট রয়েছে। আরও ২০টি এন্টি সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ার হেলিকপ্টার নতুন করে কেনার চেষ্টা করছে। পুরোনো ৩টি হেলিকপ্টারকে রিপ্লেস করা হবে এগুলো সার্ভিসে আসলেই। এই হেলিকপ্টারগুলো হতে পারে NH-90 হেলিকপ্টার এর এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার ভার্সন। যা ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস যৌথ ভাবে তৈরি করে থাকে। অন্য রাষ্ট্রগুলো থেকেও চাইলে পাকিস্তান ক্রয় করতে পারে। সেই সব রাষ্ট্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে ভালো অপশনগুলো হচ্ছে, চায়না ও তুরস্ক। তুরস্কের T-625 হেলিকপ্টারের এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার ভার্সনটি ২০২৩

সালেই সার্ভিসে আসবে। পাকিস্তান আরো ১০টি ফিক্সড উইং বিমান ক্রয় করবে এন্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য। পুরোনোগুলোকে রিপ্লেস করতেই নতুন ১০ টি এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট ক্রয় করবে। সর্বমোট ৩০টি এন্টি সাবমেরিন ওয়্যার ফেয়ার এয়ারক্রাফট সার্ভিসে রাখবে পাকিস্তান। ইন্ডিয়ার সাবমেরিনের সংখ্যা বাড়লে সমানুপাতে পাকিস্তানের এন্টি সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ার এয়ারক্রাফটের সংখ্যাও বাড়বে।

পাকিস্তানের বর্তমানে মোট ৮টি সাবমেরিন সার্ভিসে রয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ পাকিস্তানে ১১টি AIP যুক্ত ডিজেল ইলেক্ট্রিক সাবমেরিন এবং ৬টি মিজেট সাবমেরিন সার্ভিসে থাকবে। সেগুলো হচ্ছে,

Agosta-90B

এর ডিসপ্লেসমেন্ট ২০৫০টন। এই ধরনের তিনটি সাবমেরিন পাকিস্তান নেভিতে সার্ভিসে রয়েছে। এগুলো ১৯৯৮-২০০৮ সালের মাঝে সার্ভিসে এসেছে। এগুলোকে আপগ্রেড করে পাকিস্তান ফ্রান্সের তৈরি AIP সিস্টেম যুক্ত করেছে। যেকোন যুদ্ধ জাহাজের বা সাবমেরিনের ম্যাক্সিমাম লাইফটাইম থাকে পানিতে ভাসানোর পর থেকে ৬০ বছর। তবে বেশিরভাগ দেশ সাধারনত কোন যুদ্ধ জাহাজ বা সাবমেরিন পানিতে ভাসানোর পর থেকে ৪০ বছরের বেশি ব্যাবহার করে না। । সাধারনত একটা সাবমেরিন ৪০ বছর সার্ভিসে রাখা হয়। সেই হিসেবে পাকিস্তান এই সাবমেরিনগুলো ২০৩৮-২০৪৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আপগ্রেড করে সার্ভিসে রাখতে পারবে।

Agosta-70

এর ডিসপ্লেসমেন্ট ১৭৬০টন। এই ধরনের দুইটি সাবমেরিন সার্ভিসে রয়েছে। এগুলোকে পানিতে ভাসানো হয়েছে ১৯৭৭-৭৮সালের মাঝে। এগুলোর ম্যাক্সিমাম লাইফটাইম ৬০ বছরের হিসেবে ২০৩৭-৩৮সাল পর্যন্ত ব্যাবহার করা যাবে। তবে পাকিস্তান এগুলোকে ৫০ বছর ব্যাবহার করে ২০২৭-২৮ সালের মাঝেই অবসরে পাঠাবে।

Cosmos Class

এগুলো মিজেট সাবমেরিন। মিজেট সাবমেরিন বলা হয় যেগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট ১৫০টনের নিচে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো কোন গভীর পানিতে যেতে পারে

না। যদিও এগুলোর ম্যাক্সিমাম টেস্ট ডেপথ ১৫০মিটার। এটির ডিসপ্লেসমেন্ট ১১০টন। এটি ৬জন ক্রু এবং ৮জন নেভির স্পেশাল সার্ভিসের সদস্য বহন করতে পারে। এটাতে ম্যাক্সিমাম অস্ত্র হিসেবে দুইটি ৫৩৩মিঃমিঃ এর হেভি টর্পেডো বহন করা যায়। সাধারনত এগুলোতে ৩২৪ মিঃমিঃ এর লাইট ওয়েট টর্পেডো বা ৮ টি উচ্চ বিস্ফোরন ক্ষমতার নেভাল মাইন বহন করা হয়ে থাকে। এই ধরনের তিনটি সাবমেরিন বর্তমানে পাকিস্তান নেভিতে সার্ভিসে আছে। পাকিস্তানের এগুলো করাচি শিপইয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছিলো ১৯৯৩-১৯৯৬ সালের মাঝামাঝিতে ইটালি থেকে টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে। পাকিস্তান এগুলোকে ২০২৬-২০২৭ সালের মাঝেই অবসরে পাঠাবে। পাকিস্তান এই ধরনের আরো ৬ টি মিজেট সাবমেরিন তুরস্কের সহায়তায় তৈরি করতেছে। এগুলো দিয়ে পুরোনোগুলোকে রিপ্লেস করা হবে। যেগুলোর সবগুলো ২০২৬সালের মাঝেই সার্ভিসে আসবে। ২০১০সালের ২৬শে মার্চ এই ধরনের একটি মিজেট সাবমেরিন দিয়ে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার একটি ১০০০+টন ডিসপ্লেসমেন্টের একটি কর্ভেট ডুবিয়ে দেয়। যেই কর্ভেটিতে এন্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের পরিপূর্ণ ক্যাপাবিলিটি ছিলো। এই হামলায় উত্তর কোরিয়া তার নিজস্ব তৈরি ৫৩৩মিঃমিঃ টর্পেডো CHT-02D ব্যাবহার করেছিলো। এই ধরনের সাবমেরিন সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করে বর্তমানে ইরান ও উত্তর কোরিয়া। তবে পাকিস্তান যেগুলো তৈরি করছে সেগুলো ইরান ও উত্তর কোরিয়ারগুলোর চেয়ে অনেক আধুনিক।

Type 039B

এর ডিসপ্লেসমেন্ট হবে ৪০০০টন। পাকিস্তান এই ধরনের ৮টি সাবমেরিন ৫বিলিয়ন ইউএস ডলারের বিনিময়ে চায়না থেকে টট সহ ক্রয় করেছে। সবগুলোতেই AIP(এয়ার ইন্ডিপেন্ডেট প্রপালশন) সিস্টেম যুক্ত করা থাকবে। আটটা সাবমেরিনর মধ্যে চারটা পাকিস্তানে তৈরি হবে আর চারটা চীনে তৈরি হবে। এগুলোর সবগুলোর ডেলিভারি পাবে ২০২৭ সালের মাঝে। পাকিস্তানের এগুলো থেকে SLBM (সাবমেরিন লাঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল) নিক্ষেপের সিস্টেম থাকবে। আর নেভাল মাইন, হেভিওয়েট টর্পেডো ও SLCM(সাবমেরিন লাঞ্চড ক্রুজ মিসাইল) নিক্ষেপের সিস্টেম-তো এমনিতেই থাকবে। যা সাধারনত সব আধুনিক সাবমেরিনেই থাকে। সাবমেরিনের মুল ওয়েপনসই হচ্ছে নেভাল মাইন আর টর্পেডো। আর আধুনিক সাবমেরিনগুলোতে SLCMও কমন ওয়েপনস। এই SLCM এন্টি শিপ বা ল্যান্ড এটাক উভয়টাই হতে পারে।

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

(তুরস্কে তৈরি আধুনিক কিছু সমরাস্ত্র সম্পর্কে)

বর্তমান বিশ্বে নতুন দুই ধরনের গেম চেঞ্জার ওয়েপনস হচ্ছে, লেজার ওয়েপনস আর হাইপারসনিক গতির ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গান। বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্র এই ধরনের ওয়েপনস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। লেজার ওয়েপনস বা ডিরেক্ট এনার্জি ওয়েপনস উ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গান তৈরির ক্ষেত্রে তুরস্ক অনেক দুর এগিয়েছে। তুরস্ক ২০১৯ সালে লিবিয়াতে একটি চাইনিজ উইং লং ড্রোন ভুপাতিত করেছিলো লেজার এয়ার ডিফেন্স দ্বারা। তুরস্কই ওয়ার্ল্ডে প্রথম রাষ্ট যারা লেজার ওয়েপনস যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাবহার করেছে এবং সফল হয়েছে। তুরস্কের তৈরী করা লেজার ওয়েপনসগুলো হচ্ছে,

YGLS

এটি তুরস্কের TUBITAK ও BILGEM এর তৈরি একটি লেজার ওয়েপনস। এটি মুলত যুদ্ধ জাহাজে ইনস্টল করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সার্ফেস টু সার্ফেস, সার্ফেস টু এয়ার, সার্ফেস টু গ্রাউন্ডে সমান ভাবে ব্যাবহার করা যায়। । ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এটি তৈরির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় তুরস্ক। পরে ২০১৬ সালের ব্যার্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর এরদোগানের নির্দেশ পুনরায় এটার কার্যক্রম শুরু হয়। এটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল ক্লাস ফ্রিগেটে ইনস্টল করা হবে। এটা ২০ কিলোওয়াটের হাই পাওয়ার লেজার বীম নিক্ষেপ করতে পারে। ভবিষ্যতে এটাকে ১০০ কিলোওয়াটে রূপান্তরিত করা হবে।

ALKA DEWS

এটি রকেটসানের তৈরি। এটি একটি ব্যাটেল প্রুফড লেজার ওয়েপনস। ২০১৯ সালের ৪ আগস্ট লিবিয়ার মিসরাতায় হাফতার বাহিনীর একটি চায়নিজ Wing

Loong-II ড্রোন শুটডাউন করা হয় এই ALKA DEWS দ্বারা। এর মধ্যে দিয়ে তুরস্ক বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে গৌরব অর্জন করে যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে লেজার ওয়েপনস ব্যাবহার করেছে এবং সফল হয়েছে। এটাতে ড্রোন ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় করতে ৫০ কিলোওয়াট লেজার এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিস্টেম উভয়টি আছে। এটাতে একই সাথে একাধিক লক্ষ্য ট্র্যাক করতে ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সিস্টেম এবং রাডার সিস্টেম আছে। এটা ৪ কিলোমিটার রেঞ্জ ড্রোনের সুইসাইড ড্রোনের সোয়ার্ম এট্যাক নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম বলে দাবি করা হয়। ৫০০ মিটার রেঞ্জের মাঝে লেজার বীম দিয়ে লক্ষ্য বস্তু ধ্বংস করতে পারে এবং এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিস্টেম ব্যাবহার করে এক কিলোমিটারের মধ্যে লক্ষ্য বস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। এটা এক কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে উড়ে চলা যেকোন এয়ারক্রাফটের ৮ মিলিমিটার পুরত্বের যেকোনো স্টিল প্লেট ধ্বংস করতে পারে।

LSS

এটি এসেলসানের তৈরি একটি লেজার ওয়েপনস। এসেলসানের বক্তব্য অনুসারে, এটি কোন বোম্বার ড্রোন ও পানির নিচে ৫০০মিটার দুরত্ব পর্যন্ত কার্যকর। IED(ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বা রাস্তার পাশের সন্দেহজনক এই প্যাকেজগুলি দ্বারা সৃষ্ট হুমকিগুলিকে ২০০ রেঞ্জের মাঝে কার্যকরভাবে দূর করতে পারে। এটা কত কিলোওয়াটের লেজার বীম নিক্ষেপ করতে পারে এই বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ARMOL

এটি TUBITAK এর তৈরি আরেকটি লেজার ওয়েপনস। এটা ১.২৫ কিলোওয়াটের লেজার বীম নিক্ষেপ করতে পারে। ৫০০ মিটার রেঞ্জের মধ্যে ৩ মিলিমিটার পুরত্বের যেকোনো স্টিল প্লেট ধ্বংস করতে পারে। এটা তুরস্কের TAI TF-X লেজার পড ইনস্টল করা হতে পারে বলে এমন কিছু নিউজ আসছে। তুরস্ক এটি করতে সক্ষম হলে তুরস্ক সবধরনের প্লাটফর্ম থেকে লেজার ওয়েপনস ব্যাবহার করার সক্ষমতা অর্জন করবে। এবং তুরস্ক হবে যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয়তম রাষ্ট্র যারা এয়ারবোর্ন লেজার পড তৈরি করছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের লকহিড মার্টিন একটি এয়ারবোর্ন লেজার পড F-16 যুদ্ধবিমানে ইনস্টল করে পরীক্ষা চালায়। যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের মাঝেই F-35 যুদ্ধবিমানে লেজার ওয়েপনস ইনস্টল করবে। লকহিড মার্টিন তাদের এই পরীক্ষার বিষয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

TUMOL

২০১৯ সালে তুরস্কে অনুষ্ঠিত

ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স এক্সপোতে তুরস্ক এই ম্যানপোর্টবল সুপার লেজার গান প্রদর্শন করে। তুরস্কের তৈরি MPT 76 রাইফেল এর উপর ভিত্তি করে এই ম্যানপোর্টেবল লেজার ওয়েপনসটি তৈরি করবে TUBITAK। এটা এখন পর্যন্ত প্রটোটাইপ অবস্থায় আছে। এটি বিদ্যুৎকে লেজারের আলোতে পরিণত করে। অল্প দূরত্বে এটির খুব উচ্চ প্রভাব থাকবে। রাইফেলের মতো কোন ধরনের শব্দ করে না। । খালি চোখে দেখাও যায় না। শত্রুকে ধ্বংস করা যাবে শত্রু কিছু বুঝে ওঠার আগেই। এটি একটি ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায়। এটি সর্বোচ্চ ২০ কিলোওয়াটের লেজার বীম নিক্ষেপ করতে পারবে। এটি ১৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে লক্ষ্য বস্তুকে নিরপেক্ষ করে এবং ২৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে লক্ষ্য বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করে এটি এক কিলোমিটার পর্যন্ত কাজ করতে পারে। । এই ধরনের ম্যানপোর্টেবল লেজার রাইফেল এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও চায়নাই কেবল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

শত্রুপক্ষের ছোড়া মিসাইল থেকে বাঁচতে এয়ারক্রাফটে বিভিন্ন ধরনের ডিফেন্সিভ সিস্টেম থাকে। । তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইলেকট্রনিক জ্যামার আর ফ্লেয়ার। তবে নতুন আরো একটি সিস্টেম এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। সেটা হচ্ছে, DIRCM(Directional Infrared Counter measures system)। এটা মুলত এয়ারক্রাফটের দিকে ধেয়ে আসা IR গাইডেড মিসাইলকে লক্ষ্য করে বিশেষ এক ধরনের লেজার বিম নিক্ষেপ করে। সাধারনত ম্যানপ্যাড ও শর্ট রেঞ্জের এয়ার টু এয়ার মিসাইল IR গাইডেড হয়। IR গাইডেড মিসাইলের একুরেসি খুব হাই লেভেলের হয়ে থাকে। IR গাইডেড মিসাইল লাঞ্চ করার পর যখন DIRCM এক্টিভ হয়ে তার লেজার বিম নিক্ষেপ করে, তখন ঐ মিসাইলটি তার মুল টার্গেট হারিয়ে ঐ লেজার বিমকেই তার টার্গেট ভেবে সেটার দিকেই ধেয়ে আসতে থাকে, এবং ঐ লেজার বিমের পাওয়ারে মিসাইলটি কিছুক্ষনের মাঝেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এই পর্যন্ত বিশ্বের ৮টি দেশের কয়েকটি কম্পানি এই প্রযুক্তিটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সেইগুলো হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ্রপ গ্রুম্যান, যুক্তরাজ্যের বিএই সিস্টেম, ইতালির লিওনার্দো, ইসরাইলের এলবিট, রাশিয়ার কানাজ, দক্ষিণ কোরিয়ার হানোয়া, স্পেনের ইন্দ্রা ও তুরস্কের মেটেকসান। এই সিস্টেমটি তৈরি করে অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে বেশি

লাভবান হয়েছে, ইসরাইলের এলবিট। তবে তুরস্কের DIRCM সিস্টেমটি গ্রাউন্ড বেসড। NAZAR DENiZ,

এটি ওয়ার্ল্ডের একটি ইউনিক লেজার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এই সিস্টেমটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেটেকসান এটাকে IDEF 2021 সালে প্রদর্শন করে। এটি আগত EO/IR গাইডেড মিসাইলকে ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী লেজার এয়ারডিফেন্স সিস্টেম। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি ও অবকাঠামোকে শত্রুর মিসাইল হামলা থেকে রক্ষা করতে এটা বেশ ভালো কার্যকর সিস্টেম। এটি ১০ কিলোওয়াটের একটি লেজার বীম নিক্ষেপ করতে পারে। NAZAR এর ব্রডব্যান্ড সক্ষমতা এটিকে প্রয়োজন অনুসারে রিক্যোনাইসেন্স এবং সার্ভিলেন্স করতে সহায়তা করে। NAZAR এর সিস্টেমটি একটি ট্রাকের উপর ইনস্টল করা হয়েছে। সিস্টেমটিতে একটি নিজস্ব জেনারেটরও রয়েছে। এটি ট্রাকের উপর ইনস্টল করে সহজেই যেকোনো স্থানেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এটার আপাতত ল্যান্ড সিস্টেম তৈরির কাজ চলছে। ল্যান্ড সিস্টেম তৈরির কাজ সমাপ্তির পরে নাজারকে তুরস্কের যুদ্ধ জাহাজের অ্যান্টি-শিপ মিসাইল ডিফেন্স (ASMD) শক্তিশালী করার জন্য অভিযোজিত করা হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে এটার একটি এন্টি মিসাইল ভ্যারিয়েন্ট থাকবে। এই ধরনের গ্রাউন্ড বেসড DIRCM বা লেজার এয়ারডিফেন্স সিস্টেম তৈরী করার দিক থেকে তুরস্ক বিশ্বের এখন পর্যন্ত একমাত্র রাষ্ট্র!তুরস্ক এয়ারক্রাফটে ইনস্টল করার মত DIRCM এখনো তৈরি করেনি, তবে তৈরির কাজ চলছে। এটা তৈরিতে কাজ করছে এসেলসান। তুরস্কের বক্তব্য অনুসারে, এসেলসান এটি তৈরি করতে সক্ষম হলে তুরস্কের আপকামিং যুদ্ধ বিমান TAI TF-X এ এটা ইনস্টল করা হবে। যদি তুরস্ক এটা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তুরস্ক হবে বিশ্বের দ্বিতীয় রাষ্ট্র যারা যুদ্ধ বিমানে এই ধরনের সিস্টেম ব্যাবহার করছে। এখনো পর্যন্ত রাশিয়াই বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যারা এই ধরনের সিস্টেম যুদ্ধ বিমানে ব্যাবহার করছে। রাশিয়ার SU-57 যুদ্ধ বিমানে রাশিয়া কানাজের তৈরি 101KS-O DIRCM সিস্টেমটি ইনস্টল করেছে। সেই দিক থেকে রাশিয়ার SU-57 পশ্চিমাদের যুদ্ধ বিমানগুলো থেকে একধাপ এগিয়ে আছে।

হাইপারসনিক গতির অস্ত্র দুই ধরনের হয়ে থাকে

গান সিস্টেম আর মিসাইল সিস্টেম। হাইপারসনিক গতি হচ্ছে ম্যাক ৫ এর উপরে গতি হওয়া। অর্থাৎ ঘন্টায় প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার এর চেয়ে বেশি গতির হওয়া। এই হাইপারসনিক গতির অস্ত্রের গান সিস্টেমটি মুলত ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গান

নামে পরিচিত। সারা বিশ্বে অল্প কিছু দেশ এই ধরনের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, তার মাঝে তুরস্ক একটি দেশ। তুরস্ক গান সিস্টেম হাইপারসনিক ওয়েপনস তৈরীর পাশাপাশি এখন হাইপারসনিক মিসাইল সিস্টেম ওয়েপনস তৈরীর চেষ্টা করছে। বিশ্বের বহু দেশ যেখানে একটি রেইলগান তৈরি করতেই হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে তুরস্ক কয়েকটি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গান তৈরী করেছে। তুরস্কের তৈরি করা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইলগান গুলো হচ্ছে,

Sahi-209 block-2

তুরস্কের Yeteknoloji এটি তৈরি করছে। এর গতি ও রেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেইল গানগুলো হাইপারসনিক(শব্দের গতির চেয়ে পাঁচগুণ) গতির হয়ে থাকে। তবে ব্রিটিশ MBDA কর্তৃক প্রকাশিত EDR ম্যাগাজিন এটা নিয়ে একটি বেশ তথ্য সমৃদ্ধ একটি আর্টিকেল লিখেছে। তারা সেখানে বলেছে যে, "Sahi 209 এর ১২তম প্রটোটাইপটি 76mm এর শেল ১০০মেগা জুল(Mj)শক্তিতে ও ম্যাক ৮ গতিতে ছুড়তে সক্ষম হয়েছে। এবং এর রেঞ্জ ছিলো ১৫০কিঃমিঃ"। এটি মুলত এখনো নির্মানের কাজ চলছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে সার্ভিসে আসেনি। তাই এর ব্যাপারে শতভাগ নির্ভুল তথ্য দেওয়া সম্ভব না।

Sapan

এটি তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান Tubitak SAVTAG তৈরি করছে। এটার ব্যাপারে কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

Tufan

এটি তুরস্কের অতি পরিচিত ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি এসেলসানের তৈরি। এসেলসানও এটির ব্যাপারে তেমন কোন তথ্য প্রকাশ করেনি।

TCG ULAQ

এটি তুরস্কের একটি আনম্যান্ড কমব্যাট বোট। এতে ৪টি UMTAS-L মিসাইল বা ২টি UMTAS-L ১টি Sirit মিসাইল লাঞ্চার থাকবে। সাধারনত এই ধরনের বোট ডোবানোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যাবহার করা হয়। এটার রেঞ্জ ৪০০ কিলোমিটার। যা দিয়ে উপকূলে কন্ট্রোল স্থাপন করে অনায়াসেই একটি রাষ্ট্রের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক

জোনের মাঝে যেকোনো কিছু ঠেকানো যাবে। এই হেলিকপ্টারগুলোকে ধ্বংস করতে এই বোটে তুরস্কের Sungur পোর্টেবল এয়ারডিফেন্স সিস্টেমও ইনস্টল করা যাবে। এটি এখনো সার্ভিসে আসেনি। তবে কিছু দিনের মাঝেই সার্ভিসে আসবে। এর নির্মাতা কম্পানিটি জানিয়েছে, তারা এটার নির্মান কাজ শেষ করার পরে এটার ইনটেলিজেন্স সার্ভিলেন্স রিকোনাইসেন্স ও ইলেকট্রোনিক ওয়ারফেয়ার, মাইন কাউন্টার মেজার ভেসেল, এন্টি সার্ফেস ওয়ারফেয়ার গাইডেড মিসাইল, ফায়ার ফাইটিং ভেসেল যেগুলোতে অগ্নি নির্বাপক মিসাইল ইনস্টল করা থাকবে, ও এন্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ভেরিয়েন্ট তৈরী করবে। এন্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ভ্যারিয়েন্টর রেঞ্জ হবে ৫০০ কিলোমিটার। এতে সোনার সহ সাবমেরিন ডিটেক্ট করার সব ধরনের সেন্সর থাকবে। অস্ত্র হিসেবে থাকবে দুইটি লাইট ওয়েট টর্পেডো এবং ১২.৭ মিঃমিঃ এর একটি রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গান। অবশ্য সমস্ত ভ্যারিয়েন্টেই এই ১২.৭ মিঃমিঃ এর একটি রিমোট কন্ট্রোল মেশিনগান ইনস্টল করা যাবে।

WATTOZZ Sida

এটাকে আনম্যান্ড সুইসাইড সাবমেরিন বা পোর্টেবল নেভাল মাইন বলা যায়। যা দেখতে অনেকটা সামুদ্রিক মাছের মত। এই ধরনের আনম্যান্ড সুইসাইড সাবমেরিন এটাই প্রথম। রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্কই প্রথম দেশ যারা এই ধরনের আনম্যান্ড সুইসাইড সাবমেরিন বা পোর্টেবল নেভাল মাইন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো উপকূল অঞ্চলে পরিচালনা করা যায় লিমিটেড রেঞ্জে। কেননা এগুলো পানির নিচে তারের মাধ্যমে অপারেটর রুমের সাথে সংযুক্ত থাকে।

Simsek

এটি মুলত তুরস্কের তৈরী করা একটি টার্গেট ড্রোন। তবে সম্প্রতি এটার একটি সুইসাইড ভেরিয়েন্ট সার্ভিসে নিয়ে এসেছে তুরস্ক। এটার রেঞ্জ ২০০কিঃমিঃ। যা সারা বিশ্বে প্রথম। এত লং রেঞ্জের সুইসাইড ড্রোন কেউ এখন পর্যন্ত সার্ভিসে নিয়ে আসেনি। ইতিমধ্যে এর একটি সফল পরীক্ষাও চালিয়েছে তুরস্ক। Anka-S ড্রোন থেকে এটাকে লাঞ্চ করা হয়। ড্রোন থেকে কোন ড্রোন লাঞ্চ করার ঘটনার দিক থেকে এটা ২য় ঘটনা। ১ম ড্রোন থেকে ড্রোন লাঞ্চ করার ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এই ড্রোনটিতে ৫কেজি বিস্ফোরক থাকবে। এতে মিনি ইলেকট্রনিক জ্যামার ও এন্টি রেডিয়েশন সিস্টেম সহ আরো অনেক কিছুই থাকবে। মুলত এটাকে এয়ারডিফেন্স সিস্টেম ডেস্ট্রয় করার জন্যই তৈরি করা হচ্ছে। এটাকে ড্রোন, যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার, যুদ্ধ

জাহাজ ও গ্রাউন্ড থেকে লাঞ্চ করা যাবে। তুরস্কের ইস্তম্বুল ক্লাস ফ্রিগেটে এটা ইনস্টল করা হবে। অন্য কোন যুদ্ধ জাহাজের এয়ারডিফেন্স ডেস্ট্রয় করতে এটা ভালো একটি সিস্টেম হবে। যদিও এটা অনেক দামী সুইসাইড ড্রোন, কিন্তু এটাকে ব্যাবহারও করা হবে দামী কিছু ধ্বংস করতে। তুরস্ক জানিয়েছে, তারা এই ধরনের ১০০টি ড্রোন প্রতি বছর উৎপাদন করবে।

Fedai-2

এটি তুরস্কের তৈরী একটি সম্পূর্ণ ইউনিক সিস্টেমের এন্টি ড্রোন সিস্টেম সুইসাইড ড্রোন। এটি একটি মাল্টিফাংশনাল সুইসাইড ড্রোন। এটাকে এন্টি এয়ারক্রাফট রোল থেকে নিয়ে এন্টি ট্যাংক রোল পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই ব্যাবহার করা যায়। এটাকে একটি হাই অল্টিটিউডের ম্যানপ্যাড সিস্টেম বলা যেতে পারে। এটার ওজন ৮.৫কেজি এবং সর্বোচ্চ ২.৪ কেজি ওয়্যারহেড বহন করতে পারে। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ১৫৩ কিলোমিটার এবং এটি ৩৫ মিনিট পর্যন্ত আকাশে ভেসে থাকতে পারে। এটার রেঞ্জ ৬৫ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ অল্টিটিউড ৫ কিলোমিটার। যা একটি ম্যানপ্যাড সিস্টেমের সর্বোচ্চ অল্টিটিউড। ঘন্টায় ১৫০কিলোমিটার গতির চেয়ে কম গতিতে উড়ে যাওয়া যেকোনো হেলিকপ্টার, ড্রোন বা সুইসাইড ড্রোন আকাশেই ধ্বংস করে দিতে পারে। এবং একই গতিতে ৫ কিলোমিটারের নিচের অল্টিটিউডে উড়ে যাওয়া ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটও ধ্বংস করতে পারে। একটি এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইলে যেই ধরনের সেন্সর ওয়ারহেড থাকে সেগুলোর সবগুলোই এই ড্রোনটিতেও থাকে। এটা দ্বারা যেকোনো ধরণের ট্যাংক সহ সব ধরনের আর্মাড ভেহিকলও ধ্বংস করা যায়। এবং সার্ফেস শিপেও আঘাত হানা যায়। একসাথে অনেকগুলো এই ধরনের সুইসাইড ড্রোনের আঘাতে যেকোনো যুদ্ধ জাহাজও কিছুক্ষনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অবশ্য গ্রাউন্ডের আর্মাড ভেহিকলে বা সার্ফেস শিপে আঘাত হানার জন্য ভিন্ন ধরনের ওয়্যারহেড ব্যাবহার করা হয়।

(আপাতত সমাপ্ত)